মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষচন্দ্র

সম্পাদনা

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

প্রকাশনা

শিলালিপি

৫১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ/১৩৬৭

প্রচ্ছদপট : কলিকাতা সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীসুনীল কুমার পাল

প্রচ্ছদ রূপায়ণ : চারু খান

প্রকাশক : অরুণ ঘোষ/শিলালিপি, কলি-৯
মুদ্রাকর : রামপ্রসাদ নাগ/সারদা প্রিন্টার্স, কলি-১২
বাঁধন : কাশীনাথ পাল/কৌশিক বাইণ্ডার্স, কলি-৯

উৎসর্গ ঃ

প্রকৃত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী

এবং

সংগ্রামী জনগণের

উদ্দেশ্যে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ। সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। ভাস্কর শ্রীসুনীলকুমার পাল। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো। দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট। ইলাস্‌ট্রেটেড্ উইক্‌লী অব্ ইণ্ডিয়া। সিলেক্‌টেড স্পীচেস্ অফ সুভাষচন্দ্র বসু, পাবলিকেশন ডিভিশন। জয়শ্রী। বাঞ্চ অব্ ওল্ড লেটারস্। অমৃত। আরোহী। যুগধ্বনি। সত্যযুগ। লোকসেবক। দক্ষিণী বার্তা। অবিস্মরণীয়। যুগবাণী। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ। স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র। নটরাজ। জনমত। প্রসেস সিণ্ডিকেট।

নিবেদন

কোন উপমার আশ্রয় বা তুলনার প্রয়াস না নিয়েই, একথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা যায়, যে, সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অনন্ত এবং অখণ্ড পুরুষ ;—ইতিহাস পুরুষ ; পরিপূর্ণ মানবিক সত্বায় প্রদীপ্ত এক অপরূপ ব্যক্তিত্ব।

স্বাধীনোত্তর ভারতে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে, অর্জিত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তর্জাতিক দুর্দমনীয় প্রয়াসকে, শিল্প সমৃদ্ধ বুভুক্ষা-অনুপস্থিত ভারসাম্যে বিধৃত ভারতের জন্য তাঁর পরিকল্পনার পট-ভূমিকাকে ম্লান করে দেবার তথা সুভাষচন্দ্রের অনস্বীকার্য অস্তিত্বের গুরুত্বকে হ্রাস করে দেবার যে ক্ষমতাসীন অপচেষ্টা গত তিন দশকের বেশীর ভাগ জুড়ে রাজনৈতিক স্তরে এবং দলীয় স্বার্থে চলে আসছিল, বেশ কিছু তত্ত্ব এবং তথ্যানুসন্ধানীর সার্থক প্রচেষ্টায় তা বহুলাংশে তিরোহিত হলেও, সম্পূর্ণ যে অপসৃত হয়েছে, অকম্পকণ্ঠে এখনও তা বলা যায় না। তবে, পুনর্মূল্যায়নের নিরিখে ইতিহাসের সদরদেউড়ী যে ক্রমশঃ ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে উঠছে, এটিই বড় আশার কথা। অচলায়তনের দুর্গাভ্যন্তরে যখন একবার বৈশাখীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তখন অন্ধকারের স্থায়িত্বকাল যে সীমিত হয়ে গেছে, সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। তার সঙ্গে, এ বিষয়েও সুনিশ্চিত—অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত ইতিহাস সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিসত্বায়, তাঁর রাজনৈতিক চেতনায়, তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তায়, তাঁর কূটনৈতিক এবং সংগ্রামী ভূমিকায়, তাঁর সমর নায়কের অস্তিত্বে তথা বিপ্লব সাধনায়, এমনই এক ইতিহাস, যার উপাদান কোন এক সীমিত ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে সীমায়িত নয়—ছড়িয়ে আছে এই গোলার্ধের প্রায় প্রতিটি অংশে, ছড়িয়ে আছে তাঁর সান্নিধ্যে গর্বিত বহুজনের মধ্যে, ছড়িয়ে আছে কোথাও সংগোপনে, কোথাও বা প্রকাশ্যে। সেই বহুজনের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রেখে গেছেন, জানা-অজানা কোন না কোন স্থানে কোন না কোন স্মৃতিচারণ বা আলোচনার মধ্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই বহুজনের মধ্যে, যাঁরা ইতিমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন, তাঁরা শেষ কথা বলে যেতে পারেন নি ; যাঁরা এখনও জীবিত, তাঁরাও শেষ কথা বলতে নির্দেশের আশায় অপেক্ষমান। কেন বলেন নি, বা কেন বলতে নারাজ বা কোথা থেকে আসবে সেই নির্দেশ—সেই রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনের অপেক্ষা সাপেক্ষেও এই-

টুকুই শুধু এখন বলা যায়—সুভাষচন্দ্র এক অনন্ত ইতিহাস, এক অনির্বান, অসমাপ্ত ইতিহাস। কিন্তু স্বধর্মে ইতিহাস কখনও অসমাপ্ত থাকতে পারে না। একদিন তাকে সমাপ্তির সীমারেখায় পৌঁছোতেই হবে। এবং তা যত দ্রুত হয়, ততই বিকলাঙ্গত্বের হীনমন্যতার অবসান ঘটবে। আমরা সেই দিনটিরই প্রত্যাশী।

আমাদের এই সংকলনে আমরা সযত্ন প্রয়াসে একটি ঐতিহাসিক রূপরেখায় পৌঁছোবার চেষ্টা করেছি। তাই একদিকে যেমন আমরা বেশ কিছু প্রয়াত সুভাষ অনুরাগীর রচনা গ্রহণ করেছি, তেমনি অবলুপ্ত-প্রায় অনেক পুস্তকের সাহায্যও গ্রহণ করেছি আবার সেই সংগে এই সংকলনে বেশ কিছু মৌলিক রচনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবুও নানাবিধ পরিস্থিতির কারণে একটা অসমাপ্তির অসন্তোষ নিয়েই শেষ করতে হল এই সংকলনগ্রন্থ।

প্রখ্যাত গণিতবিদ ও গণিত গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ আমাদের এই সংকলন প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে যে অপরিমেয় সাহায্য দান করেছেন, তা প্রকৃতই সুদুর্লভ। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে এই সংকলন হয়তো পরিকল্পনার স্তরেই থেকে যেত। তাঁর এই হৃদয়বত্তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। সেই সংগে উল্লেখ্য আর একটি হৃদয়বত্তার—তিনি হলেন বাংলা সাহিত্য জগতে অনুবাদ সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ এবং কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম সুসাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়। শুধু নানা উপদেশ নয়, দুষ্প্রাপ্য রচনা এবং পুস্তকাদি সংগ্রহ করে দিয়ে তিনি আমাদের নানা-ভাবে যে উৎসাহ দান করেছেন, নিঃসন্দেহে তা অতুলনীয়। আমরা এই সুযোগে তাঁদের অকৃত্রিম ঐকান্তিকতার জন্য আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সরকারী চারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাত স্থপতি শ্রীসুনীল পালকে, তাঁর সযত্নে খোদিত সুভাষচন্দ্রের প্রস্তর মূর্তিটির আলোকচিত্র আমাদের গ্রহনের সুযোগ দিয়ে। এছাড়া এই সংকলনে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষে যারা নানাভাবে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গুহ, রাম চট্টখুণ্ডী, বানী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস সেই সঙ্গে সর্বশ্রী অরুণকান্তি ঘোষ, রমাপ্রসাদ নাগ ও কাশীনাথ পাল এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মুদ্রণ-কর্মজগতের অস্থিরতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংকলন কর্মে অগ্রসর হওয়ার ফলে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ, যা আমাদের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়েও হয়ে গেছে, তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিয়ে, আমাদের এই সংকলন যদি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানী সুভাষ-জিজ্ঞাসুজনের কিছুমাত্র সহায়ক হয়, তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল জ্ঞানে ধন্য হব।

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

সূচীপত্র

স্মৃতিচারণ ঃ

মননশীল নিবন্ধ ঃ

———

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

॥ সুভাষ প্রসঙ্গে ॥

—সরোজকুমার রায়চৌধুরী

১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারী, নেতাজীর অন্তর্ধানের সপ্তাহ কয়েক আগে।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা শেষ করে বাড়ী ফেরার উদ্যোগ করছি। রাত্রি যেন আটটার কাছাকাছি। ৩৮ নং এলগিন রোড থেকে দেখা করবার তলব এল।

একটু বিস্মিত হলাম। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা। ৩৮ নং এলগিন রোড যেন বেসরকারী লাটভবন। সাক্ষাৎপ্রার্থীর আর অন্ত নেই। তারই মধ্যে আমিও একদিন গিয়ে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানালাম। বলা হোল, একটি স্লিপে নাম এবং প্রয়োজন লিখে দিতে। প্রয়োজন কিছুই ছিল না। সুতরাং শুধু নামটা লিখে দিলাম।

সেক্রেটারী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, প্রয়োজনটাও লিখতে হবে।

সর্বনাশ! প্রয়োজন?

সবিনয়ে জানালাম, বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। নিছক দেখা করতে এবং গল্প করতে এসেছি।

গল্প করতে! রাষ্ট্রপতির সঙ্গে! নিদারুণ বিস্ময়ে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠল! আর সেই দিকে চেয়ে আমিও লজ্জায় কি যে বলব ভেবে পেলাম না।

সংসারে একটি মাত্র কাজই আমি পারি, গল্প করতে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সে সময় কোথায়? বুঝলাম, রাষ্ট্রপতির কাছে আমার যাওয়ার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

নমস্কার করে বললাম, আচ্ছা আমি চললাম। আবশ্যক মনে করলে স্লিপটা রাষ্ট্রপতিকে দেখাতে পারেন।

তারপর বহুকাল ওদিকে যাইনি। হঠাৎ বন্ধুবর পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

পরেশচন্দ্র চা-বাগানের মালিক। তাঁর দেওয়া অতি উত্তম চা সুভাষচন্দ্র

পরপর তিন পেয়ালা খেলেন এবং কিছু চা পাঠিয়ে দেবার জন্য ফরমায়েস করলেন। জীবনে তাঁর এই একটি মাত্র নেশাই আমরা দেখেছি।

আলোচনার শেষে সুভাষচন্দ্র কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। বললেন, পরেশ, সরোজ আমাকে পৌঁছে দিতে চলল। গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আর আস না কেন? বললাম, কোন কাজ তো থাকে না। আপনার কত কাজ। শুধু শুধু বিরক্ত করতে গিয়ে লাভ কি?

খোঁচাটা বুঝলেন। মুখে একটা ব্যথার ছায়া খেলে গেল। একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে পরেশ একদিন অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছিলেন। পরে, আর একদিন সেই প্রসঙ্গ উঠতে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, এ জিনিসটাকে তুমি অমন ভাবে নিচ্ছ কেন? এমন তো হতে পারে, একটু সুস্থ হয়ে নিরিবিলি তোমার সঙ্গে কথা বলব বলেই তোমাকে বসিয়ে রেখেছিলাম।

এদিকটা পরেশ ভেবে দেখেন নি। খুবই লজ্জা পেয়েছিলেন সেদিন তিনি।

সেদিন তাঁর বসবার ঘরে অনেক রাজনৈতিক আলোচনা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন বাধেনি, কিন্তু তার ছায়া দীর্ঘতর হয়েছে। জার্মানীর আক্রমণের পদ্ধতিটা কি রকম হবে সেই নিয়েই তিনি আলোচনা করেন। যুদ্ধ বাধলে দেখি, জার্মান আক্রমণের ছকটা তাঁর কথার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

তার কতদিন পরে এই টেলিফোন। বললাম, কাল সকালে যাব।

সুভাষচন্দ্র তখন শয্যাগত। টেলিফোন অন্য ঘরে। সুতরাং তার সেক্রেটারী সেকথা তাঁকে জানিয়ে ফিরে এসে বললেন, এখন আসতে পারেন না?

এ সময় তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ভয়াবহ। দেশের ব্যাপারে তাঁর কাছে দিন এবং রাত্রের কোনো প্রভেদ ছিল না। আমরা যারা রথী নই পদাতিক, রাত্রি বারোটায় তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করলে তাদের বাড়ী ফেরার কি গতি হবে এ প্রশ্ন তাঁর মনেই জাগত না। তাঁর নিজের যখন মোটর ছিল না, তিনি নিজেও তখন রাত্রি বারোটার সময় কংগ্রেস অফিস থেকে পায়দলে বাড়ী ফিরতেন। কিন্তু সবাই যে সুভাষচন্দ্র নয় সে কথা তাঁকে বোঝায় কে,—বোঝাবার চেষ্টাও বোধ করি কেহ করেনি।

সুতরাং রাত্রিতে তাঁর কাছে যেতে ভয় হল। প্রাণের দায়ে মিথ্যা বললাম, এখন তো অফিসের কাজে ব্যস্ত। বলুন কাল ভোরেই আমি যাব।

সেক্রেটারী তাঁকে কথাটা জানিয়ে ফিরে এসে বললেন, তাই আসবেন।

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

আমি জানতাম সুভাষচন্দ্র উঠতেন খুব ভোরে। রাত্রে ঘুমও তাঁর প্রায়ই হোত না। আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁকে দিন-রাত্রি কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে যান। তাঁরা জানেন না, এ অভ্যাস তাঁর দীর্ঘকালের। আহার সম্বন্ধেও এই একই কথা। অনিশ্চিত সফরের সময় যখন কিছু পেতেন প্রচুর খেয়ে নিতেন, তারপর দুটো দিন হয়ত খাওয়াই জুটলো না। অভুক্ত অবস্থাতেও বাইরে থেকে দেখলে মনেও হত না, তিনি শ্রান্ত। গান্ধীজির জীবনযাত্রাও খুব কঠোর ছিল। কিন্তু তার পিছনে ছিল সাধনা। সাধনা ও প্রয়াস। সুভাষচন্দ্রের এই কঠোরতার পিছনে কোনও সাধনা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু মনে হত দেশের সেবার জন্যে ভগবান যেন তাঁকে এই অসামান্য শক্তি জন্মের সঙ্গেই দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন ছিল নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। এত স্বাভাবিক যে সহজে চোখে পড়তে চায় না।

ভোরেই তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীতে রওনা হলাম। খবর দিয়ে সেক্রেটারী একেবারে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন।

কোণের লম্বা ঘরখানি। মধ্যে ফাঁক ফাঁক দুখানা খাট পাতা। শেষের দিকের খাটখানা তাঁর। তার কাছেই দুখানা চেয়ার। তিনি খাটের উপর বসে। মুখে একমুখ দাড়ি বেশ রোগা চেহারা।

জিজ্ঞাসা করলাম, দাড়ি কামাননি কেন?

হেসে বললেন, কী হবে কামিয়ে? আবার তো সেই জেলে।

কুশল প্রশ্ন এবং গোটাকয়েক আজে-বাজে কথার পর বললেন, শোনো তোমাকে একটা বিশেষ দরকারে ডেকেছি।

—বলুন।

—কিরণবাবুর সঙ্গে আমার আপোষ করিয়ে দিতে হবে।

সর্বনাশ! আমার তো বিশ্বাস করতেই কিছুক্ষণ গেল। তারপর বললাম, এত মস্তবড় রাজনীতির ব্যাপার। এ তো আমার কাজ নয়। দু'জনার মধ্যে আপোষের চেষ্টা মাঝে মাঝে যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে যিনি চেষ্টা করেছেন, তাঁর উপর হয়ত আমার আস্থা ছিল না, নয়তো আমার পক্ষ থেকে যিনি চেষ্টা করেছেন, তাঁর উপর আস্থা ছিল না। তাই সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তোমার উপর আমাদের দু'জনারই সমান স্নেহ। তুমি চেষ্টা করলে হবে, এই কথা মনে হতেই তোমাকে ডেকেছি।

বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে যে দু'জনের প্রতি আমার অবিচল ভক্তি

তাঁরাই এই দু'জন। এক জাহাজে একসঙ্গে দু'জনে ভারতে ফিরে উচ্চ সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। রাজনীতির কুটীল চক্রান্তে সেই বন্ধুত্বেও ফাটল ধরল। আমরা যারা রাজনীতির আবর্তের বাইরে থেকে দু'জনকেই সমান ভালোবাসতাম আমাদের পক্ষে এই বিরোধ কতখানি মর্মান্তিক তা ভাষায় জানাবার নয়। এই বেদনা আমরা নিঃশব্দেই বহন করতাম। তাঁদেরও জানাতে পারতাম না।

আমার আরো দুর্ভাগ্য সুভাষচন্দ্র কিরণশঙ্করকে ইউরোপ থেকে যতগুলি পত্র লিখেছিলেন,—কোনোটা সরাসরি কোনোটা অন্যের মারফৎ—তার প্রত্যেকখানিই আমি দেখেছি। শুধু উপরের ধূলো-বালি নয়, অন্তরের অন্তস্থলেও এই বিরোধ কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে, তা আমি জানতাম। তাই যে খবর শুনে আমার মন আনন্দে লাফিয়ে ওঠার কথা, সে খবরেও তা নিস্তেজ হয়ে রইল।

মুখে বললাম, আপনাকে সত্য বলি, ভরসা আমার নেই। তবু আপনি বললেন, সুতরাং আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র এতেই খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন, তা হলেই হবে। তুমি এখনই ফিরে এসে আমাকে খবর দেবে। ভয়ানক তাড়া।

—আচ্ছা বলে বেরিয়ে এলাম।

বেরিয়ে তো এলাম। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ভয়ানক তাড়া। ট্রাম এবং পায়দলে সে তাড়ার চাহিদা মেটানো অসম্ভব। সুতরাং পুনরায় পরেশচন্দ্র।

পরেশ তো কথাটা শুনেই চমকিয়ে উঠল। তখনই তার গাড়িখানা আমাকে সমর্পন করে বলল, আর এক মিনিটও দেরী নয়। তুমি কিরণবাবুর কাছে চলে যাও, সেখান থেকে সুভাষবাবুর কাছ হয়ে আমাকে জানিয়ে যেও। কাল সকালে আমরা দু'জনেই সুভাষবাবুর কাছে যাচ্ছি।

গেলাম কিরণবাবুর কাছে। খবর পেলাম তিনি বাতে শয্যাশায়ী। আমার বিশেষ দরকার শুনে উপরেই আমাকে ডেকে পাঠালেন।

দেখলাম, অসুখটা বেশিই। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা চলছে। একটু আগেই সে পর্ব শেষ করে ডাক্তার বিদায় হয়েছেন। অবসন্নের মত কিরণবাবু পড়ে আছেন। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে মুখ রেখাঙ্কিত হচ্ছে। কিন্তু সে রেখা এত সূক্ষ্ম যে সহজে চোখে পড়ে না।

এত বড় ধৈর্য সচরাচর চোখে পড়ে না।

তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে বলব কি না ভাবছি, বললেন বল এখন একটু সুস্থ বোধ করছি।

বললাম, সুভাষবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।

নিস্পৃহভাবে (আমি জানি এ কৃত্রিম) জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন?

—ভালো নয়।

—তারপরে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টি,—যা মনের অন্তস্থলে তীব্র রশ্মি ফেলে সব দেখে নেয়। যে দৃষ্টির সামনে কিছুই লুকানো চলে না।

বললাম, তিনি আপনার সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিতে চান। তাই আমাকে পাঠালেন।

তাঁর বড় বড় চোখ দুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। বললেন, তাই তোমাকে পাঠালেন। আর তুমি এলে? তুমি কি জানো না.........

হাত জোড় করে বললাম, জানি। কিন্তু কার অপরাধ কতখানি তার মীমাংসা আজকে আর সম্ভব নয়, করে লাভও নেই। আপনি শুধু বিবেচনা করে দেখুন, যারা আপনাদের উভয়কেই ভালবাসে তাদের কাছে এই বিরোধ কতখানি মর্মান্তিক।

কিরণবাবু চুপ করে রইলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি সর্তে আপোষ হবে? সুভাষবাবু কোন সর্ত দিয়েছেন?

—সে তো আপনাদের দু'জনে দেখা হলে তবে ঠিক হবে।

কিরণবাবু বললেন, না সরোজ। আমার শরীর খুব অসুস্থ। বেশি ঝামেলা পোয়াবার সামর্থ নেই। আমার নিজের শুধু একটি মাত্র সর্ত আছে: যে সর্তেই আপোষ হোক, তার তিনটি কপি হবে, একটি তাঁর কাছে থাকবে, একটি তোমার কাছে, একটি আমার কাছে।

সর্ত শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। একটু পরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে আর হোল না।

—কেন?

—আপনাদের দু'জনকে এক জায়গায় এনে দেওয়া পর্যন্ত আমার কাজ। সেই সর্তের একটা কপি আমার কাছে থাকবে, এতবড় অপমান আপনাদের করবার স্পর্ধা আমার নেই।

বাক্যের মর্মপাটা বোধ হয় আবার জাগল। চোখ বন্ধ করে [illegible]

কিরণবাবু বললেন তাহলে যা ভালো বোঝ কর। সুভাষবাবুর কাছে যেতে হলে কয়েকদিন পরে না হলে তো পারছি না।

খুশি হয়ে বললাম, বেশ তো। তাই হবে। তাহলে সেই কথাই সুভাষ বাবুকে বলিগে?

তিনি সম্মতি দিলে উঠে এলাম এবং সুভাষবাবুকে খবরটা দিয়েও এলাম।

পরের দিন সকালে পরেশ আর আমি গেলাম।

সেদিন সুভাষবাবুকে অনেককাল পরে আবার সেই স্নেহশীল রূপে দেখলাম। পরেশ চা খাবেন না, এইমাত্র খেয়ে এসেছেন।

—তা হোক। তবু আমার সামনে আর একটু খাও।

এই যে সামান্য একটি কথা "আমার সামনে" এই একটি কথায় তাঁর স্নেহার্ত হৃদয়কে যেন পরিপূর্ণরূপে দেখা গেল। হয়ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃভূমিকে ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে যাঁদের তিনি ভালোবাসতেন, তাঁদের সঙ্গে বিদায় পর্ব পরোক্ষভাবে শেষ করে নিচ্ছেন।

বললেন, পরেশ কিছু টাকা দাও দিকি।

পরেশ এক বগগা লোক। গম্ভীর ভাবে বললেন, যদি আপনার জন্যে হয় দোব, পার্টির দরকার হোলে দোব না।

সুভাষচন্দ্র হাসলেন। তাঁর সেই অনবদ্য সুন্দর হাসি। পরেশের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার confidence এ জীবনে আর পেলাম না।

কিছু রাজনৈতিক আলোচনার পর সেদিন আমরা এলাম। এরপরে প্রত্যহ সকালে আমার কাজ হল সুভাষবাবু আর কিরণবাবুর মধ্যে তাঁতের মাকুর মত ছুটাছুটি করা।

এর মধ্যে একদিন একটা ফাইল আমার সামনে দিয়ে বললেন, এগুলো পড়ে রাখ।

মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রকে যে-সকল চিঠি লিখেছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে এবং পরে, সেই সমস্ত চিঠি। প্রত্যেকখানি পত্র স্নেহপূর্ণ ভাষায় লেখা, কিন্তু প্রত্যেকখানি এই বলে শেষ করা হয়েছে যে, তাঁদের উভয়ের পথ ভিন্ন, এক নৌকায় একসঙ্গে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়।

এর একখানি চিঠি সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের অত্যল্প পরেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। কাজটা ঠিক হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। কেন তাও বলছি।

চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মহাত্মাজীর ওপর রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে

উঠেছিল। একখানি চিঠিতে এমনও তিনি লিখেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রকে তিনি পুত্রের মত স্নেহ করেন। অথচ উভয়ের মধ্যে এমন কী fundamental difference' (মূলগত মতভেদ) যে কিছুতেই একসঙ্গে কাজ করা যায় না, সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ালে তাঁর বিরোধীতা করতে হবে এবং জিতলে তাঁকে সেই আসন থেকে, এমন কি কংগ্রেস থেকেও সরাতে হবে, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

নিজেকে সামলাতে না পেরে বলেছিলাম, কী ভণ্ডামী !

সুভাষচন্দ্র ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন এই মন্তব্যে। কঠোরভাবে বলেছিলেন, ভণ্ডামী নয়,। মন্তব্য কোরে না। পড়ে যাও।

পরেও দেখা গেছে, নেতাজী সুভাষও পুনঃ পুনঃ ভারতের বাইরে থেকে মহাত্মাজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সেই জন্যে মনে হয়, সেই সময় ওই চিঠিখানি প্রকাশ করা কখনই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

যে যাই হোক, সুভাষচন্দ্র কিরণবাবুর আপোষের সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছিল। এত শিগ্রি এমনটি যে হবে আমি আশা করিনি। অথচ মুস্কিল হয়েছিল এক জায়গায়, কিরণবাবুর অসুস্থতা। এদিকে সুভাষবাবুর আগ্রহ এত বেশি যে বিলম্ব সইছিল না। এই সমস্তটাই কিন্তু রাজনৈতিক নয়, অনেকখানি ভক্তিগত। সম্ভবতঃ চলে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর প্রথম রাজনৈতিক জীবনের বন্ধুকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ ছাড়া আপোষের অতখানি কোনও অর্থই হতে পারে না। নইলে দুদিন পরে যিনি চলে যাবেন তাঁর কাছে আর আপোষের মূল্য কি ?

এই দিন, কিংবা এরপরের একদিন ঠিক মনে নেই, হঠাৎ গভীর খেদের সঙ্গে বললেন, দেখ, বন্ধু আমার টেঁকে না। কেন বল তো ?

কথাটা সত্য। তাঁর সকল বন্ধুর কথা জানিনে। কিন্তু দু'জন অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু, তাঁর জীবনে স্থায়ী হননি।

বললাম, তার কারণ আপনি একজন 'ব্যক্তি' নন।

সুভাষবাবু হেসে ফেললেন, খুব আগ্রহান্বিতও হলেন, বললেন, তার মানে ?

—তার মানে বন্ধুত্ব হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। আপনার গৃহ নেই, পরিজন নেই, সমাজ নেই, সামাজিক মানুষের সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নেই। বন্ধুত্ব হবে কার সঙ্গে ?

—তুমি কি বলতে চাও আমার হৃদয় নেই ? আমি ভালোবাসতে পারিনা ?

তাড়াতাড়ি বললাম, সমুদ্রের মতো বিশাল আপনার হৃদয়। কিন্তু তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অথবা সেই প্রশান্ত মহাসাগরে কোন জেলের ডিঙ্গি কোথায় হারিয়ে গেল, খবর রাখার সময়ই নেই। আপনাকে যারা ভালোবেসেছে সংসারে তাদের চেয়ে হতভাগ্য জীব আর নেই।

সুভাষবাবু হাসতে লাগলেন, কি মনে করে জানি না।

বলছিলাম, এই সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভাবে কে ?

বললেন, ইংরাজ থাকতে নিভবে না।

—ইংরেজ চলে গেলে ?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন সুভাষচন্দ্র। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দেখ ইউরোপ ঘুরে এসে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, স্বাধীনতার পরে অন্ততঃ কুড়ি বছরের জন্যে benevolent dictatorship (সদাশয় স্বৈরতন্ত্র) না হলে এই দেশকে সর্বদিকের এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচানো যাবে বলে আমি মনে করিনা। রাজনৈতিক আদর্শের কথা ছেড়ে দিয়ে রাশিয়া, ইটালী কিংবা জার্মানীর দিকে চেয়ে দেখ, কত অল্পদিনে জাতটাকে কি রকম গড়ে তুললে।

হঠাৎ বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না হে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে এমন জোর দিয়ে বললেন যে, এরপর আর কোন প্রশ্নেরই আবশ্যক হোল না।

আমি বললাম, আচ্ছা তাহলে আমি আসি।

গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ হোল, বোসো।

তারপরে সেক্রেটারীকে বললেন, বলুন আজ আমার শরীর খুব খারাপ। আর একদিন যেন টেলিফোন করে আসেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। বাংলায় রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র দেখাই করলেন না। বরং মনে হল তাঁর আসাতে তিনি একটু বিরক্তই হয়েছেন।

শেষের দিকে যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলোচনা এর মধ্যে হয়েছে। কিন্তু তিনি আজ অনুপস্থিত। সুতরাং সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত নয়। এইটুকু বলতে পারি তাঁদের কারো কারো পরে তিনি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। একজনের সম্বন্ধে তিনি এমনও বলেছিলেন যে, ভদ্রলোক hundred and twenty per cent মিথ্যে কথা বলেন। শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার তাঁর 'সুভাষের সঙ্গে

বারো বছর' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগের আগে খুব তিক্ততা নিয়েই গিয়েছিলেন। কথাটা যে সত্য আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। তাঁর অন্তর্ধানের আগের দুই সপ্তাহ আমি প্রত্যহ সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। এই মূল্যবান ঘণ্টা-গুলিতে তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তার অনেক কিছু আজও বলবার সময় আসেনি। তিনি ফিবে না এলে বলবার সময় হবেও না।

কিন্তু সে কথা যাক।

কিরণবাবুর সঙ্গে আপোষের কোন বিঘ্নই দেখা দিল না। উভয়েরই কোন সর্ত ছিল না। উভয়েই তাঁদের পুরাতন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঝালাই করবার জন্ত ব্যাকুল। বিঘ্ন দাঁড়ালো উভয়ের স্বাস্থ্য। উভয়েই শয্যাগত, একের অন্যের কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ কবাব সামর্থ নেই। অথচ সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত।

অবশেষে কিরণবাবু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের দিন এবং সময়ও স্থির হোল। ব্যবস্থা হোল সেই সময় আমি কিরণবাবুকে নিয়ে সুভাষবাবুর কাছে আসব।

কিন্তু ভাগোব এমনই পরিহাস, নির্দিষ্ট দিনের আগেব দিন কিবণবাবু আবাব সায়টিকায় আক্রান্ত হলেন। ফোন এল, তারিখটা পিছিয়ে দেবার জন্যে। খবরটা সুভাষবাবুকে দিতে তিনি যেন দমে গেলেন। অথচ উপায় কি? কয়েকবারই তিনি বললেন, কোন রকমে তাঁকে আনা যায় না।

তখন কি জানি, তিনি দেশে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাই এত তাড়া? তাহলে কিরণবাবু যে-কোন উপায়েও দেখা করতেন। কিন্তু কে জানে তখন সে কথা।

অবশেষে সুভাষবাবু বললেন, বেশ তাই হবে। তবে আসবার আগে একটা ফোন করে এস।

এর দু'দিন পবেই কিরণবাবুর টেলিফোন পেলাম, তিনি প্রস্তুত। পরের দিন সকালেই সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।

উল্লসিত হয়ে তখনই টেলিফোন করলাম, সুভাষবাবুর কাছে। খবর পেলাম, তিনি দরজা বন্ধ করে সাধনায় বসেছেন। তাঁকে খবর দেবার কোন উপায় নেই। সুতরাং পরে দেখা হবে।

সে আর এমন কি ব্যাপার! না হয় কদিন পরেই দেখা হবে। কিন্তু বলা বাহুল্য আর দেখা হয়নি। সেই সাধনার আসন' থেকেই তিনি অন্তর্হিত হন। সে কথা সকলেই জানেন।

অনেকে বলেন সুভাষচন্দ্রের এই অসুস্থতা একটা ছল মাত্র। আমার নিজের কিন্তু তা মনে হয়নি। বরং সত্য সত্যই তাঁকে খুব দুর্বলই দেখেছিলাম। এবং সে দুর্বল অবস্থাতে কি করে তাঁর পক্ষে কাবুল যাত্রা করা সম্ভব, তা ভেবেও কোনদিন বিস্ময় অনুভব করিনি। আমি যে সুভাষচন্দ্রকে জানি, দুর্জয় তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁর দেহ সকল অবস্থাতেই সেই ইচ্ছাশক্তির অধীন। শারীরিক দুর্বলতা কোন দিনই তাঁর দেশপ্রেমের প্রতিবন্ধক হতে সাহস করেনি। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এ শক্তি সম্ভবতঃ একমাত্র তাঁরই ছিল।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর যে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আমার মনকে আলোড়িত করেছে, সে হচ্ছে গান্ধীজির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন নিয়ে তাঁর সংঘর্ষ। এর আগে আর কোন কংগ্রেস-নেতা দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হবার জন্য এমন জেদ করেননি। অথচ তিনি করেন। কেন? গান্ধীজিরও তিনি পুত্র-তুল্য, প্রতিদ্বন্দ্বী কখনই নন। অথচ গান্ধীজি তাঁর নির্বাচন প্রস্তাবের প্রকাশ্য এবং অশোভন বিরোধীতা করেন। এমন কি সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার পরাজয়কে তিনি নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি; এই বা কেন?

অনেকে মনে করেন সুভাষচন্দ্র সন্দেহ করেছিলেন, গত মহাযুদ্ধে গান্ধীজি কিছুতেই ইংরেজকে বিব্রত করবেন না। (যদিও কার্যতঃ ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে তিনি তা করেছিলেন) তাই অসহিষ্ণু তরুণ সম্প্রদায়ের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় দেবার জন্যে তিনি পুনরায় নির্বাচন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর Indian Struggle পুস্তকে স্পষ্টতঃ তিনি লিখেছিলেনও; Mahatma Gandhi had rendered and will continue to render phenomenal service to his country. But India's salvation will not be achieved under his leadership (৪১৪ পৃঃ) অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্বদেশের প্রভূত সেবা করেছেন এবং করবেনও। কিন্তু ভারতের মুক্তি তাঁর নেতৃত্বে আসবে না।

কিন্তু এই বইখানি ১৯৩৪ সালের রচনা। তারপর গান্ধীজির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই মধুর এবং হৃদ্য হয়েছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এ মত তাঁর ছিল কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কংগ্রেসে অবারিত নয়। তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটির মতানুযায়ীই চলতে হবে। সুতরাং সেই পদের জন্য লোভার্ত হবার পাত্র আর যেই হোন সুভাষচন্দ্র নন। দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজির মত

ব্যক্তি তাঁর অভ্রভেদী মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে তাঁর পুত্র-তুল্য এক তরুণের বিরুদ্ধে স্বহস্তে অস্ত্রধারণ করবেন কেন, এও কি একটা প্রশ্ন নয়?

আগেই বলেছি, সুভাষচন্দ্রকে লেখা মহাত্মাজির অনেকগুলি চিঠি আমি নিজে দেখেছি। এই সমস্ত পত্রের স্নেহপূর্ণ ভাষাকে ভণ্ডামি বলে অভিহিত করার জন্য তিরস্কৃতও হয়েছি। এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি হতে পারে, তাও তো ভেবে দেখবার!

এই প্রসঙ্গে একটি সন্দেহ আমার মনে ওঠে। আমার মনে হয় তাঁর হিটলার-মুসলিনীর সঙ্গে মৈত্রী এবং তাঁদের সাহায্যে বাইরে থেকে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে ভারতকে বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র গান্ধীজিকে জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতিভাবে ভারত ত্যাগ করতে পারলে সুভাষচন্দ্রের প্রয়াসে যথেষ্ট সুবিধা হবে বলেই তিনি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হবার জন্য অতখানি জেদ দেখিয়েছিলেন এবং তাতে সাফল্য লাভ করেছিলেন। পক্ষান্তরে মহাত্মাজী সম্ভবতই এই পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। পত্রে পুনঃ পুনঃ যে fundamental difference-এর তিনি উল্লেখ করেছিলেন, সে কি এই নয়! এরই জন্যে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে অশোভন বিরোধীতা করাই কি গান্ধীজির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না?

অবশ্য এ আমার অনুমান মাত্র। সত্য হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে সেদিন বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু কে সে সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করবে?

সুভাষচন্দ্র আজ এখানে অনুপস্থিত। যাঁরা বলেন, তিনি জীবিত নেই, তথ্যসহ কোন প্রমাণ তাঁদের হাতে নেই। যাঁরা বলেন জীবিত, নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ তাঁদের হাতে নেই। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভারতবর্ষ তাঁকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা শুধু নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনকে ফিরে পাবার হৃদয়গত ব্যাকুলতাই নয়। তার সঙ্গে আছে প্রয়োজনের তাগিদ। ভারত আজ স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু তৃপ্তি পায়নি, পায়নি সুখ সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। এই অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে অভাব ও দুর্দ্দশার আঘাতে-বারে বারে তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করে সকাতর আহ্বান উঠেছে: সুভাষ তুমি কোথায়? ফিরে এস, ফিরে এস। কে জানে সে আহ্বান তাঁর কানে পৌঁছুচ্ছে কি না।

॥ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ॥

—রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুভাষচন্দ্রকে খুব বাল্যকাল হইতেই চিনিতাম। ১৯০৪ সনে আমি কটক র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে (এখনকার দশম শ্রেণীতে) ভর্তি হই। সুভাষ তখন আমার এক ভাগ্নের সঙ্গে ঐ স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়িত এবং আমাদের বাড়িতে আসিত। তারপরে এই পরিচয়ের সূত্রেই কলিকাতায ভবানীপুরে আমাদেব বাড়ীতে তাহাকে দেখিয়াছি। সুভাষ খুব অমায়িক স্বভাবের ছিল এবং আমাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও মামী, মাসি ইত্যাদি সম্বোধনেব দ্বারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল।

সুভাষ তারপর এখানকার বিশ্ববিদ্যালযের ডিগ্রী পাইয়া বিলাত গেল। ফিরিয়া আসিয়া রাজনীতিতে যোগ দিল—এই সকল যখন হয় তখনও মাঝে মাঝে দেখা হইত। তাঁহার সহিত রাজনীতি বিষয়ে কথাবার্তা ও আলোচনার ফলে আমার সন্দেহ হইযাছিল যে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ আছে। কিন্তু আমি কখনও এ বিষযে স্পষ্ট কোন প্রশ্ন করি নাই। ১৯২১ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ২১ বৎসব ঢাকায়ই ছিলাম। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতাম। সুভাষ একবার আমাকে বলিল যে দেশের কাজের জন্য তাহার অনেক অর্থের প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষকদেব নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া আমি মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিলে ভাল হয। ঢাকার অধ্যাপক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঘোষ ও আমি যে এইরূপ গোপনে বিপ্লবীদিগকে সাহায্য করিতাম তাহা সে জানিত। সম্ভবতঃ জ্ঞান ঘোষকেও এই কথা বলিযাছিল। আমি ঢাকায় জ্ঞান ঘোষকে বলিলাম। আমাদের চাঁদা আদায়ের পদ্ধতি ছিল এইরকম। এক একজন শিক্ষকের নিকট গিয়া আমরা বলিতাম, তুমি দেশের কাজের জন্য এত টাকা দাও—কি কাজ কাহাকে দিলে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিও না। সকলেই বুঝিত। সুতরাং কোন প্রশ্ন করিত না। মাসের নির্দিষ্ট দিনে রাত্রি দশটা কি তারও পরে বিপ্লবী একজন আমার বাড়িতে টাকা নিতে আসিত। আমি নগদ টাকা তাহার হাতে দিতাম। একবার একজন

আসিয়া বলিল পুলিশ তাহার সন্ধান পাইয়াছে এই আশঙ্কায় সে সারাদিন লুকাইয়া ছিল কিছু আহারাদি করে নাই। তখন তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া প্রায় দুপুর রাত্রে তাহাকে বাড়ীর পশ্চাতের দরজা দিয়া বাহিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। সুভাষের বেলায়ও এইভাবে অর্থ সাহায্য করিতাম।

সুভাষ একবার ঢাকায় গিয়াছিল। সে তখন এত জনপ্রিয় ছিল যে খোলা মাঠে সভায় তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইত। একবার আমার গাড়ীতে তাহাকে নিয়া সভাস্থলে যাওয়া মাত্র এত লোক আমার গাড়ীর পাদানে ও উপরে উঠিল যে গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইল। সুভাষ দুই হাত জোড় করিয়া তাহাদের নামিতে অনুরোধ করায় সকলে তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল। ইহার পূর্বে আর একটি সভায় খুব লোকের ভীড় হইয়াছিল এবং তাহারা সুভাষকে ঘিরিয়া ধরায় এই সভায় আসিতে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। সুভাষ প্রথমেই সে জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আজকালকার রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে এরূপ সৌজন্য বড় দেখা যায় না।

সুভাষের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় ১৯৪০ সনের ডিসেম্বরে মাসের শেষ সপ্তাহে। সুভাষ তখন জেলখানায় পীড়িত হওয়ায় এলগিন রোডে তাহার নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী অবস্থায় ছিল। আমি বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা আসিয়াছিলাম। একদিন আমার এক বিশেষ পরিচিত ছাত্র—Calcutta National Bank-এর প্রতিষ্ঠাতা শচীন ভট্টাচার্য—আমাকে আসিয়া বলিল যে সুভাষ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। আমি বলিলাম সে তো অসুস্থ। তার বাড়ির দরজায় সেপাই শান্ত্রী। আমি কিরূপে তাহার সাক্ষাৎ করিব। শচীন্দ্র বলিল, যে সব ব্যবস্থা হইবে। আপনি—তারিখে সন্ধ্যার পরই যাইবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আমি এলগিন রোডের বাড়িতে গেলাম। বাড়ির দরজায় ২।৩ জন পুলিশ বা মিলিটারী লোক ছিল—কিন্তু তাহারা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ভিতরে যাইতে কোনরূপ আপত্তি করিল না। আমি দোতলায় উঠিলাম—সবই প্রায় অন্ধকার; লোকজন কেহ নাই। কি করিব ভাবিতেছি এমন সময়ে একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল। আমার নাম শুনিয়াই বলিল—আসুন আমার সঙ্গে। পরিচয় দিল সে সুভাষের ভাইপো। আমি তাহার পিছে পিছে একটি কি দুইটি শূন্য কক্ষ পার হইয়া

আর একটি কক্ষের রুদ্ধ দ্বারে কাছে পৌঁছিলাম। সে বলিল: "আমার আর যাইবার অনুমতি নাই। আমি চলিয়া যাইতেছি। আপনি তাহার পর এই দরজা খুলিয়া ভিতরে যাইবেন।" ভিতরে গিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোনে একটি খাটের উপর সুভাষ শুইয়া আছে। তাহার মুখময় দাড়ি গজাইয়াছে। মনে করিলাম অসুস্থ বলিয়াই বোধ হয় দাড়ি কামায় না। খাটের নিকটে একখানি চেয়ার ছিল। তাহাতে বসিয়া সুভাষের শারীরিক অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম আমাকে কেন ডাকিয়াছ। সুভাষ বলিল—কিছু টাকার দরকার। আমি বলিলাম, তুমি তো পীড়িত; শয্যাশায়ী—এ অবস্থায় টাকা দিয়া কি করিবে? সুভাষ একটু হাসিয়া জবাব দিল—এ প্রশ্ন তো কোন দিন করেন নাই; টাকা চাহিলেই দিয়াছেন—আর সেই ভাল—কারণ আপনারা বিপদে পড়েন এটা আমরা চাই না। আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম—সে কথা ঠিক, টাকা কিসের জন্য চাও কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে টাকা চাওয়া মানে কাজে লিপ্ত হওয়া—তোমার এই গুরুতর অসুখ, তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে বলিয়াই তোমাকে জেল হইতে বাড়ী পাঠাইয়াছে। এই অবস্থায় তোমার বিশ্রাম দরকার—এই জন্যই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সে বলিল, না আমার অসুখ গুরুতর নয়। তারপর কিভাবে কাহার মারফত টাকা পাঠাইতে হইবে ইহা স্থির করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। আসার সময় বলিল, ছোট মামীকে (আমার স্ত্রীকে) আমার প্রণাম জানাইবেন।

পরদিন কিংবা তার পরদিন আমি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দাড়ি রাখা, আসিবার সময় মামীকে প্রণাম জানানো ইত্যাদি ব্যাপারে কি রকম একটা সন্দেহ জাগিল। ১৯৪১ জানুয়ারী মাসের প্রথমেই আমি ঢাকায় ফিরিয়া গেলাম। তার ১০।১২ দিন পরেই খবরের কাগজে পড়িলাম সুভাষ বাড়ি হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। তখন বুঝিলাম, সে দূর যাত্রায় গিয়াছে—তাহার দাড়ি রাখা, টাকা চাওয়া, প্রণাম জানানো—সকলই বেশ পরিষ্কার হইল। তবে জীবনে আর কখনো দেখা হইবে না, ইহা মনে করি নাই।

[শ্রীবীরেশ মজুমদার সম্পাদিত "যুগধ্বনি", ১ম খণ্ড; দ্বাদশ সংখ্যা হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত।]

॥ মেয়র সুভাষচন্দ্র ॥

—অমল হোম

পুজোর সময় দার্জিলিংয়ে ছিলাম। ২০শে অক্টোবর সেখানে টেলিগ্রাম পেলাম সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে—

Appointed Editor Municipal Gazette (Stop) First issue must come out first week November (Stop) Please come take charge (stop) উত্তরে জানালাম, ২৫শে কলকাতায় ফিরেই দেখা করব। ২৫শে সকালে রানাঘাট স্টেশনে "স্টেট্‌স্‌ম্যান" খুলে খবর দেখলাম SUBHAS BOSE ARRESTED. কলকাতায় পৌঁছেই গেলাম কর্পোরেশন অফিস। সেখানে তখন মেয়রের ঘরে পরামর্শ সভা চলছে। একটু পরে দেশবন্ধু কর্পোরেশনের সেক্রেটারী রামিয়াঁকে ডেকে বললেন, "মিউনিসিপ্যাল গেজেটের কাগজপত্র সব দাও এঁকে।' আর আমাকে বললেন—"সুভাষ জেলের মধ্যে যাতে কর্পোরেশনের জরুরী ফাইল দেখতে ও কর্পোরেশনের অফিসাররা কাগজপত্র নিয়ে তার কাছে যেতে পারে তার চেষ্টা করছি। সে ব্যবস্থা হলে তুমি জেলে গিয়ে সুভাষের কাছ থেকে সব বুঝে নিও।

*　　　*　　　*

দিনটা স্পষ্ট মনে আছে। ১লা নভেম্বর, ১৯২৪। প্রেসিডেন্সী জেলে পৌঁছলাম বিকেলে। ইণ্টারভিউ সাড়ে চারটায়। পাঁচ মিনিট আগে একজন পুলিশ অফিসার এসে আমাকে নিয়ে গেলেন জেল গেটের কাছে ছোট্ট একটা কামরাতে। একখানি ছোট টেবল্‌-এর মুখোমুখি দু'খানা চেয়ার। মিনিট-খানেক পরে সুভাষচন্দ্র এসে ঢুকলেন ঘরে। তাঁর পিছনে আরেক জন পুলিশ অফিসার। নমস্কার-সম্ভাষণ ও মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর সম্পাদক পদে আমার নিয়োগ—ইতিবৃত্ত একটু জানিয়ে ও আমার সাফল্য কামনা করে পুলিশ অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এঁর মেয়াদ কত?" "আধ-ঘণ্টা", তবে তো অনেকক্ষণ।" "আসুন কি এনেছেন দেখি।" কাগজের প্রথম সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ ছবি আমি এসে ভার নেবার আগেই

সুভাষচন্দ্র কিছু সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। আমার সংকলিত ও রচিত লেখাগুলি দেখে আমার মুখবন্ধ প্রবন্ধটিতে মনোনিবেশ করলেন। তাতে যেখানে তাঁর কর্মপ্রতিভার উল্লেখ ছিল সেটি কেটে দিয়ে বললেন—"মেয়রকে একবার দেখিয়ে নেবেন।" (সুভাষচন্দ্র তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officer) দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের পরিত্যক্ত প্যারাগ্রাফটি আবার বসিয়ে দিয়েছিলেন। সুভাষের প্রতি তাঁর আস্থার অন্ত ছিল না। শুনেছি কর্পোরেশনের কাজকর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোন বিশিষ্ট অনুগামী একদিন কিছু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা মাত্রই তিনি বলেছিলেন—"Well I have given you Subhas, the best of jewels. Wait and you will have everything !"

ইতিমধ্যে চা এল। বাড়ী থেকে বৈকালিক জলযোগের উপাদান-উপকরণ এসেছে প্রচুর। আহারে সুভাষের অরুচি ছিল না কোনদিনই। "জেলের খাবার নয়—আসুন, নিন তুলে" এই বলে প্লেট এগিয়ে দিলেন।

*　　　　*

—"If Subhas Chandra Bose a criminial, I am a criminal. If Subhas Chandra Bose is a revolutionery, I am a revolutionery. Why have they not arrested me ? I should like to know why, why ?"

২৯শে অক্টোবর; ১৯২৪। সূচীপতন নিঃশব্দ কর্পোরেশনের সভায় দাঁড়িয়ে কলকাতার মেয়র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, করছেন এই প্রশ্ন। তাঁর চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কণ্ঠে বজ্রমন্দ্র; দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত বার বার সজোরে সশব্দে নেমে আসছে তাঁর আসন-সম্মুখস্থ টেবল্-এর উপর। চৌত্রিশ বছর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও দেখছি—যেমন সেদিন দেখেছিলাম—সেই শুভ্রবসন, দীর্ঘদেহ দীপ্তমূর্তি: আজও শুনছি যেন সেই আবেগ কম্পিত ভাষণ:

"If love of country is a crime, I am a criminal. Not only the Chief Executive Officer of this Corporation, but the Mayor of this corporation is equally guilty. I plead guilty to the charge. If that is a crime, I am ready to be hanged for it, rather than shirk the duty which I feel to be the duty of every Indian to-day."

সে বক্তৃতা কোনদিন পারব না ভুলতে।

ঠিক এর চারদিন আগে, ২৫শে অক্টোবর, কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুকে রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গেই অতর্কিতে তাঁর বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে পোরা হয়েছে—দেশবন্ধুর আরো ক'জন অনুগামী সহকর্মীর সঙ্গে—ইংরেজের অস্ত্রশালার সেই পুরণো মরচে-পড়া হাতিয়ার ১৮১৮ সনের তিন আইনের জোরে। কংগ্রেসের স্বরাজ্য দলের কুক্ষিগত কর্পোরেশনকে ইংরেজ সরকার সুনজরে পারেন নি দেখতে। তাদের নগর পরিচালন ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়াই ছিল সেদিন তাদের সঙ্কল্প।

।

ভগ্নস্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন নির্বাসন থেকে তিন বছর পরে—দেশবরেণ্য, কলকাতার পৌরশাসন সংস্কারে অপূর্ব-নিষ্ঠা, অদম্য কর্মশক্তি যা ব্যর্থ হল ষড়যন্ত্র ও স্বৈরাচারে; তা নিয়োজিত হল রাষ্ট্রক্ষেত্রে—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। কিন্তু তাই বলে সুভাষচন্দ্র কোনদিনই যৌবনের সেই বিরাট কর্মক্ষেত্রকে ভোলেন নি। শুধু "ভোলেন নি" বললে কম বলা হবে। যতদিন তিনি দেশে ছিলেন, এই নগরীর পরিচালনা ব্যবস্থার সবক্ষেত্রে তাঁর সম-আগ্রহ ও সমদৃষ্টি ছিল। যে কর্পোরেশনকে দেশবন্ধু দরিদ্র নারায়ণের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন, তার আচার বিচারে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, সুভাষচন্দ্র চিরদিন তাকে ভালোবেসেছেন, তার অধিকার সংকোচে, তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এ-সংগ্রামকে তিনি দেশের মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিকাতেই দেখেছেন, তারই অংশ বলে জেনেছেন, কেবল মাত্র নাগরিক দৃষ্টি থেকে দেখেন নি। তাঁর পক্ষে তা অসম্ভব ছিল।

দেশের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তাঁর বিধিনির্দিষ্ট আসন নেবার কিছুদিন পরে সুভাসচন্দ্র কর্পোরেশনে প্রবেশ করলেন—একজন সাধারণ সদস্যরূপে। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই বিস্তারিত হল পৌরশাসনে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই কর্পোরেশনের কর্মধারা দেখলাম অন্য খাতে বইল। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে কমিটির অধিবেশন সুরু হচ্ছে; আলোচ্য বিষয়গুলি যথাযথ দ্রুত বিবেচিত হচ্ছে—শৈথিল্য অন্তর্হিত, বৃথা বাক্য-বিতর্ক স্তব্ধ প্রায়। যত কাজ যেখানেই থাকুক না কেন, কলকাতায় থাকলে সুভাষচন্দ্রকে কখনই কোন কমিটিতে অনুপস্থিত দেখি নি। তারপরে ১৯৩০-এ তিনি তখন জেলে—সুভাষচন্দ্র অল্ডারম্যান নির্বাচিত হলেন ১৮ই আগষ্ট। মুক্তি পেয়ে তিনি মেয়র

নির্বাচিত হলেন ২২শে সেপ্টেম্বর কর্পোরেশনের সভায়। সেদিনের সম্বর্ধনা আজো মনে আছে। আর মনে আছে স্মিতহাস্য নতুন মেয়রের ভাষণ। পঁচিশ বছর একাধিক নব-নির্বাচিত মেয়রের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ হয়েছে আমার—নানা ভাবের, নানা সুরের। কিন্তু এমন আবেগ উচ্ছ্বাসহীন, শান্ত-সংযত, কর্মমুখর ভাষণ, এমন আদর্শপ্রতিষ্ঠ বক্তৃতা এক দেশবন্ধুর প্রথম মেয়র পদে সমাসীন সম্ভাষণ ছাড়া আর শুনিনি—আগে কিম্বা পরে। তাঁর সেই ভাষণের শেষ কথাগুলি আমার প্রায়ই মনে পড়ে—

"I shall say once again in the words of our great—'Life is one whole'. You cannot seperate civics from politics and economics. Can any one seriously maintain that the corporate life of Calcutta can be cut off and seperated from the life of the whole nation ? The dream that I dream is that of a Free India with a social order and a body politics based on the universal principles of Justice, equality and love. If you want to reconstruct your national life on these basis, is it not also necessary that the corporate life of Calcutta should be reconstructed on these principles ?"

* * *

১৯৩১-এর ১৯শে জানুয়ারী সকালবেলা খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম বহরমপুর থেকে মালদা যাবার পথে একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন থামতেই কলকাতার মেয়রের উপর পুলিশ সাহেব ১৪৪ ধারা জারী করে তাঁর মালদায় ঢোকা বন্ধ এই হুকুম জারীর সঙ্গে সঙ্গেই সে হুকুম মানতে তাঁর অস্বীকৃতি ও তৎক্ষণাৎ তাঁর গ্রেপ্তার; ওয়েটিং রুমে আগে থেকেই বসানো আদালতে বিচার ও সাতদিনের জেল, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল রাজশাহীতে কিন্তু জনসাধারণের উত্তেজনায় আতঙ্কিত ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানকার জেলে তাঁকে আটকে রাখতে সাহস পেলেন না—তাঁকে রাত্রির অন্ধকারে নাটোর স্টেশনে এনে তুলে দিলেন পুলিসের হেফাজতে, কলকাতাগামী দার্জিলিং মেলে। ২৫শে জানুয়ারী কাগজে দেখলাম আগের দিন সন্ধ্যার সময় ছাড়া পেয়ে মেয়র কলকাতায় এসেছেন। ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবসে' খবরের কাগজে বের হল ব্রিটিশ প্রাইম মিনিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-এর গোল-টেবিল বৈঠক বসানোর প্রস্তাব প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি—ভায়োলেন্ট,

নন্‌-ভায়োলেন্ট সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের সর্তবিহীন মুক্তির দাবী। আর দেখলাম, আগের দিন কলকাতা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়রের উপর নোটিশ জারী হয়েছে যে, 'স্বাধীনতা দিবসে' কোন সভা সমিতিতে বা প্রসেশনে তাঁর যোগদান নিষিদ্ধ। সর্বসাধারণের উপরেও সে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে।

দুপুর বেলা, ১২টা আন্দাজ, কর্পোরেশন আপিসে কাজ করছি, আমার টেলিফোন বেজে উঠলো। সুপরিচিত কণ্ঠস্বর—"একবার আসবেন"? "কোথা থেকে বলছেন"? উত্তর এলো. "কর্পোরেশন আপিসে আমার ঘর থেকে"। একটু আশ্চর্য লাগল। তখন তাঁর আসার কথা নয়। সচরাচর মেয়র বিকালেই আসতেন। তাঁর ঘরে এসে দেখলাম কর্পোরেশনের এডুকেশান অফিসার ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার, পরে লাইসেন্স অফিসার শৈলেন ঘোষাল ও আরো কয়েকজন সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই সুভাষচন্দ্র হেসে বললেন—"আপনার এ সপ্তাহের কাগজের জন্য খুব ভালো খোরাক তৈরী হচ্ছে। আপনি তৈরী তো? আপনার ফটোগ্রাফারকে খবর দিন।" তারপর সব বললেন খুলে। "বেলা ঠিক তিনটায় কর্পোরেশন আপিস থেকে কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের প্রসেশন বের করব, মনুমেণ্টের নীচে মিটিং করব, ঝাণ্ডা তুলব। আমার সঙ্গে ক্ষিতীশ ও শৈলেন থাকবেন। দেখুন কি হয়।"

বেলা দুটো আন্দাজ কর্পোরেশনের আপিসের চত্বর ভরে গেল কংগ্রেস ভলান্টিয়ারে; কর্পোরেশনের কর্মীতে। সাড়ে তিনটার একটু পরে শঙ্খ-নিনাদ ও "বন্দেমাতরম" ধ্বনির মধ্যে মাল্যবিভূষিত চন্দনচর্চিত ললাট মেয়র বের হলেন প্রসেশন নিয়ে। তাঁর এক পাশে এডুকেশান অফিসার, আর এক পাশে ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার। হোয়াইট-ওয়ে-লেডলর কাছে পুলিস এসে হুকুম দিলেন 'প্রসেশন ভাঙ্গো'।· মেয়র বললেন, 'চলবে প্রসেশন।' মিছিল চলল চৌরঙ্গী পার হয়ে। ময়দানে পড়তে না পড়তেই হুড়মুড় করে সওয়ার-পুলিস এসে পড়ল, আর নিরেট চামড়ার বেঁটে মোটা থেঁটেল বর্ষণ সুরু হোল প্রসেশনের উপর। মেয়রই হলেন এই বেধড়ক মারের বিশেষ লক্ষ্য। দুদিক থেকে দুটো সওয়ার এসে তাঁকে পেটাতে সুরু করলে! হাত ভাঙ্গল, মাথা ফাটল, রক্তে ভেসে গেল। লাল হয়ে গেল সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী আর চাদর। তার সঙ্গীদেরও ছেড়ে কথা বলে নি। ক্ষিতীশপ্রসাদ তাঁর হাতের নিশানের ডাণ্ডাটা সুভাষচন্দ্রের মাথার উপর ধরে লাঠি আটকাবার চেষ্টায় আরো বেশি মার খেলেন—মাথা ফাটল তাঁর। শৈলেশের

একই অবস্থা। তারপর রক্তাপ্লুত মেয়রকে টেনে হিঁচড়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে গেল লালবাজারে।

পরদিন ২৭শে জানুয়ারী ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট লোকে লোকারণ্য। জিগির উঠছে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ", "সুভাষচন্দ্র কি জয়।" চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবরো সাহেবের ঘরে কলকাতার মেয়রের আইন অমান্য অপরাধের বিচার। কক্ষে তিলার্ধ স্থান নেই। অনেক কষ্টে পারলাম ঢুকতে। হুজুর বসলেন এসে এজলাসে। বসেই হুকুম দিলেন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উকীল ও কোর্টের লোক ছাড়া আর সকলকে। থাকতে দেওয়া হল শুধু ডেপুটি মেয়র সন্তোষকুমার বসু ও সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে। পাবলিক প্রসিকিউটর তারক সাধু মশায়ের অনুগ্রহে আমি পেরেছিলাম থাকতে। তারপর হুকুম হল নিয়ে এসো আসামীকে। ডকে এসে দাঁড়ালেন রক্তসিক্ত কলকাতার মুখ্য নাগরিক—The First Citizen of Calcutta, হাতে একটা কাপড়ের ফালি জড়ানো, কপালে মাথায় গোটা কয়েক পটি বাঁধা। ম্যাজিস্ট্রেটের উত্তরে মেয়র জানালেন যে, তিনি নন-কো অপারেটর। অতএব আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিচারের কোন সহায়তা তিনি করবেন না। ছ'মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম হবার পর সুভাষচন্দ্র কোর্টকে জানালেন আগের দিন তাঁর সঙ্গে লালবাজার হাজতে পুলিসের ব্যবহার। বাড়ী থেকে খাবার ও কাপড়-চোপড় পাঠানো হয়েছিল। তা তাঁকে দেওয়া হয় নি। তখন তাঁর অশৌচ, তাঁর ছোট ভাই সন্তোষচন্দ্র কয়েক দিন আগে মারা গিয়েছেন। হাজতের খাবার তাঁর পক্ষে খাওয়া সম্ভব ছিল না। থাকতে হোল অভুক্ত। ভাঙ্গা হাতের জন্য স্লিং চেয়ে পান নি—প্রাথমিক চিকিৎসার পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয়নি—শুধু পেয়েছিলেন ছিপি খোলা আধ শিশি টিঞ্চার আয়োডিন। জ্বর হয়েছিল, কিন্তু হাজতে থার্মামিটার পাওয়া যায়নি। কলকাতার মেয়র আহত অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায়, বিনা আহারে, বিনা স্নানে, বিনা বেশ পরিবর্তনে পুলিস কোর্টের ডকের উপর দাঁড়িয়ে। দেখবার মতো দৃশ্য। রক্সবরো সাহেবের নির্দেশে কোর্টের লক-আপে সুভাষচন্দ্রকে কাপড়-চোপড় বদলাতে ও কিছু ফল আর একটু দুধ খেতে দেওয়া হোল। আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন সুভাষ, "বলুন ঠিক বলেছিলাম কি না এ সপ্তাহে গেজেট-এর অনেক খোরাক পাবেন আপনি।' তখন তাঁকে জানাবার সুযোগ পাই নি যে, ময়দানে সওয়ার-পুলিসের হাতে পিটুনীর ছবি পর্যন্ত পেরেছি সংগ্রহ

করতে। সে ছবি কাজে লেগেছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার; সৈয়দ হাসান ইমাম ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে কর্পোরেশন যে তদন্ত কমিটি বসিয়েছিলেন সেই কমিটিতে।

অমল হোম সংকলিত ('এক, দুই, তিন')-এর অন্তর্গত 'সুভাষ-স্মৃতিকথা' হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত।

॥ নেতাজী—চেনা ও অচেনা ॥

—হাবিলদার হায়াৎ সিং নেগী

তখন যুদ্ধের ফলাফল আর বেশী দূরে নহে। নেতাজী তখন খুবই কর্মচঞ্চল। নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করেন সমস্ত শিবির।

সেটা ১৯৭৫ সাল, সেদিন ২৩শে মার্চ। বার্মাতে তখন বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। নেতাজী ঘন ঘন সৈন্যদের শিবির পরিদর্শন করিতেছেন। ঐ সময় সৈন্যদের অগ্রবর্তী ঘাটি ছিল মিকটিলায়। সেদিন নেতাজী মিকটিলায় সৈন্যদের মধ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও রণনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দানের পর ইহার ঠিক পিছনের ঘাঁটি পেমনাতে সৈন্যদের অবস্থা পরিদর্শন করিবেন এই মর্মে এক ব্যক্তি মারফৎ সংবাদ প্রেরণ করেন। 'সংবাদ দাতা' ঐ ঘাঁটির সৈন্যদের জানান, নেতাজী সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় তাহাদের নিকট পৌঁছাইবেন। 'সংবাদ দাতা' নিজেও ঐ শিবিরে নেতাজীর আগমণের প্রতীক্ষায় থাকেন। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু নেতাজী আসিয়া পৌঁছাইলেন না। সৈন্যগণ সকলে ইহাতে বিচলিত হইলেন। তাঁহারা ব্যগ্রকণ্ঠে 'সংবাদ দাতা'র নিকট নেতাজীর সময় মত না আসিবার হেতু জানিতে চাহেন। 'সংবাদ দাতা' ঐ শিবিরের ডিভিশ্যানাল কমাণ্ডিং অফিসারের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান—এই প্রকার হওয়া স্বাভাবিক। কোন অনিবার্য্য কারণে নেতাজীর পৌঁছাইতে বিলম্ব হইতে পারে। অতঃপর 'সংবাদদাতা' কমাণ্ডিং অফিসার ও অন্যান্য সবাইকে পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন যে, তাঁহারা সকলেই নেতাজীকে বহুবার দেখিয়াছেন ও ভালোভাবে চেনেন। অবশেষে রাত্রি আটটা নাগাদ ঐ 'সংবাদদাতা' শিবিরের সকলকে একত্রে সমাবিষ্ট করিয়া যখন যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সারগর্ভ নির্দেশ দেন, তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না যে—'সংবাদদাতা' স্বয়ং আমাদের প্রিয় নেতাজী।

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আরোহী (২য় বর্ষ/২য় সংখ্যা হইতে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত।

॥ সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী ॥

—স্বামী ভাস্বরানন্দ

১৯৪২ সনের মাঝামাঝি সুভাষ বসু টোকিয়ো থেকে বিমানযোগে সিঙ্গাপুরে আসেন। সহরের সর্বশ্রেষ্ঠ 'ক্যাথে' নামক সিনেমা হলে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইল। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন জার্মান প্রবাসী ভারতীয়। নির্দিষ্ট সময়ে রাসবিহারীবাবু সুভাষবাবুকে লইয়া বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইলেন। বিপুল জনতার সম্মুখে রাসবিহারী বলিলেন, "Here is your beloved leader Subhas Babu. I hand him over to you, From to-day onward he will be your supreme commander. I am too old now, let me retire. He will lead you on to the path of freedom of India—our Motherland. I hope you follow him implicitly as your destined leader." এরপর সুভাষবাবু তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া সভার কার্য শেষ করিলেন।

সুভাষবাবুর মালয়ে আগমন বার্তা বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল।

সিঙ্গাপুরে সমুদ্রতীরে একটি প্রাসাদোপম বাড়ীতে (Meyer's Mansion) তিনি তাঁহার বাসস্থান ঠিক করিলেন। ঐ বাড়ী সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা সর্বদা রক্ষিত থাকিত। সুভাষবাবুর প্রাণের জন্য দায়ী জাপানীরা তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার যাতায়াতের সময় সুবৃহৎ মোটর গাড়ী এবং তৎসঙ্গে সশস্ত্র গার্ড থাকিত। একখানা এয়ারোপ্লেন তাঁহার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। তিনি যখনই চাইতেন ঐখানা জাপানী পাইলটসহ তৎক্ষণাৎ পাইতেন।

কিছুদিন পরে তিনি এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখে সুবৃহৎ ময়দানে এক জনসমুদ্রের মধ্যে তিনি তাঁহার মালয়ে আসিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভেই মুষল ধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। আশ্চর্য এই যে, ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার

বক্তব্য বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। জনতার কেহই বারিপাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাব বক্তৃতা শুনিলেন। দেখা গেল, বক্তৃতার শেষে সকলেই আর্দ্র বস্ত্রে অথচ শান্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। কথা প্রসঙ্গে কথনো কথনো সুভাষবাবু এই সভার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "দেখলেন, সেদিন সভাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া সত্বেও সবাই কেমন অবিচলিত চিত্তে বক্তৃতা শুনেছিল। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমাদের কাজের জন্য সাধারণের সহানুভূতি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে। এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।"

১৯৪৩ সনের বিজয়াদশমীর রাত্রিতে সুভাষবাবু তাঁহার বাসভবন হইতে সিঙ্গাপুর Indian Independence League-এর মারফৎ গাড়ী পাঠাইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে অনতিবিলম্বে দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন রাত্রি নয়টা হইবে। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। গাড়ী বাড়ীর দরজায় পৌঁছিতেই সশস্ত্র প্রহরীরা অতি সম্ভ্রমভাবে আমাকে সুভাষ-বাবুর সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সেক্রেটারী মিষ্টার হাসান আমাকে উপরে সুভাষবাবুর নিকট লইয়া গেলেন। পৌঁছিবামাত্রই তিনি অতি বিনীত ও শ্রদ্ধাবনত হইয়া প্রণাম করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং সহকারীদের চা আনিতে আদেশ দিলেন। ইত্যবসরে কথা চলিতে লাগিল। তিনি সিঙ্গাপুরের আশ্রমেব কাজকর্ম সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হওয়ায় আমি তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বলিলাম। তৎপরে চা-পান শেষ হইলে আবার কথাবার্তা আরম্ভ হইল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার কলিকাতা হইতে বাহির হইবার পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে বলিলেন, "জেল থেকে বেরিয়ে আমি যখন আমাদের Elgin Road-এর বাড়ীতে বাস করছি, তখন কি যেন একটা দৈবশক্তি প্রণোদিত হয়ে ঐ বাড়ী হতে বেরোবাব একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার জন্মেছিল। সব সময়েই মনে হত এবার বেরিয়ে পড়ে কিছু করা যাক্। যা কিছু করবার এই সময়েই করতে হবে। কি হবে এভাবে অকর্মন্য হয়ে পড়ে থেকে? বন্ধুদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা গেল। শীঘ্রই একটা উপায় বের করে ফেললাম। আমার ঘরে সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিলুম। চণ্ডী, গীতা ইত্যাদি পাঠ করি দেখে ও আমার নিষেধ শুনে কেউ আর কাছে আসত না। এই সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম আমার বন্ধুরা সকলেই carried out their duties. সেইজন্যেই আমার এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।"

অতঃপর একদিন তাঁহার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন "জগতের ইতিহাসে কোন পরাধীন জাতিই অন্য কোন প্রতাপশালী স্বাধীন জাতির সাহায্য না নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারে নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও আমরা চাই ঐ রূপ একটা সাহায্য। জাপান জগতের মধ্যে একটা গণ্যমান্য জাতি হয়ে উঠেছে। তার প্রতাপ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। ঘটনা পরম্পরায় জাপানের সাহায্যও আমাদের পক্ষে পাওয়া সুগম হয়ে উঠেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলে আর আগামী একশ বছরেও এই সুযোগ মিলবে কি না সন্দেহ। সুতরাং আমি ঠিক করেছি জাপানের সাহায্য নিয়ে যথাশক্তি সংগ্রাম চালিয়ে ভারতকে ইংরেজাধিকার হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করব। গীতায়ও বলেছে, আমাদের কাজে অধিকার; ফলে নয়। কাজ তো করে যাই, ফল তাঁর হাতে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি মনে করেন, জাপানীরা আপনার সাহায্যে ভারতাধিকার করবে? এইরূপ কোন দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে যদি তারা আপনাকে বঞ্চনা করে। তাহলে কি করবেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি যতদূর বুঝেছি, এইরূপ কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদেরই চালাতে হবে। এ দেশের ভারতীয়দের অর্থে পরিচালিত সৈন্যদের দিয়েই সমস্ত কাজ চলবে। কেবলমাত্র হাতিয়ার জাপানীদের কাছ থেকে নিতে হবে। আমাদের ফৌজ অনেক পরিমাণে জাপানী ফৌজের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হবে। আমার মনে হয়, জাপানীরা অতটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কোন প্রকারে বাঙলা দেশে প্রবেশ করতে পারলেই আমাদেরও কোন চিন্তা থাকবে না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে বাঙলায় পৌঁছুবামাত্রই আশাতীত সাহায্য আমরা সকলের কাছ থেকেই পাব। আমার খুবই ভরসা আছে যে আমার দেশবাসী আমার এই কাজের সহায়ক হবেন। জাপানীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার জন্যও আমাদের তৈরী থাকতে হবে।" এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি বলিলাম, "আমাদের মিশনের কার্যের ধারা আপনার তো কিছুই অজ্ঞাত নেই। আমরাও মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বজায় রেখে যতটা পারি আপনার কাজের সহায়তা করব। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন।" অনুরুদ্ধ হইয়া নৈশ আহার সমাপনান্তে আশ্রমে ফিরিতে প্রায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেই তিনি কখনও ভোজন না করাইয়া ছাড়িতেন না।

ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের (Indian Independence League) অধিনায়ক হইয়াই সুভাষবাবু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন যে, সংগ্রাম চালাইতে হইলে একটা সামরিক শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করা দরকার। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে থাকিবে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। জাপানীদের হাতে কারারুদ্ধ প্রায় ৪০/৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্য ছিল। জাপানী শাসনকর্তারা সুভাষবাবুকে ঐ সৈন্য ব্যবহারে অনুমতি দিলেন—এই সর্তে—যে, স্বেচ্ছায় যাহারা সুভাষবাবুর কাজে যোগদান করিতে চায়, তিনি তাহাদিগকে লইয়া সৈন্যদল গঠন করিতে পারেন। নচেৎ কাহাকেও তিনি বলপূর্বক লইতে পারিবেন না। প্রচারের ফলে প্রায় ১৫,০০০ সৈন্য সুভাষবাবুর দলভুক্ত হইল। তিনি এই সৈন্য লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব এশিয়ায় প্রবাসী সমস্ত ভারতীয়রাই সুভাষবাবুর দলে যোগদান করিলেন। এমন কি দাক্ষিণাত্যের কুলি সম্প্রদায়, যাহারা মালয়ে রবারের বাগানে কাজ করিত তাহারাও উৎসাহের সহিত তাহার দলভুক্ত হইল। সৈন্য সংগ্রহের কাজে আশাতীত ফল হইতেছে দেখিয়া তিনি সৈন্যগণকে একটি শাসনতন্ত্রের অধীন করিয়া সুগঠিত সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এই শাসনতন্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছিল, "আজাদ হিন্দ-আর্জি-হুকুমত্" (Provisional Government of Free India)। এই হুকুমত্ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা আহূত হয়। এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে, যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সভাটি আহূত হয় এক বিরাট সিনেমা হলে। সুভাষবাবু ঠিক সময়ে জনৈক প্রতিনিধির সহিত সভামঞ্চে আরোহণ করিলেন। বাইশজন মন্ত্রীও যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথমে সুভাষবাবু দাঁড়াইয়া নূতন শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সবিস্তারে জানাইলেন। তৎপর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন: "In the name of the Lord we Promise to-day to be loyal to this Provisional Government of Free India and we shall remain so till our motherland is freed from foreign domination..." ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া—"In the name of Lord"...এই কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শ্রোতৃবর্গ অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে দেখা গেল, তাঁহার নয়নাশ্রু নির্গত হইতেছে। আশ্চর্য এই যে, শ্রোতৃগণও সহানুভূতিসূচক অশ্রুধারা সংবরণ করিতে

পারিলেন না। কয়েক মিনিট পরে সুভাষবাবু একখানা রুমালে চোখ মুছিয়া পুনরায় ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র পড়িলেন এবং মন্ত্রিগণকে পড়িতে আদেশ করিলেন। "আজ হইতে প্রত্যেক ভারতবাসী যেন মনে রাখেন তিনি স্বাধীন। তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারে যেন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি একজন স্বাধীন ভারতবাসী। সকলেই আজাদ হিন্দ হুকুমতের সদস্য হইয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান পূর্বক আপন আপন কর্তব্য পালন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হউন।"

উপরোক্ত নবপ্রণীত শাসনতন্ত্রের নেতা হিসাবে সুভাষবাবু 'নেতাজী' বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে "জয় হিন্দ" ভারত-বাসীদের অভ্যর্থনাসূচক বাণী হইল, "দিল্লী চলো" (on the Delhi) হইল সৈন্যদের জয়ধ্বনি। "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" "আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ" "নেতাজী কি জয়" ধ্বনিতে মালয়ের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। ঝান্সী-রাণীর আদর্শ লইয়া মেয়েদের সহায়তাও একটি Regiment তৈরী হইয়া গেল। তাহাতে সহস্রাধিক নারী ও বালিকা যোগদান করিলেন এবং পুরুষের অনুকরণে বন্দুক ধরিতে শিখিলেন। মাতৃশক্তির উদ্বোধনে সকলের ভিতর এক নব জাগরণের সৃষ্টি হইল।

এখন সুভাষবাবুর নিকট সমস্যা দাঁড়াইল এই বাহিনীর আবশ্যকীয় পোষাক, খাদ্য ও হাতিয়ার প্রভৃতি সংগ্রহ করা। স্বেচ্ছাসেবক সহ সৈন্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হইয়াছিল। এইসব সৈন্যের জন্য বন্দুক, গোলাগুলি, Armoured car, Tank, Anti air-craft gun, Bomber এবং Fighter অনেক পরিমাণে জাপানীদের সহায়তায় সংগ্রহ হইয়া গেল। পোষাকও জোগাড় হইল। কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ ও খাদ্য সরবরাহের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি প্রায়ই বিরাট সভার আয়োজন করিতেন। কোন কোন সভাতে বক্তৃতার সময় তাঁহার অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। বক্তৃতাগুলি প্রায়ই হিন্দুস্থানী ভাষাতে হইত। তিনি কখনও প্রায় দেড় ঘণ্টা কখনও দুই ঘণ্টারও অধিককাল অনর্গল বক্তৃতা করিতেন।

একবার সিঙ্গাপুরের এক ময়দানে মালয়-প্রবাসী ভারতীয়গণের এক বিরাট সমাবেশ হয়। ঐ সভায় শতাধিক মালা দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সভায় বক্তৃতান্তে সুভাষবাবু ঐ মালা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অনেকেই এক একটি মালার জন্য একলক্ষ ডলারও দিয়াছিলেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল; অর্থের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ পোষাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধাদির ব্যবস্থা হইতে লাগিল। শিক্ষিত সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ দেখিয়া সর্বসাধারণ বিস্মিত হইলেন। এই সময়ে সর্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য নেতাজী একটি দৈনিক প্রদর্শনীর (Military Demonstration) আয়োজন করিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল ভবনের বিস্তীর্ণ ময়দানে এই প্রদর্শনী হয়। এক বিরাট Mechanised Army সম্মুখে রাখিয়া নেতাজী বক্তৃতা মঞ্চ হইতে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলেন। তিনি পদাতিক সৈন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আশা করি, তোমরা আদেশ পাওয়া মাত্র শত্রুর সম্মুখীন হইতে তিল মাত্র দ্বিধা না করিয়া সমরানলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তোমরা এই মুহূর্তে আমাকে অনুসরণ করিতে তৈরী আছ কি"? নেতাজীর মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা বাহির হওয়া মাত্র শত শত বন্দুকধারী পদাতিক মঞ্চে দণ্ডায়মান নেতাজীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নেতাজী সেই মুহূর্তে তাঁহার ডান হাতখানা উত্তোলন করিয়া প্রায় দশমিনিট কাল জনতার মনে এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্তব্ধীভূত দর্শকবৃন্দ নির্বাক হইয়া যেন তাঁহার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। পরে ইঙ্গিত পাইয়া সৈন্যদল ও জনতা যথাস্থানে উপবেশন করিলে সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার কলাকৌশল দেখাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া গেল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সিঙ্গাপুরে একটা হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালে আহত ও রুগ্ন সৈন্যদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নেতাজী বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি রোগীদের আনন্দবর্ধণের জন্য এই হাসপাতালে একটি Concert Hall তৈরী করিয়া দেন। সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মাসে দুইবার concert-এর আয়োজন করিতেন। ইহাতে গান, বাজনা ও নৃত্যগীতাদির বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিত। নেতাজীর আগ্রহাতিশয্যে গণ্যমান্য সকলেই উহাতে যোগদান করিতেন। তিনি নিজে এই সকল উৎসবে উপস্থিত থাকিতেন। ঐ উপলক্ষে সৈন্যদের জন্য বিশেষ ভোজেরও ব্যবস্থা করা হইত। মাছ, মাংস, ও পোলাও প্রভৃতি খাওয়ানো হইত। নেতাজীর উপস্থিতি, তাঁহার অনুগ্রহ ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান এবং খাদ্য সরবরাহের প্রাচুর্য সৈন্যগণকে নেতাজীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল।

সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বাটীতে আসিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুরঘরে তিনি আধ ঘণ্টাকাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আলাপ আলোচনাদি করেন। প্রায় এক ঘণ্টা-কাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর তিনি একখানা চণ্ডীর জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় আমি আমার চণ্ডীখানি তাঁহাকে উপহার দেওয়ায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

নেতাজী আমাদের মিশনের কাজের একজন বড পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মিশনেব অনাথালয়ের জন্য আবেদন জানাইলে, তিনি বাড়ীঘর তৈয়ারী করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য কবেন। বাড়ী নির্মাণের জন্য তিনি নিজে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলাব দান করেন এবং আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার সংগ্রহ কবিয়া দেন। তিনি স্বয়ং আসিয়া 'Boys Home' এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। অনাথালযেব ছেলেমেয়েদেব জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থাও তিনিই কবিয়া দিয়াছিলেন, কারণ যুদ্ধকালীন Black Market ও Food Control-এর দিনে তিনশ ছেলেমেয়েব অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা হইয়াছিল।

আমাদের মিশনের স্কুলটিকে Indian National School রূপে পরিণত করা হইয়াছিল। এই স্কুলে Military training-এর বন্দোবস্ত করা হয় এবং নেতাজী ছেলেদের Demonstration দেখিতে একদিন মিশনে আসেন। অন্য একদিন আসিয়া তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত concert শ্রবণ করেন। পঞ্চম বারে তিনি নিজেই আমাদের হলে একটি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জাপানীদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া এই সভা আহূত হয়। মিশন সম্বন্ধেও অনেক কথা জাপানী বন্ধুদিগকে তিনি বলেন।

নেতাজী যখন দেখিলেন যে, প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কর্মকেন্দ্র সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করিলেন। সেখানে উপযুক্ত সৈন্য শিবির তৈরী হইল ও খাদ্য সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল। প্রত্যেক সৈন্যদলকে সীমান্তে পাঠাইবার পূর্বে নেতাজী তাহাদের জন্য Tea Party-র ব্যবস্থা করিতেন এবং স্বয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাহাদের "see off' করিতেন। ইহাতে সৈন্যগণ বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইত। নেতাজীর মুখ হইতে আশ্বাস বাণী পাইয়া তাহাদের প্রাণে অস্বাভাবিক

শক্তির সঞ্চার হইত। সীমান্ত হইতে প্রত্যাগত অনেক যোদ্ধার মুখে শুনিয়াছি তাহারা নেতাজীকে তাদের পিতামাতা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কে বলিবে নেতাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মূল কারণ কি ছিল? ত্যাগের মূল মন্ত্রে ও পূত সাধু সঙ্গেই কি তাঁহার এমন হইয়াছিল? প্রবল প্রভাবান্বিত রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী হইতেও যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে তাহা সহজেই অনুমিত হইত।

রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত—"স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র" হইতে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত।

॥ অলৌকিক পুরুষ ॥

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

অকস্মাৎ ভূমিকম্প-জলোচ্ছাস হয়, আগুন উদ্গীরণ করে আগ্নেয়গিরি, মূর্তিমান ধ্বংস হয়ে তুফান ছুটে যায় জলস্থলের ওপর দিয়ে, হিমালয়ের মত পাহাড় ঠেলে ওঠে পৃথিবীর বুক থেকে, জন্ম হয় সিন্ধু কি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মত নদী।

প্রাকৃতিক এসব ঘটনা-দুর্ঘটনা অমোঘ কার্যকারণ শৃঙ্খলায় বাঁধা বলে বিশ্বাস করেন বিশ্ববিজ্ঞানীরা, যে কার্যকারণ-শৃঙ্খল সন্ধান করে বার করা অসম্ভব নয় বলে ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা।

কিন্তু মানুষের ইতিহাসও কি শুধু এমনি যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা? তা বিশ্বাস করতে মন বিদ্রোহী হয়। তার পেছনে অমোঘ বিশ্ব-বিধির ঘাত-প্রতিঘাত যদি থাকে, তেমনি আছে সময়ের স্রোতকে উত্তাল করে তোলা অসামান্য এমন সব ব্যক্তি-সত্তার উদয়-রহস্য, যা প্রায় অলৌকিকের সামিল ও বস্তুগত সব ব্যাখ্যার অতীত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এমনি এক আশ্চর্য প্রেরিত পুরুষ। শুধু স্বাধীনতার অনন্য সাধক হিসেবে নয়, যুগসন্ধির মহালগ্নে ভারত-আত্মার অন্যতম মূর্তপ্রক্ষেপ রূপে যিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

॥ নেতাজীর প্রতিশ্রুতি ॥

—পবিত্র মোহন রায়

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের শেষের দিকের ঘটনা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের একজন অফিসার এসে দাঁড়ালেন আমার ঘরের সামনে। আমার ঘরের অর্থ, ফাঁসী-ঘর। আমি Condemned cell-এ আছি—Condemned Prisoner—অনেক দিন হ'য়ে গেল অপেক্ষা করে আছি শেষ আদেশের জন্য। কবে আসবে সেইদিন সেই মুহূর্ত।

অফিসারটি দাঁড়িয়ে আছেন—হয়ত কিছু বলতে চান। আমার জানা একটি মাত্র সংবাদ দিতেই তো তাদের সঙ্কোচ হবার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম—"বলুন না দিন কি স্থির হয়েছে?" "না ঠিক তা নয়—তবে একটি অত্যন্ত দুঃসংবাদ, এই মাত্র শুনে আসছি"—বললেন অফিসারটি।

"বলুন, সব কিছু দুঃসংবাদ শুনতেই এখন আমি প্রস্তুত আছি।"—বললাম ওকে। তবু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন অফিসারটি। "শুনলাম এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা গেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে সাইগন—সাইগন থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন—ওখন, যে প্লেনটিতে তিনি ছিলেন ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

অনেক কিছু দুঃসংবাদ শুনবার জন্যই তখন প্রস্তুত ছিলাম ঠিকই—কিন্তু এ কথাটি শুনতে হবে তা একবার ও ভাবি নি। নির্জন কারাকক্ষ—ফাঁসী ঘর। কেউ কোথাও নেই যে একটা কথা বলি। নেতাজী নেই—ভাবতেই পারছি না। নিজের স্থান-অবস্থা সব যেন ভুল হয়ে গেল, সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। রাত্রের অন্ধকারে ফাঁসী ঘরে নিজের মনে কত কথাই ভাবতে থাকলাম। অতীতের বিরাট ইতিহাস যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

বেশী দিনের কথা নয়—১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর মালয়-এ আছি। সকালেই সংবাদ এলো আগের দিনই রাত্রে পার্ল হারবার ও সিঙ্গাপুর জাপানী বোমার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ। মালয় দেশের উত্তর প্রান্তে কোটাবারুতে জাপানীরা অবতরণ করেছে। এত বিরাট আয়োজন—এতদিনের প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থাকে তছনছ করে জাপানীরা মাত্র দেড় মাস সময়ের মধ্যে সব দখল করে নিল।

কি যে করব কিছু ভাববার পর্যন্ত অবসর নেই। বিদেশে আমরা সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসেছি—চাকুরীর জন্য। স্ত্রী পুত্র নিয়ে এই বিদেশে। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকই এখানে আছি আমরা। এমনি সময়ে সমস্ত ভারতবাসীর ভাগ্যাকাশ রক্তিম প্রভাতের অরুণ আভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। মহাবিপ্লবী নায়ক শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে Indian Independence League এক নব পরিকল্পনা নিয়ে গঠিত হল। জাপানী অধিকৃত সমস্ত এলাকাতেই League-এর শাখা দ্রুত গঠিত হতে সুরু করল। শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাতেব পর ঠিক করলাম Indian Independence Legue-এর মারফৎ আমরাও কার্যক্ষেত্রে নামব।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে আমি সব কিছু ত্যাগ করে ক্যাম্প-এ যোগ দিলাম। নেতাজী তখন ইয়োরোপ থেকে মালয় দেশে পৌঁছেছেন। আমাদের কয়েকজনের একটি দল মালয়ের পিনাং শহরে এসে সমবেত হয়েছি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদেব নিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ক্যাম্পেই তখন সিক্রেট সার্ভিস ট্রেনিং—গেরিলা ট্রেনিং-এর কাজ চলছে। পিনাং দ্বীপের "বাতু ফিরিঙ্গে" নামক স্থানে মাত্র ১০ জন বাঙ্গালী নিয়ে আমাদের ট্রেনিং সুরু হল। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হল—বেতার বার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণ, ট্র্যান্সমিটার তৈরী করা, প্রোপাগাণ্ডা শিক্ষা, বিস্ফোরক প্রস্তুত কবা ও তার ব্যবহার, গুপ্ত আন্দোলন পরিচালনা করা, পিস্তল, রাইফেল, রিভলবার থেকে সমস্ত মাঝারি ধরণের অস্ত্র চালনা শিক্ষা, ছদ্মবেশ গ্রহণের কলাকৌশল। ড্রিল, দৌড়ানো, সমুদ্র সাঁতার, এসব তো রোজই চলতে থাকলো।

একদিন নেতাজী এসে সব দেখে শুনে বলে গেলেন এইসব ট্রেনিং-এ যেন কোনও ত্রুটি না হয়। আমাদের ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে গিয়ে গেরিলা বাহিনী তৈয়ারী এবং গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা। প্রত্যেকটি ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকই হবে আজাদ হিন্দের এক একজন কম্যাণ্ডার।

যখনই নেতাজী পিনাং শহরে এসেছেন আমাদের সাথে দেখা করে গেছেন। ব্যক্তিগতভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। নানা উপদেশ—নানা আদেশ দিয়েছেন। এরপর আমরা পিনাং শহরের অন্তপ্রান্তে স্বাণ্ডি-ক্ষাপট ক্যাম্পে আসলাম। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এখানে ট্রেনিং-এর কাজ চললো। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেতাজী যখন

পিনাং-এ এসেছিলেন অনেকের মত আমারও ডাক পড়ল তাঁর কাছে। আলাপ করে কি :তিনি জেনে নিলেন, জানি না—শেষে আদেশ করলেন—এবার যেতে হবে ভারতবর্ষে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এবার শত্রুকে পিছন থেকে, ভিতর থেকে আঘাত করতে হবে। এবার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের প্রতিটি দরকারী সামরিক সংবাদ জেনে নিয়ে বেতার মারফৎ জানাতে হবে আজাদ হিন্দের প্রধান কেন্দ্রে। এই যুদ্ধে বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবীদের সম্পূর্ণরূপে এক করে নিতে হবে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে এই বিপ্লবীদের এক বিরাট ইতিহাস তিনি বলে গেলেন।

ভারতবর্ষে আসার জন্য আমাদের তিনটি পথ ছিল—হয় হাঁটাপথে মনিপুর-আসামের পথে অথবা বিমানে করে প্যারাসুট নিয়ে কোন স্থানে নামা অথবা সাবমেরিণে করে ভারতবর্ষের কোন সমুদ্র উপকূলে উঠা। কিন্তু তিনটি পথের কোনটিই বিপদ মুক্ত ছিল না। কথায় কথায় নেতাজীকে বলেছিলাম যে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে পৌঁছে দিলে সেখানে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই কাজ করতে পারব। কিন্তু যাবার পথের উপর তো আমার কোন হাত নেই। তার উত্তরে নেতাজী সেদিন বলেছিলেন—এ আমাদের দেশ মাতৃকার মুক্তি-সাধনা-এই কাজে কোন কিছুর হিসাব ঐ ভাবে হবে না। মনে রাখতে হবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সাধক। নেতাজী বলেছিলেন—"আমি জীবনে কোন-দিনই রাজনীতি করিনি। যা দেখছেন এ আমার মাতৃসাধনা। আমার কাছে আমার গর্ভধারিণী জননী : জননী-জন্মভূমি আর মা কালী একই। দেখতে দেখতে এই তিন আমার এক হয়ে যায়।"

কতদিন কত কথার মধ্যে নানা প্রশ্ন করেছি—প্রশ্ন না করেও উত্তরে অনেক কথাই বলে গেছেন। ভারতবর্ষে সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাসটা কি ভাবে হবে অনেক কিছুই বললেন। কত উপদেশ কত আদেশ, আজও তা পরিষ্কার মনে পড়ে। কিন্তু—না সে কথা বলবার হুকুমও নেই—বলবার সময়ও হয় নি।

একদিন জানতে চাইলাম ভারতবর্ষে কাজ করার সময় এমন কাজ হয়ত করতে হবে—যা মানুষের চোখে বিবেকোচিত বলে মনে হবে না। উত্তরে নেতাজী বলেছিলেন—"তুমি যদি আমাকে বিবেকের প্রশ্ন করো—তবে বলবো বিবেক বলে আমার কিছু নেই। জননী-জন্মভূমির কাজে, মা কালীর কাজে আমার উপর নির্দেশ হলে তো বিবেকের প্রশ্নই থাকে না। সাধারণ লোক বিবেক বলে মাথা ঘামায় মায়ের পূজায়—তারা হলো মহামূর্খ।

সীমিত গণ্ডীতে বিবেক চলতে পারে—একটি বিরাট পরিবারের মধ্যে বিবেকের কথা উঠে না। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখবে তারা কি বলে। শ্রীকৃষ্ণ কি কুরুক্ষেত্রে আঠারো অক্ষৌহিনী সৈন্য ধ্বংস কর্তে বিবেকের ধুয়ো তুলেছিলেন? শিশুপালকে একশতবার ক্ষমা করে একশত এক বারেই মারলেন। যদি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিবেক দেখাতেন, তবে কি তিনি যে কাজে নেমেছিলেন তা কর্তে পারতেন।"

"দেশমাতৃকার, জননী-জন্মভূমির সেবা কর্তে হলে দিতে হবে মান, সম্মান, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, গৌরব, ইন্দ্রিয়ের সব বৃত্তি, ভাবনা, চিন্তা, ইচ্ছা—সব শেষে আত্মাকে। এ না হলে মাতৃসাধনা হবে না। নিজেকে কেটে দু'খানা করতে হবে—না কর্তে পারলে তুমি মাতৃসাধক নও। নিজেকে কেটে দু'খানা করেই যদি দিতে হল তবে আর তার বিবেক কোথায় থাকলো।"

"বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কার? —মার। তাঁর কাজের জন্য যদি বাঁচিয়ে রাখেন—কাজ সম্পন্ন করবে মা-ই!"

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে ভেবেছিলুম জানি না—না ঠিক ভাবা নয়—এতক্ষণ নেতাজী যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন উপদেশগুলো---কোন দুর্বলতা নয়—তোমরা মাতৃসাধক, কোন কিছুই তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

আজ মনে পড়ে পিনাং-এ যেদিন তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা। যখন আমাকে একটি দলের নেতা করে পাঠাবার পরিকল্পনা শেষ করে তিনি পূর্ব-এশিয়ার কোথায় চলে গেলেন—সেই দিনটির কথা। যাবার অনুমতি পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে—অত্যন্ত গম্ভীর শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—"Alright, go ahead, we will meet in India—Jai Hind."

সত্যবাদী মহাপুরুষ। জীবনে অসত্য কথা বলতে হয়নি—বলেন নি। তাঁর এ কথাও তো মিথ্যে হতে পারে না। ব্রিটিশের শক্ত রজ্জু আমাকে ফাঁসী দিতে পারবে না—নেতাজীর মৃত্যুও হয়নি। দেখা আমাদের হবে—এই ভারতবর্ষেই হবে।

লেখক আজাদ হিন্দ বাহিনীর হয়ে নেতাজীর নির্দেশ মতো কার্য পরিচালন কালে ব্রিটিশ ভারতে আজাদ হিন্দের গুপ্তচর রূপে ধরা পড়েন ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে মুক্তি পান।

॥ দুর্দ্দমনীয় সুভাষ ॥

এম. এ. এইচ. ইস্পাহানি

ফ্রান্সের পতনের পর, হিটলারের রণসম্ভারে যখন ব্রিটেনের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন, সেই চরম মুহূর্তে সুভাষের ভারত থেকে সেই ঐতিহাসিক পলায়নের পশ্চাৎপট কজনই বা জানেন? মুষ্টিমেয় যে ক'জন জানতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই, এমনকি সেই অভিযানের নায়ক, আমাদের নেতা, নিজেও আর জীবিত নেই। মনে হয়, দু-তিনজন ছাড়া সে কাহিনী বলার মতো আর কেউ নেই।

১৯২০ সালে আমি তখন কেম্ব্রিজে—সুভাষচন্দ্রকে প্রথম দেখি। ভারতীয় মজলিস এক সভা ডেকেছে—ভাষণ দেবেন মিঃ এম. এ. জিন্না। আমি বসেছিলাম সুভাষচন্দ্রের পাশেই। জানলাম আই. সি. এস. হয়েছেন। কিন্তু ভাবছেন খেতাব ত্যাগের কথা। কেননা, বিদেশী মনিবের অধীনে চাকরি নিতে তিনি মন থেকে সায় পাচ্ছেন না। তাঁর কাছে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে নিজ দেশের বন্ধন-মুক্তির সঙ্গে জনগণের মুক্তি-চিন্তাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি তখন দেশে ফিরে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার কথা ভাবছেন। তাঁর এই চিন্তা আরও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৫৭ আর ১৯১৯-এর মধ্যে এমন ঘটনা আর দ্বিতীয়টি ঘটে নি, যা ভারতবাসীকে লাঞ্ছনার চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল।

১৯২১ এপ্রিল। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পদে ইস্তফা দিয়ে ঐ বছরেই জুলাই মাসে ফিরে এলেন দেশে। তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে সুভাষ ছিলেন এক দুর্বার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ওজস্বীতায় প্রাণবন্ত পুরুষ। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা যেন ছিল সহজাত। ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী। মুহূর্ত মধ্যে যে কোন সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতে পারতেন। বিশ বছর পর ১৯৪০-এ আবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হোল, তাঁর মধ্যের এই প্রতিভা তখন অহরহঃ প্রত্যক্ষ

করেছি। পুরোণো বন্ধুর মতই আবার আমাদের মেলামেশা হয়েছিল এবং খুব নৈকট্যের মধ্যেই আমরা কাজ করেছি—কলিকাতা কর্পোরেশনে--তিনি, ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারূপে আর আমি মুসলিম লীগের নেতারূপে। পুরো একটা বছর আমরা কাজ করলাম একই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংহতির মধ্যে। যে ক'জন হিন্দু রাজনৈতিক নেতা তখন আমার জানা-চেনার মধ্যে ছিলেন, সুভাষ ছিলেন তাদের সকলের শীর্ষে।

আমাদের ফরওয়ার্ড ব্লক—মুসলীম লীগ কোয়ালিশন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছিল। সাধারণ সভায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোত, কমিটি তা নিঃসঙ্কোচে পালন করতো। আমরা এক অনুকরণীয় নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়েই কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছেদ পড়লো সুভাষ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি প্রায়ই বলতেন, জাতীয় রাজনৈতিক স্তরে আমাদের এই সহযোগিতার প্রসার চাই। এই উপমহাদেশের এই দুই মুখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতি স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতিকে শুধু স্থিরীকৃত নয়, দ্রুততরও করবে। বোস যদি ভারতে থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মুসলিম বন্ধুত্বকে অটুট রাখার চেষ্টা করতেন।

আমরা তখন মেয়রের (আব্দুর রহমান সিদ্দিকী) ঘরে, ফ্রান্সের পতনের সংবাদ এলো। আমার মনে পড়ে, সংবাদটি শোনামাত্র সুভাষের মুখ কেমন আনন্দে ঝলমল করে উঠেছিল। স্থান, কাল ভুলে স্কুলের ছোট ছেলের মত কলকল করে উঠেছিল—আমাদের কয়েকজনকে পর পর জড়িয়ে ধরে তাঁর সে কী উল্লাস! ফ্রান্সের পতন যেন তাঁর নিজেরই বিজয় উল্লাস। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল ব্রিটেনের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন গতি নেই—উত্তাপে গ'লে পড়া বরফের মতই এবার গ'লে যাবে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য।

১৯৪০ সালের জুন মাসের একটা সময়—সুভাষ বললেন, যদিও ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তবুও "কলকাতার অন্ধকূপ", যাকে হলওয়েল মনুমেণ্ট বলা হয়, তা অপসারণের জন্যে, মিছিল নিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন, স্থির করেছেন। আমি অনুরোধ করেছিলাম তাঁকে, এই সময় যখন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কাজে দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন, তখন এমন কিছু ক'রে না বসেন, যাতে তাকে জেলে যেতে হয়। তিনি জানালেন—তিনি মনস্থ ক'রে ফেলেছেন। এর আগেও একবার এই অভিযানের হুমকি দিয়েও তিনি পারেন নি। কিন্তু এখন প্রচারিত হওয়ার পর যদি তিনি পিছিয়ে আসেন, তাহলে নেতা হিসাবে তাঁর জীবনের আর কোন মূল্যই থাকবে না।

আমি আমার পুরাতন এবং সম্মানিত বন্ধু তদানিন্তন বাংলার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে সবকথা জানিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, এই প্রতিবাদ-মিছিলের দিক থেকে তিনি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন কি না ; আব একান্তই যদি• মনুমেণ্টের কাছে নেতাদের গ্রেপ্তার করতেই হয়, তাহলে গ্রেপ্তারের পরই ছেড়ে দিতে পারেন কি না ? তিনি সে রকম কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না। যদি প্রকৃতই আইন ভঙ্গ হয়, তাহলে আইন ভঙ্গকারীদের ফলভোগ করতেই হবে।

আমি সুভাষের সঙ্গে দেখা করে আইনভঙ্গের জন্য তাঁর এবং তঁর অনুগামীদের কি পরিণতি হতে পারে তা জানালাম। সুভাষ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রয়ে গেলেন—ঐ লজ্জাকর স্মৃতিস্তম্ভকে গুঁড়িয়ে দিতে তিনি তখন বদ্ধপরিকর। ৩রা জুলাই অভিযানের দিন স্থির। ক্লাইভ স্ট্রীট ধরে চলবে প্রতিবাদ মিছিল, তার আগের দিন সুভাষ গ্রেপ্তার হলেন ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষা আইনে।

আমি ছিলাম আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বেসরকারী পরিদর্শক। কয়েদীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমার বন্ধু এবং সহকর্মীদেব আগ্রহাতিশয্যে আমার জেল-পরিদর্শনের মাত্রা গেল আরো বেড়ে। সপ্তাহে দুই-তিন দিন যেতে লাগলাম জেলে। আর প্রতিবারেই বেশ কিছুক্ষণ কাটাতাম সুভাষের সঙ্গে—কর্পোরেশনে আমাদের কোয়ালিশনের দৈনন্দিন কাজকর্মের কথা হোত। সুভাষ অস্বাচ্ছ্যন্দকর বিছানা আর অপর্যাপ্ত আলোর অভিযোগ রাখলেন আমার কাছে। তিনি চাইলেন একটা আরামকেদারা আর কিছু বই। তিনি আরও জানালেন, জেলে তাঁকে বড় নিঃসঙ্গ থাকতে হচ্ছে—যেন তাঁর সহকর্মীদের যে কোন একজন তাঁর সঙ্গে জেলে ঘণ্টা দুয়েক প্রত্যহ কাটিয়ে যেতে পারে—যাতে জেল জীবনের একঘেয়েমির হাত থেকে তিনি মুক্তি পেতে পারেন।

তাঁর মতো মানুষের পক্ষে প্রতিটি দাবীই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। আমি খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে প্রতিটি সুযোগ-সুবিধার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে সুভাষকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে তিনি একটি সর্ত আরোপ করেছিলেন, তা .হোল সুভাষ তাঁর কাজের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং লিখে দিতে হবে যে ভবিষ্যতে তিনি সদাচরণ করবেন।

সুভাষের পক্ষে নিশ্চয়ই মেনে সে সর্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না। যদি তিনি সেদিন ঐ সর্তে মুক্তি নিতেন, তাহলে ভারতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের সেইদিনই অপমৃত্যু ঘটতো।

অন্তরীণের প্রায় এক সপ্তাহ পর থেকে তিনি সুরু করলেন অসুস্থতার অভিযোগ—ঘন ঘন পেটের গোলমাল আর তার সঙ্গে জ্বর। আমি যখনই যাই, দেখি বিছানায় শুয়ে আছেন এবং অভিযোগের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। প্রায় ঠিক এই সময়েই, সুভাষের একজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী, শঙ্করলাল জাপান-সহ দূব প্রাচ্য পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন। সুভাষের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি খুবই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু যেহেতু তিনি ব্যক্তিগতভাবে জেলে আসতে পারছেন না, আমাকেই দৌত্যকর্ম করতে হয়েছিল উভয়েরই পরিচিত একজন বন্ধুর সাহায্যে।

সুভাষের সেই বন্ধু, যার নাম আমি জানি না, শঙ্করলালের যে সব নির্দোষ বার্তা কয়েদির কাছে এসে পৌঁছে দিত, তার রহস্য যে কত গভীর ছিল, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম অনেক কাল পরে। যেমন, একটা বার্তা ছিল এইরকম: "বন্ধুরা সবাই ভালো এবং সুখেই আছে। তারা সকলেই আপনাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে"। আরও একটা: "আমরা বুঝতে পারছি না, বাইরে যখন এত কাজ অপেক্ষা করছে, কেন আপনি ওখানে প'ড়ে রয়েছেন"; এই রকম আরও অনেক রহস্যজনক বার্তা।

ঐ সব বার্তার গূঢ় রহস্য আমার কাছে তখনই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, যখন সুভাষ অন্তর্ধান করেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা সুভাষকে বলতে চেয়েছিলেন বাইরে যখন অনেক জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ অপেক্ষা করছে তখন যেমন করেই হোক, ছলে-বলে-কৌশলে তিনি যেন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্রিটেন যখন ভয়ঙ্কর সঙ্কটময় অবস্থায় মধ্যে এবং তার অস্তিত্ব যখন প্রায় বিপন্ন তখন শঙ্করলাল ভারতের মুক্তির জন্যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন।

বার্তাগুলি পাবার পর থেকেই সুভাষের মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছিল, তা আমার নজর এড়ায় নি। দেখলাম, আমি যা বলি, তিনি তা শুনতে আরম্ভ করলেন। এতদিনের এই অসুস্থতা নিয়ে এর পরও যদি তিনি জেলে পড়ে থাকেন, তাহলে জেলের ডাক্তারেরা তাঁকে মেরে ফেলবে। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে বাড়ি যেতে চাইলেন। সুস্থ হয়ে আবার তিনি

জেলে ফিরে আসবেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে স্থির আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমিও আমার বন্ধু খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করে সেই আশ্বাসই দিতে পারি—যদি তাঁকে 'পেরোলে' বাড়ি যাবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সর্ত পালন করবেন—সরকার অবশ্য ইচ্ছা করলে তাঁর বাড়িতে পুলিশ পাহারা রাখতে পারেন, যাতে তিনি কোথাও পালিয়ে যেতে না পারেন। অবশ্য এই পুলিশ পাহারার কথাটা খানিকটা ঠাট্টার ছলেই বলেছিলেন, কারণ তাঁর মতো মানুষের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া বা যেতে পারেন, এই চিন্তা কোন ছেলেমানুষেও করতে পারে না।

জেল থেকে সোজা গিয়েছিলাম খাজা নাজিমুদ্দীনেব বাড়ি—মানবতার নামে তাঁর কাছে অনুরোধ রেখেছিলাম—যাতে সুভাষের এই প্রস্তাব তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করেন। সুভাষ জেলে মরুক এবং বাংলার মুসলীম লীগ সরকার বিপদাপন্ন হোক, এ আমি চাই নি। যদি তিনি মারা যান, তাহলে, সারা ভারতের হিন্দু, বিশেষ করে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়, যাদের কাছে তিনি নয়নের মণির মতো, মুসলমানদের ওপর ক্রোধে ফেটে পড়তে পারে।

খাজা সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কোন অভিমত জানালেন না। ভাববার এবং আলোচনা করবার সময় চাইলেন তিনি। পরদিন খাজা সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা করলাম। সেদিনও কোন অভিমত জানালেন না। বোধ হয় সুভাষের অসুস্থতার এবং আমরণ অনশন হুমকির সত্যতা সম্বন্ধে মন্ত্রী মণ্ডলীর তদন্ত তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। দু-একদিন পরে আবার গেলাম। আমার অনুরোধ খাজা সাহেবের সম্মতি পেয়েছে জেনে খুসীতে মন ভরে গেল। রাজনৈতিক জীবনে খাজা সাহেবের মতো মানুষ বিরল ছিল। বাংলার সার্জ্জেন জেনারেলের কাছ থেকে সুভাষের অসুস্থতার সত্যতা তিনি যাচাই করে নিয়েছিলেন। তিনি আমার কাছ থেকে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন সুস্থ হয়ে সুভাষ যে সর্ত পালন করবে, সে বিষয়ে আমি স্থির-প্রত্যয় কি না ? আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছিলাম—সুভাষের সর্ত তিনি বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারেন।

৫ই ডিসেম্বর। সুভাষ অতি মাত্রায় অসুস্থ আর দুর্বল হয়ে পড়লেন। পুলিশ পাহারায় তাঁকে তাঁর বাড়ি ৩৮/২ এলগিন রোডে পাঠানো হোল। গৃহ চিকিৎসকের চিকিৎসা এবং অনুরক্তা ভাইঝিদের পরিচর্যার মধ্যে তিনি ফিরে এলেন। কয়েকদিন ধরে সুভাষ এমনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে বন্ধু-

বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। এমন কি, তাঁর ঘরে যে আমার ছিল অবাধ গতি, তাও রুদ্ধ হ'য়ে গেল। যখন আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম বিছানাব পাশে মেঝেয় পায়ের উপর পা দিয়ে তিনি বসেছিলেন। মুখ ঢেকে গেছে দাড়ি গোঁফে। ঐ দাড়ি-গোঁফ দেখে আমার একটু বিস্ময় জেগেছিল। সুভাষ তা বুঝতে পেরে বলেছিলেন—"হ্যাঁ হাসান, আমি মৌলানা হ'য়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস কর, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক সুমধুর আত্মীয়-সুলভ বোঝাপড়ার বেশী আমি আর কিছু চাই না।" আমবা কর্পোরেশনের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা কবলাম। তিনি তাঁব দলেব নেতাদের নির্দেশ দিলেন মুসলমানদেব প্রতি যেন কোনরকম অশোভন আচরণ না হয়।

পরদিন সকালেও আমার সঙ্গে সুভাষেব দেখা হ'য়েছিল। তৃতীয় দিন, তাঁর ভাইঝি, শরৎ বোসের মেয়ের সঙ্গে দেখা হোল সিঁড়িব মুখেই। জানালো, গত রাত্রের তুলনায় তার কাকার স্বাস্থ্য আজ আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। আত্মীব-স্বজন এমন কি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশোনা ডাক্তার একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। দুদিন পর আবাব গেলাম তাঁর বাড়িতে, মেয়েটিকে দেখলাম—বিমর্ষ। সতীশ চন্দ্র বোস, মেয়েটির বড়জ্যাঠাও ছিলেন সেখানে। তাঁকেও দেখলাম—বিমর্ষ। মনে হ'ল সুভাষের নিশ্চয়ই খুবই বাড়াবাড়ি হ'য়েছে। দেখা হোল না। আসবাব সময় মিস বোসকে বলে এলাম—আমাকে টেলিফোনে সংবাদ দিতে। সেও সম্মতি জানালো। ডাক্তারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হচ্ছে। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়কেও এখন কাকার কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

খবরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম কিন্তু কোন খবরই এলো না। টেলিফোন করলাম। শুনলাম সুভাষের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। পরদিন বিকেলে খবর ছড়িয়ে পড়লো কলকাতায় যে সুভাষ পেরোলের সর্ত লঙ্ঘন করেছেন এবং বোধ হয় দেশ থেকে পলাতক হ'য়েছেন। তখনই আমি সুভাষের সেই পাঁচ দিনের নিদারুণ অসুস্থতা, তাঁর দাড়ি-গোঁফ রাখার অর্থ বুঝতে পারলাম। চট্ করে কেউ যেন তাঁকে চিনতে না পারে, তারই জন্য এই ছদ্মাবরণ আর জানাজানি হবার আগেই ভারত ছেড়ে যাতে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যেতে পারেন, এগুলি ছিল তারই গোপন আয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলো পুলিশ। কাছে-দূরে সর্বত্র জাল বিস্তার করলো

এমন কি সুদূর ভারত সীমান্ত পর্যন্ত। কিন্তু সে জালে কিছুই ধরা পড়লো না। ১৯৪১ সালে জানুয়ারীর মাঝামাঝি সুভাষ দেশত্যাগ করেছিলেন। তাঁর যাত্রাপথ বোধ হয় তাঁর মাত্র দু-একজন বিশ্বস্ত বন্ধু, আর তাঁর ভাই শরৎবাবু জানতেন। যে ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন, যে পথ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যে সব জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন, যেভাবে তিনি আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন, জার্মানী-জাপান-বার্মা থেকে যেসব বেতার-ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন, যেভাবে তিনি আই. এন. এ সংগঠন করেছিলেন, সবই আজ ইতিহাস।

ভারতের বাইরে থেকে যখন তিনি একক সংগ্রামে লিপ্ত, তাঁর উড়োজাহাজ ভেঙ্গে পড়লো। শেষ হ'য়ে গেল সুভাষের সেই উদ্দাম স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ভারতের অধিকাংশ মানুষই মেনে নিতে পারে নি। তাদের বিশ্বাস, তিনি কোথাও আত্মগোপন করে আছেন এবং সময় হ'লেই আবার আবির্ভূত হবেন। আমারও বিশ্বাস করতে মন চায় যে, যুদ্ধশেষে ব্রিটিশের লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই সুভাষের মৃত্যু-সংবাদ রটিত হ'য়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, স্বাধীনতা পাওয়া গেল তবুও সুভাষের প্রত্যাবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তখন আমার অনুমান ক্রমশ একটা প্রত্যয় নিল যে সুভাষের মৃত্যু সত্য। সুভাষকে আমি যেভাবে জেনেছি বা দেখেছি, তাতে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে স্বাধীনতার সংগ্রামে অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার পর এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাঁর মতো একজন তেজস্বী নেতার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব।

সুভাষের মৃত্যুর সঙ্গে এশিয়া এবং সমগ্র পৃথিবী একজন দ্রুত চিন্তাশীল মানুষ; একজন অক্লান্ত সংগ্রামী এবং প্রশান্ত মানসিকতা ও উদার মনোভাবাপন্ন রাজনীতি-বিদকে হারিয়েছে। প্রবলতম এবং কঠিনতম শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রত্যয় ও দৃঢ়তা তাঁর ছিল। এমন কি গান্ধীর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। কর্মশক্তিতে তিনি ছিলেন দানব-সদৃশ। প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসযোগ্য এবং নিষ্ঠাবান, স্বেচ্ছাচারী এবং অহঙ্কারী ছিলেন না। প্রচণ্ডতম বাধার সম্মুখে তিনি নতি-স্বীকার না করে সংগ্রাম করে গেছেন নির্ভীক সৈনিকের মত।

তিনি যে উচ্চাভিলাষী ছিলেন সন্দেহ নেই—কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম

করে উঠেছিল যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা হোল অধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করা।

লেখক সুভাষচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর অন্তর্ধানের অন্তরালের অন্যতম সহকর্মী। ভারত বিভাগের পর লেখক পাকিস্তানে চলে যান এবং যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের দূত হিসাবে ও পরে ১৯৪২ সালে লণ্ডনে পাকিস্তানের হাই কমিশনারের পদে বৃত ছিলেন। লেখাটি Illustrated weeklyof India-র XCVII8 সংখ্যার সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং অনূদিত।

।। একটি সাক্ষাৎকার ।।

—স্বামী শঙ্করানন্দ

...তাহার (স্বামী অভেদানন্দের অসুখের সময় দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুকে এবং স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে দেখিবার ইচ্ছা হয়। সুভাষচন্দ্র বসু আসিলে তাঁহার ইচ্ছা হইল সুভাষচন্দ্রকে আলিঙ্গন প্রদান করেন। সুভাষচন্দ্র দাঁড়াইলেন। অভেদানন্দের তখন অসুখ। পেটে জল হইয়াছে; দাঁড়াইতে গিয়া কাপড় সামলাইতে পারিতেছেন না ও তাহা খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। অবশেষে তিনি কোন প্রকারে কাপড়খানি কোমরে জড়াইয়া সুভাষচন্দ্রকে সস্নেহে বলিলেন: "সুভাষ, এস তোমায় আলিঙ্গন করি।" স্নেহ ও ভালবাসার অমৃতধারা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি তাহার পর সুভাষচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন—। তাহার পর তিনি আনন্দে প্রাণ খুলিয়া 'বিজয়ী হও' বলিয়া সুভাষচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিলেন। দেশের তদানীন্তন বর্তমান পরিস্থিতি লইয়া সুভাষচন্দ্রের সহিত তিনি অনেক কথাই কহিলেন। সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইল যখন অভেদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেশের স্বাধীনতা কবে ফিরিয়া আসিবে তুমি মনে কর?" সুভাষচন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন: "মহারাজ, জগদ্দল পাথরকে সরানো কি সোজা কথা?"......তিনি সেদিন প্রায় একঘণ্টারও অধিক স্বামীজীর নিকট অতিবাহিত করিয়া তবে প্রত্যাবর্তন করেন।

॥ সেবাব্রতী বিপ্লবী সুভাষ ॥

—হেমন্তকুমার বসু

সুভাষচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বিপ্লব মন্ত্রের পূজারী। ছাত্র জীবনে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ছবি থাকিত তাঁহার পড়ার টেবিলে। বিপ্লব তাঁহার কাছে কেবল রাজনৈতিক বিপ্লব নহে। যে পরাধীনতা জাতিকে সর্বপ্রকারে দুর্বল করিতেছে, জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিতেছে, জাতীয়তা বোধের কণ্ঠরোধ করিতেছে, জাতির অর্থনীতি, সমাজনীতি সংস্কৃতিকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, দেশী ও বিদেশীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শোষণে সমাজ জীবন পঙ্গু ও নিঃস্ব করিতেছে তাহার প্রতিকারে জাতির সর্বস্তরে সর্বাঙ্গীন বিপ্লবকেই তিনি বিপ্লব বলিয়া মনে করেন। তাঁহার বিপ্লব শুধু শাসনের অবসান ঘটাইবে না। জাতির মধ্যে ব্যক্তি এবং ব্যক্তির, শ্রেণীর উপর শ্রেণীর এবং জাতির উপর জাতির যে শোষণ—এই সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্ত করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া একটি সুখী ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাই ছাত্রজীবন হইতে তিনি দুঃখ ও আর্তের সেবা করিয়াছেন, দরিদ্র ব্যক্তির সন্তানদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—গৃহে গৃহে চাউল সংগ্রহ করিয়া মানুষের মুখে অন্ন দিয়াছেন—তিনি জানিতেন এই সেবার দ্বারা জাতির কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে। কিন্তু সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিবে না—তাহা একমাত্র বিপ্লবের দ্বারা সম্ভব। তাই তিনি একদিকে বিপ্লবের সাধক অপর দিকে দুঃস্থের সেবক। একদিকে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষক অপরদিকে বিদেশী অধ্যাপকের ভারতের জাতীয়তার প্রতি দম্ভ ও ঘৃণ্য উক্তির প্রতিবাদে তাঁহার উপর আঘাত। একদিকে উত্তর বঙ্গের বন্যার্তদের সেবা অপরদিকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন। যতদিন সমাজের মধ্যে শোষণ থাকিবে ততদিন পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের সেবার মারফৎ বিপ্লব মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে; কিন্তু তিনি জানিতেন সেবা সাধারণতঃ সমাজের দৌর্বল্যেরই চিহ্ন। যতদিন সমাজে অসাম্য ও শোষণ থাকিবে ততদিনই সেবার প্রয়োজন হইবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া সেবার

প্রয়োজন হইবে না। যেদিন বিপ্লব সমাজকে সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে সেদিন সেবার প্রয়োজন হইবে না। অর্থাৎ যাহারা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী তাহাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া দরিদ্রতর ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের যথাসম্ভব অভাব মিটানো, সুতরাং দরিদ্র ও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বিত্তের সর্বপ্রকার অবসান ঘটাইয়া সমাজের সকল মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা হইতে পারে। এইরূপ সমাজ গঠন করাই তাঁহার আদর্শ।

১৯৪০ সালে নাগপুরে ফরোয়ার্ডব্লক পার্টি সম্মেলনে সেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী দল ও ব্যক্তিগণকে লইযা বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং উহার পরে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের দ্বারা শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

১৯৩৮ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে কংগ্রেসকে দেশের জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়া বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে আহ্বান করিযাছিলেন কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেদিন আপোষের মনোভাব লইয়া বসিয়াছিলেন, তাই তিনি রামগড় সম্মেলনে আপোষহীন সংগ্রামের কথাই বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই ইহা ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং উহা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই কংগ্রেসের মত একটি বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংগ্রাম বিমুখ অবস্থা দেখিয়া তিনি বামপন্থী দলদের সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফরওযার্ড ব্লক সংগঠন করিলেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্দেশ দিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহনের জন্য অন্য পন্থা উপায়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। হলওয়েল স্মৃতি অপসারণ আন্দোলনে কারাগারে বসিয়া তিনি কর্ম্মপন্থা স্থির করিলেন এবং অনশনের মারফৎ জেল হইতে মুক্ত হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ভারতের বাহিরে যে অত্যধিক বিস্ময়কর অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সংগ্রাম তিনি সুরু করিলেন তাহা আজ ভারতবাসীর অবিদিত নাই। আজাদ হিন্দ বাহিনী দিল্লীর পথে ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের হঠাৎ অবসান হওয়াতে যদিও তাঁহার সৈন্যরা দিল্লী আসিতে পারেন নাই কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রামের ইতিহাস যখন তাঁহাদের বিচারের মধ্য দিয়া ভারতবাসীর কাছে উদ্ঘাটীত হইল তখন অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে ভারতে এক বিরাট বিপ্লবের অগ্নি

জলিয়া উঠিল। বোম্বাই এ নৌসেনা বাহিনীর বিদ্রোহ, কোষ্টাল ব্যাটারীর বিদ্রোহ, নাগপুরে সিগ্‌নালার কোরের বিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট ও বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে যে বিরাট চাঞ্চল্য ঘটিল তাহাতে ইংরাজ ভারতে তাহার দিন শেষ হইয়াছে জানিয়া নিজেদের ব্যবসায়ী স্বার্থ যাহাতে ভারতে বজায় থাকে অর্থাৎ ভারতের উপর তাহাদের শোষণের সুযোগ কায়েম থাকে সেই সর্ত্তে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা তাহারা তুলিয়া দিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বলিয়া থাকেন যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছে; ইতিহাস তাহা বলেনা। ১৯৪২ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে হিংসামূলক বলিয়া গান্ধীজী তাহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই এবং ঐ আন্দোলনের পর গান্ধীজী ১৯৪৫ সালের তদানীন্তন বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিয়াও উহা পান নাই, তবে হঠাৎ কেন ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের হাতে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল? নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বাধীনতা সংগ্রামই যে উহার জন্য মূলতঃ দায়ী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নেতাজীর বিশ্বাস যে জনগণের বিপ্লবের মারফৎ যে স্বাধীনতা আসে তাহাই জনগণের স্বাধীনতা—আপোষের মারফৎ প্রকৃত স্বাধীনতা আসে না। আপো-ষের মধ্য দিয়া যে স্বাধীনতা আসিয়াছে তাহাতে দেশী ও বিদেশীর শোষণ সম্পূর্ণ বজায় রহিয়াছে। কোন পরিকল্পনায় দেশকে বর্ত্তমান দুরবস্থায় ভয়াবহ বেকার সমস্যা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অত্যধিক মূল্য ও দেশী ও বিদেশী ধনীদের শোষণের হাত থেকে বাঁচাইতে পারিতেছে না। নেতাজীর প্রথম কথা আপোষহীন সংগ্রামের মারফৎ কতকটা বিদেশী শাসনের অবসান হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় কথা বিপ্লবের মারফৎ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া দেশে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন। সেই একমাত্র পথ যাহা দেশকে বর্তমান হাহাকার ও দুঃখময় পরিস্থিতি হইতে মুক্ত করিবে।

আজ দেশের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজ বিপ্লবের মারফতেই তাঁহার আদর্শকে রূপায়িত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। আজ যখন দেখি দেশব্যাপী বাঙ্‌লা ও বাঙালীকে নিশ্চিহ্ন করিবার ব্যাপকতর আয়োজন চলি-তেছে তখন মনে পড়ে সেই নির্ভীক নেতাজীর কথা। বাঙালীকে আজ বাঁচিতে হইলে চাই সর্বস্তরের ঐক্য আর নেতাজীর আদর্শ পূর্ত্তির সমবেত প্রয়াস।

[অমল হালদার সম্পাদিত "নটরাজ" ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত সংকলিত।]

॥ অধ্যাত্মবাদ ও সুভাষচন্দ্র ॥

—অজিত দাস

দেশকে যখন তার বাইরের রূপ দিয়ে বিচার করা হয়, তখন তার একটিমাত্র খণ্ডরূপেরই প্রকাশ ঘটে থাকে। তার পরিপূর্ণ রূপ থাকে অগোচরে। তখন স্বাভাবিকভাবেই তার পূর্ণ পরিচয় লাভের পথে দুরতিক্রমণীয় বাধা। কারণ দেশ ত কেবল বাহিরের রূপটুকু নিয়েই গড়ে ওঠে না—তার একটি অন্তরের রূপও থাকে। বাহিরের রূপে সে পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশের সঙ্গে প্রায় সমান। সেটা তার সাধারণ রূপ। কিন্তু যেরূপে সে একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশমান—যেখানে সে অন্য আর পাঁচটি দেশ থেকে স্বকীয় বৈশিষ্টে ভাস্বর সেটা তার বিশেষ রূপ, তার অন্তরের রূপ।

ভারতবর্ষও তেমনি তার আন্তর-বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। সাধারণ বা ভৌগলিকরূপে সে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেও একটিমাত্র বিশেষরূপে সে ইতিহাসে একটি বিশেষ জাতি হিসাবে পরিচিত। তার সেই বিশেষ বা আন্তরিক রূপটি প্রকাশিত তার অধ্যাত্মবোধের মধ্যে। ভারত বৈদিক আর্য সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্য্যন্ত যুগ যুগ ব্যাপী তপস্যা ও সাধনা দ্বারা যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে তার মূল ভিত্তিই এই অধ্যাত্মবাদ। ভারতের আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যায় ডঃ ভূদেব চৌধুরী বলেছেন—"আধ্যাত্মিকতা শব্দের অর্থ জীবনবিমুখ ঈশ্বর-মনস্কতা নয় কিছুতেই,........বস্তুতঃ 'অধি' অর্থাৎ গভীরভাবে যা আত্মার সম্পর্কিত তথা আত্মিক তাকেই আধ্যাত্মিকতা বলব। আর মানুষের মধ্যে দেহ-মন-বুদ্ধি অহঙ্কারের সমবেত সমন্বিত পরিণাম এবং এই সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে থেকেও তদতিরিক্ত যে সত্তা আমূল মানুষকে ধারণ করে রয়েছে তাকেই বলি আত্মা'। অর্থাৎ এখানেও আমরা দেখব আধ্যাত্মিকতাবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ক্ষুদ্র, খণ্ড মানুষ নয় পরিপূর্ণ মানুষ তথা মানবিকতা—যা কোন প্রকার উপাধি দ্বারা সঙ্কুচিত নয়—সেই বোধ এবং এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রকৃতির, মনুষ্যেতর প্রাণীর এবং এই প্রাণীজগৎ অতিক্রম করে ভূমার সঙ্গেও যে আত্মার সঙ্গে সম্পর্কায়িত হওয়ার চেষ্টা বা সাধনা আধ্যাত্মবোধ তারই প্রেরণা যোগায়।

যুগ যুগ ধরে এই ঐতিহ্য এ দেশে জলহাওয়া মাটি থেকে সকলের অলক্ষ্যে অবিরতভাবে এ দেশের মানুষকে এই রসের যোগান দিয়ে চলেছে। এই ধারায় সিঞ্চিত হয়ে আমরা জানি না কখন কোন অন্যমনস্কতায় আমাদের অন্তরলোকে আমরা দেশের মর্মবাণীকে নিজের জীবনসত্য হিসাবে গ্রহণ করে ফেলেছি। আর দেশের এই মর্মবাণীকে যিনি তাঁর সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করে কর্মে ও কথায় তাকে পূর্ণপ্রকাশিত করতে পেরেছেন—তাঁকেই আমরা মহামানব আখ্যায় ভূষিত করেছি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোন সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা, জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মত।

"এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবাণ প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজন সমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করাবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোন মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম"।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন তেমনি একজন মহামানব যিনি দেশের আত্মার মর্মবাণীকে বাঙ্ময় করেছিলেন তাঁর সাধনা এবং কর্মের দ্বারা এবং দেশ তাঁকে মাটির কোল থেকে নিজের কোলে জন্ম দিয়েছিল।

মেয়েদের মধ্যে যেমন জননী হবার বাসনা শৈশব থেকেই অন্তরের নিবিড়ে একটি গোপন ইচ্ছার মত সঙ্গোপনে বেড়ে উঠতে থাকে, সুভাষচন্দ্রের জীবনেও তেমনি ভাবে ইচ্ছার আকারে বেড়ে উঠেছিল তাঁর দেশ সেবার বাসনা। তরুণ বয়স থেকেই তিনি সেই বাসনাকে সার্থক করে তোলার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—

"দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে—
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে"।

তাই যে জীবনটুকু দিয়ে তিনি তাঁর শ্রেয়কে লাভ করতে চেয়েছেন তাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য কি অপরিসীম আর্তিই না তার তরুণ, কিশোর মনকে ব্যাকুল করেছিল। সে আকুলতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন। "এই সময় আমার মানসিক জীবনের অশান্ত অধ্যায়গুলির একটির সূচনা দেখা যাইতেছিল যাহা পাঁচ অথবা ছয় বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

এটা ছিল এমন একটা সময় যখন তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে অব্যক্ত দুঃখ আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে……"। এমনিভাবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আরও অনেক অশান্ত অধ্যায়কে অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে আরও অনেক দুঃখ ও যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে। কিশোর বয়সেই বন্ধুকে চিঠিতে লিখছেন—"আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে, তারই জন্ম আমার শরীর ধারণ"। কিন্তু আবার প্রশ্ন—"তবে জীবনের একটি fundamental principle ঠিক না করিলে কাহার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করিব বা কি লইয়া চলিব"?

এই fundamental principle যাকে জীবন সত্য বলাই ঠিক—যা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রেরণাদায়িনী শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল তার অন্বেষণে তিনি কি প্রচণ্ড মানসিক কষ্টলাভ করেছিলেন সে স্বীকৃতিও তাঁর আছে। বলছেন—"আমার যাহা প্রয়োজন ছিল—তাহা হইল একটি মূলনীতি—যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার সমগ্র জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে। ……… এই নীতি বা আদর্শকে খুঁজিয়া লইয়া উহার জন্ম নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা সহজ কাজ ছিল না"। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যানুসন্ধিৎসু মনের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন—

"যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা"।

জীবনদেবতা এমনি অপরিসীম ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়েই জীবন বীণার সত্যের তার বেঁধে দেন।

কারণ—"দুর্গম পথস্থাৎ কবয়ো বদন্তি"। সত্যের পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়—বড় দুর্গম, ক্ষুরের ধারের মত সংকীর্ণ। তাইত হিমালয় দুহিতা অকালবসন্তের পরিবেশে মদনের ফুলশরের সহায়তায় শিবকে, সত্যকে লাভ করতে পারেননি। প্রয়োজন হয়েছিল—বিরাট সাধনার, তপস্যার—যে তপস্যায় তিনি অপর্ণা হয়েছিলেন।

সত্যকে লাভ করবার এই পথ ছিল—স্বামী বিবেকানন্দের, ছিল রবীন্দ্রনাথের, ছিল শ্রীঅরবিন্দের। তাঁরা ভূমাকে চেয়েছিলেন—বিশ্বাস করেছিলেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" এই সত্যে। তাই চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক পথে বা কোন শ্রেণী চিহ্নিত 'ছক বাঁধা পথে না গিয়ে নিজ আন্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই তবে সত্যের পরিপূর্ণ রূপটিকে তাঁরা আয়ত্ব করেছিলেন। এঁদেরই

উত্তর-সূরী সুভাষচন্দ্রও তাই এই ভূমার আকর্ষণে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন—তাই তাঁর জীবনে এত আর্তি, এত বেদনা, এত সাধনা।

ছাত্রাবস্থায় প্রধান শিক্ষক শ্রীবেণীমাধব দাসের অনুপ্রেরণায় তাঁর মনের মধ্যে এক নিগূঢ় সৌন্দর্য্যবোধ এবং নৈতিক বোধের উন্মেষ ঘটেছিল। কিন্তু অন্তরের ক্রন্দন তাতে মেটেনি। যা তাঁর কাছে ছিল সমগ্র সত্তার মন্থনজাত "অন্তকরণ ধর্মের সার সত্য", "যাহা ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে" তেমন কোন সত্যের সন্ধান তখনও তিনি লাভ করতে পারেন নি।

সেই দুঃসাধ্য সাধনার ধন লাভ করলেন আকস্মিক ভাবে পাওয়া বিবেকানন্দের লেখা থেকে। বলছেন সুভাষচন্দ্র—"কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টাইয়াই বুঝিলাম যে উহাতে এমন কিছু রহিয়াছে যাহা আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। বইগুলি…বাড়ীতে আনিয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিলাম—মজ্জাবধি আমার শিহরিয়া উঠিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করিযাছিলেন—আমার জীবনে নূতন এক শক্তি আনিয়া দিযাছিলেন—কিন্তু তাহার নিকট হইতে এমন কোন আদর্শ লাভ করিতে পারি নাই যাহার জন্য আমার সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গ করিতে পারি। বিবেকানন্দেব মধ্যে উহা লাভ করিলাম।"

বিবেকানন্দের রচনা থেকে যে সত্য তিনি লাভ করেছিলেন—তাহাই পববর্ত্তি জীবনে তাঁকে আত্মার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ করেছিল—। আত্মাব সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি বলছেন—"আত্মায আমি বিশ্বাস কবি কেন? আমার প্রকৃতি যেরূপ তাহাতে ইহার প্রয়োজন—একটি বাস্তব প্রয়োজন। জড জগতেব মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমি দেখিয়া থাকি; আমার নিজের জীবনে লক্ষ করি একটা ক্রমবর্দ্ধমান উদ্দেশ্য। আমাব বোধ হয় যে আমি পবমাণু সকলের দ্বাবা গঠিত একটি পিণ্ডমাত্র নহি। ইহাও উপলব্ধি করি যে কতকগুলি অণুব আকস্মিক একটা সংমিশ্রনের ফলে বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই।"

আগেই বলেছি "গভীর ভাবে যা আত্মাব সঙ্গে সম্পর্কিত তথা আত্মিক তাকেই আধ্যাত্মিক বলব।" এই আত্মার প্রতি বিশ্বাস এবং প্রীতিই সুভাষচন্দ্রকে আধ্যাত্মিক করেছে।

এই আধ্যাত্মিকতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিই প্রেমবোধ—যা সুভাষ মানসের শ্রেষ্ঠ গুণ। সুভাষের নিজের ভাষায় বলা যায়—"চারিদিকে আমি প্রেমের

লীলা দেখি ; আমার মধ্যেও ঐ একই প্রবৃত্তি অনুভব করি : আমার মনে হয় যে নিজেকে পূর্ণতা দান করিবার জন্ম আমাকে ভালবাসিতেই হইবে এবং জীবনটাকে পুনর্গঠনের মূলনীতি হিসাবে প্রেম আমার পক্ষে প্রয়োজন।"

দেখা যাক আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে বা আত্মায় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কোথায়।

উপনিষদ বলে—যস্তঃ সর্বানি ভূতানি আত্মনেবাণুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ততঃ ন বিজুগুপ্সতে ॥

অর্থাৎ সর্বভূতের মধ্যে যিনি আত্মাকে পরিব্যাপ্ত দেখেন তার আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না। সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলের সঙ্গে একাত্মতার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া অর্থাৎ কি বস্তু কি প্রাণী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধা পড়া। যখন এই আত্মীয়তার বাঁধন অনুভব করা যায় তখনই মানুষের বাইরের নানা উপাধি দূর হয়ে যায়। এই সমস্ত উপাধিগুলি—যথা ধনের উপাধি, বলের উপাধি, বর্ণের উপাধি, প্রতিপত্তির উপাধি, জ্ঞানের উপাধি, মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে তার পূর্ণতাকে ভুলিয়ে দেয়—আর সেই সব খণ্ড ক্ষুদ্র মানুষ আপন আপন স্বার্থসন্নতায় পরস্পরে হানাহানি, শোষণ ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করে চলে। তাই উপনিষদের শিক্ষা—যদি আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে মানুষ আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়ে তবে তার পূর্ণতা রক্ষিত হয় এবং মানুষ তখন আত্মীয়তার আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মীয় জ্ঞানে সকলের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিবর্তে প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায়। তখন হাটের মানুষ হয়ে ওঠে আত্মার আত্মীয়।

এই বোধই সুভাষকে প্রেমিক করে তুলেছিল। তাই তিনি বলেন—'নিজেকে পূর্ণতা দান করিবার জন্য আমাকে ভালবাসিতেই হইবে।"

অন্য জায়গায় বলছেন—"...ধীরে ধীরে ইহা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সমাজের সেবা করা প্রয়োজন।" আর এই সমাজ সেবা ও স্বদেশ সেবা তাঁহার নিকট ছিল সমার্থক কারণ তাঁহার গুরু বিবেকানন্দ মানব সেবা ও স্বদেশ সেবাকে সমার্থক বলে প্রচার করেছেন।

প্রেমের বোধের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে অন্য যে গুণটি গভীর ভাবে সংযুক্ত তাহা ত্যাগ! প্রেমের ধর্মই ত্যাগ। যতক্ষণ প্রেম তাহার ধর্ম ত্যাগের সহিত মিশ্রিত না হয় ততক্ষণ প্রেমও পূর্ণতা পায় না—খণ্ডিত হয়ে পড়ে। তাই উপনিষদ বলে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত্।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা······ ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত এই বৃহৎ পৃথিবীকে ভোগ করবে ত্যাগের দ্বারা। এই ত্যাগের স্বরূপ কি? কি-ই বা ত্যাগ করতে হবে। কেবলমাত্র পার্থিব ভোগের বা লোভের উপকরণ ত্যাগ করলেই কি চলবে। না সে ত্যাগ ত সম্পূর্ণ ত্যাগ নয়। আরও অনেক ত্যাগের প্রয়োজন, আরও বড় ত্যাগের প্রয়োজন।

অধ্যাত্মবাদী বলেন—তোমার অহংবোধ যা তোমাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে প্রকৃতি থেকে তোমার শ্রেয় থেকে তোমাকে একটি কঠোর আবরণের দ্বারা পৃথক করে রেখেছে সেই আবরণটিকে ত্যাগ করতে হবে। তবেই সকলের সঙ্গে তোমার পার্থক্য ঘুচবে, আত্মীয়তা বোধের বড় বাধা কেটে যাবে—তোমার প্রেম সার্থক হয়ে উঠবে।

সুভাষ জীবনেও আমরা এই ত্যাগের সাধনা লক্ষ করেছি। যুবা বয়সে যখন সত্যানুসন্ধানে দুঃখ কষ্টে তিনি জর্জরিত এবং বিবেকানন্দের রচনা থেকে জীবন সত্য লাভের প্রচেষ্টায় উন্মুখ তখন বন্ধু হেমন্ত কুমারকে লেখা একটি চিঠিতে বলছেন—"আবরণ ত্যাগ না করিতে পারিলে কাহারও সঙ্গে মেশা যায় না। আমি কি সর্বাভরণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি?"

এখানে আবরণ বলতে যে অহং বোধের উল্লেখ করেছেন তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। আবরণ আর আভরণ ত্যাগের এই প্রেরণা এসেছিল তাঁর অধ্যাত্মবোধের নিবিড়তা থেকে, আর এই সাধনা যে তাঁর জীবনে সার্থকতা লাভ করেছিল তার প্রমাণ তাঁর দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরের বিস্তীর্ন কর্মজীবনে নিঃসন্দেহে প্রকাশ লাভ করেছে।

*　　　*　　　*

সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবন দর্শনকে সমন্বয়বাদী দর্শন আখ্যা দিয়েছেন। আমরা দেখব এই সংজ্ঞাটুকুও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ থেকে গৃহীত। হয়ত তিনি অজ্ঞাতসারেই এই নামটি স্থির করেছিলেন—কিন্তু এই নিরুপনের ব্যাপারটি তাঁর অবচেতন মনের অধ্যাত্মপ্রাতি থেকেই এসেছিল।

পৃথিবীতে যে কটি বিশিষ্ট ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছে—তাদের মোটামুটি ভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি সেমেটিক ধর্মমত এবং অপরটিকে বলা যায় বৈদিক আর্য্য ধর্মমত। প্রথমটি অর্থাৎ সেমেটিক ধর্মমত দিব্য আবির্ভাব (Revelation) এবং অভ্রান্তবাদ (infalibility) তত্ত্বে বিশ্বাসী। এদের মতে

ঈশ্বর তাঁর কোন পুত্র অথবা প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে পাঠান—যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী বহন করে আনেন মানুষকে সত্য পথ পরিদর্শনের জন্য, এবং যে বাণী তিনি প্রচার করেন তাহা অভ্রান্ত। তাঁর প্রচারিত বিষয় এবং প্রদর্শিত পথের বিপরীত যে মত তাই ভ্রান্ত এবং সে পথ অবলম্বনকারী ধর্মভ্রষ্ট বা বিধর্মী। পক্ষান্তরে বৈদিক মতবাদ ঠিক এর বিপরীত। এদের মতে যুগে যুগে নানা অবতার মানুষের দুঃখ কষ্টে কাতর হয়ে তাদের উদ্ধারের ইচ্ছায় ধরায় অবতীর্ণ হন—এবং সাধনা দ্বারা সত্য পথ এবং ধর্মের পথের বার্তা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেন। বৈদিক ধর্মবিশ্বাসীরা এঁদের কোন অবতারকে বা তাঁদের মতকে একেবারে বর্জন করেন না বা ধর্মবিরোধী বলে চিন্তা করেন না এবং প্রতিটি মহামানব বা অবতারের সাধনা লব্ধ সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে এক সমন্বয়ের সূত্রে গেথে নেবার চেষ্টা করেন। তাই দেখা যায় এই সমন্বয়ী ধারায় গীতার শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের সোঽহং ধর্মের সহাবস্থান—অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের সহাবস্থান।

এই সমন্বয়ী জীবনবাদ সহস্র বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে ভারতীয় জনমানসকে নিবিড় ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। যার ফলে ভারতবাসী মাত্রেই জীবনের প্রায় সবদিকেই কিছুটা সমন্বয়ী দৃষ্টি ভঙ্গির সমর্থক। বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সুর ভারতবাসীর জীবনে সবচেয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। এই ঐক্য বা সমন্বয়ের আলোকেই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ঐশ্বর্য্যময়। সুভাষচন্দ্র এই ঐতিহ্যের প্রেরণাতেই—সমন্বয়বাদী।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন জন্ম বিপ্লবী। বিপ্লবীর সংজ্ঞা কি? যে জীবন প্রেমিক সেই সার্থক বিপ্লবী। জীবন বিমুখ যে জন সেত লুঠেরা ধ্বংসকারী। আবার জীবনের প্রতি প্রেম যখন ধর্মের সঙ্গে মিলিত না হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধে তখন সে হয়ে পড়ে চরম স্বার্থবাদী।

তখন সে তার চারপাশের মানুষকে বঞ্চনা করে শোষণ করে নিজের দিকে সবকিছুকে আকর্ষণ করে—সমস্ত কিছু অপহরণ করে নিজের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে নিজেকে বৃহৎ থেকে, পূর্ণ থেকে খণ্ডিত করে অহরহ মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়। আর যখন এই প্রেম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের দিক থেকে জগতের চারিদিকে নিজেকে উৎসারিত করে দেয়—আত্মাকে সমস্ত প্রাণের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়ে সে সমস্ত মানুষকে আপন আত্মার আত্মীয় করে নেয়। মানুষের ক্রন্দন মানুষের আনন্দ তাঁর আপন অনুভূতির বস্তু হয়ে ওঠে। তখন আর্ত মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি তাঁর সার্থক বিপ্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক মন এই ধর্মবোধের সঙ্গে, অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে একাত্মভূত হতে পেরেছিল বলেই তিনি সার্থক বিপ্লবী সার্থক পুরুষ এবং পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

॥ লণ্ডনে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ ॥

—অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজরা কী চোখে দেখেছিলেন তার সব কথাটা আমরা জানি না। বরং বলা উচিত অল্প কথাই জানি। প্রীতির চোখে যে দেখেনি সেটা বোঝা যায়,—ভীতির চোখেই দেখেছে,—এবং সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় ইংরেজের প্রীতি-ভিখারী ছিলেন না। ইংরেজের ভীতির পরিমাণের উপরই সুভাষচন্দ্রের বিরাটত্বের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে, কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে তিনি জীবনের লক্ষ্য করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার উপরে ইংরেজের জীবনের সাচ্ছল্য নির্ভর করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক শক্তিকে তাই ইংরেজ সর্বাধিক বিদ্বেষের চোখে দেখবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কক্ষে কক্ষে অনেক অস্ত্রই জমা ছিল।

ভারতস্থ ইংরেজের কালো খাতায় সুভাষচন্দ্রের নাম তাঁর কৈশোরেই লেখা হয়ে গিয়েছিল যখন ওটেন সাহেবকে প্রহারকাণ্ডে নেতৃত্ব করেছিলেন। গুরুমারা ছেলেটির ঔদ্ধত্য অতঃপর ভারত ছেড়ে ইংলণ্ডে গিয়ে হাজির হল—সুভাষচন্দ্র আই সি এস পরীক্ষাফল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে ভারতে ফিরে এসে চিত্তরঞ্জন দাশ নামক অতি বুদ্ধিমান অথচ গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে থেকে সুভাষচন্দ্র যে সব কাজ করলেন, তাও আশঙ্কার সৃষ্টি না করে পারেনি। ত্যাগ মানে বুদ্ধি ত্যাগ নয়, সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে ইংরেজ দেখল, অসামান্য সংগঠনশক্তি এবং অনমনীয় চরিত্রশক্তি—সেই সঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে হরতাল সংগঠনে, কর্পোরেশনে প্রধান কর্মকর্তারূপে কার্য্যনির্বাহে, উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে সুভাষচন্দ্র শাসকশক্তির পক্ষে ভীতিজনক নানা পরিচয় প্রকাশ করতে লাগলেন।

অথচ সুভাষচন্দ্র যে মূলে বিপ্লবী তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি। বিপ্লবের ছায়া তাঁর চতুর্দিকে জ্যোতির্বলয়ের মত ঘিরে থেকে রহস্যময় আকর্ষণ সৃষ্টি করছে, ওদিকে প্রকাশ্যে তিনি তাঁর সংগঠন শক্তির দ্বারা

শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছেন, দলীয়তার জন্য বহু নিন্দা লাভ করেছেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছেন না, দলউর্ধ্বে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বায়ুভূতো মহিমার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন না, অর্থাৎ স্পষ্ট প্রখর একটি সংগঠন তৈরী করে তুলছেন যা ভবিষ্যতে বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারবে—সুতরাং যতই তিনি বলুন যে "না না, সরকার যেমন ভাবে, আমি মোটেই তেমন মারাত্মক মানুষ নই"—সরকার কিন্তু তাকে মারাত্মক মনে না করে পারেনি।

ভারতের ইংরেজদের কাছে উদ্ঘাটিত সুভাষচন্দ্রের এই পরিচয় বিস্তারিত ভাবে হাজির হল ইংলণ্ডের ইংরেজের কাছে যখন তিনি 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল' লিখলেন, এবং সে গ্রন্থ ভারতে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। যিনি ছিলেন মাথা গরম বাঙালী ছোকরা, নির্বোধ, কেননা আই সি এস ত্যাগ করেছেন, ভণ্ড, কারণ ইংরেজের মহত্ত্ব দেখতে অপারগ, তিনি আবার লেখক হয়ে উঠলেন—যে-লেখায় গান্ধীর কঠোর নিন্দা থাকা সত্ত্বেও গান্ধীভক্ত রোমাঁ রোঁলা প্রশংসা করবেন, (লোকটা আসলে বলশেভিক।) এবং হিংসায় উস্কানি যে-বই তাকে ভারতে নিষিদ্ধ করার মত উপযুক্ত কাজ করলেও এইচ জি ওয়েলস (উঃ, ঐ বাচাল লেখকটা!) বা জর্জ বার্ণার্ড শও (চিরশত্রু আইরিশ!) প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে মনস্থ করবেন।

"লোকটি জিনিয়াস", ভারতসচিব হাউস অব লর্ডসে দাঁড়িয়ে বললেন "দল বাঁধবার, কাজ চালাবার অদ্ভুত ক্ষমতা"। ভারতসচিবের মতে, এমন সম্পদকে কারাগারের বাইরে ফেলে রাখা যায় না।

যখন শেষে না গেল, এহেন মানুষ হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) সভাপতি হতে পারেন, তখন তাঁর সম্বন্ধে মত না বদলালেও ইংরেজকে ব্যবহারের কিছুটা বদল করতে হলই। লিবার্যাল ইংরেজ এবার এগিয়ে এসে তাঁর করমর্দন করল।

কংগ্রেস সভাপতিপদে নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কিছুটা আন্তর্জাতিক চরিত্র হয়ে উঠলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে সচেতনতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, পণ্ডিত জহরলাল ছাড়া এ-ব্যাপারে তাঁর সমতুল কেউ নেই কংগ্রেসে। অধিকন্তু বলা যায়, ভারতের জাতীয় প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে নির্দিষ্টভাবে অনুধাবনের ও ব্যবহারের সামর্থ্য অপর যে-কোনো কংগ্রেসীর তুলনায় তাঁর বেশী। কিন্তু তা হলেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঠিক ঠিক পেলেন কংগ্রেস সভাপতি হবার পরেই।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে যে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন তা তাঁর পক্ষে আশাতীত।

শত্রুপক্ষেও আগে কোনো ভালবাসা তাঁর প্রতি দেখায়নি। কারাগারে জীবনের বড় অংশ কাটাতে হয়েছে, তথাকথিত মুক্ত জীবনেও গুপ্তচরের সদাজাগ্রত চোখ অলক্ষ্যে পাহারা দিয়েছে। এর আগে ১৯৩৩ সালে যখন ইংলণ্ডে যেতে চেয়েছেন, যেতে দেওয়া হয়নি। এবার অকস্মাৎ দ্বার খুলে গেল—মনে হল কিছু কিছু ইংরেজের হৃদয়ের দ্বার পর্যন্ত যেন খুলে গেছে।

চিকিৎসা সমাপ্ত করবার জন্য সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। অষ্ট্রিয়ায় প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস ,বাডগাস্টিনে পৌঁছলেন।

চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়েছিল, গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়নি। তার আগেই দেশের আহ্বানও এসে গেল। দেশে ফেরার আগে ইংলণ্ডে ঘুরে যাবার আমন্ত্রণ তাঁকে স্বীকার করতে হল। গ্রেট বৃটেনের বিশিষ্ট ভারতীয়রা ইংলণ্ডে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে প্রবেশের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, পরিবর্তিত অবস্থায় তা শিথিল করে দেওয়া হল। সহানুভূতিশীল লর্ড কিনোউলের জিজ্ঞাসার উত্তরে মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড জানিয়েছিলেন, "সুভাষ বসু যদি ইংলণ্ডে আসতে চান, তাহলে কোনো বাধাসৃষ্টি করা হবে না"। সুতরাং "সেই বিশেষ দিনটি এল—গ্রেট বৃটেনের ভারতীয় সম্প্রদায় যার জন্য এত প্রতীক্ষা করেছে"—১০ই জানুয়ারী রবিবার বিকালে সুভাষচন্দ্র ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে নামলেন। আবহাওয়া খারাপ ছিল, ট্রেন একঘণ্টা লেট, তবু সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী ভারতীয় ও ইংরেজরা ভিড় করে অপেক্ষা করছিল স্টেশনে। "সর্বমতের ভারতীয়রাই উপস্থিত, অনেকেই এসেছেন জাতীয় পোষাকে। কয়েকজনের সযত্ন তত্ত্বাবধানে রয়েছে বিরাট একটি ত্রিবর্ণ পতাকা, বাইরের লোকজনকে যা ভারতীয় নেতার আগমনের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ইঞ্জিন স্টেশনে ঢোকামাত্র জয়ধ্বনি উঠল—"সুভাষ বাবু কি জয়! মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

সুভাষচন্দ্র অবতরণ করা মাত্র ভারতীয় রীতিতে সজ্জিত বাঙালী মহিলা শ্রীমতী ভট্টাচার্য ভারতীয় রীতিতে তাঁকে প্রথম মাল্যদান করে বাংলায় কুশল প্রশ্ন করলেন। "তারপরেই অভিনন্দন জানালেন মিস ইন্দিরা নেহরু।"

সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানাতে "যে জনতার সমাবেশ হয়েছিল, তার তুল্য জনতা মাত্র দেখা গেছে গান্ধী ও নেহরুর সংবর্ধনায়।" প্রচুর মালা, প্রচুর ছবি, প্রচুর অনুরাগ বাক্য—তার মধ্য দিয়ে স্টেশন-কর্মীদের সহায়তায় দ্রুত বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র গাড়িতে উঠলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ডরচেস্টার

হোটেলে আন্তর্জাতিক সংবাদপ্রতিনিধিদের সম্মুখীন তিনি হবেন। হোটেলের দিকে যে-গাড়িতে ছুটলেন, তার সামনে লাগানো ছিল কংগ্রেসের পতাকা, চালাচ্ছিলেন ভারতীয়-মালিক মিঃ চাপেকার।

ডরচেস্টার হোটেলে সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্ত পি. বি. শীলের আতিথ্য নিলেন। ঘর ঠাসা সাংবাদিক; "কার্যতঃ লণ্ডনের এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানের প্রায় সকল সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংবাদদাতারা উপস্থিত: কন্টিনেণ্ট ও আমেরিকান সংবাদপত্রের প্রতিনিধিও যথোপযুক্ত সংখ্যায়: ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের একজন প্রতিনিধিও অনুপস্থিত নয়।" লর্ড কিনোউলের নেতৃত্বে সাংবাদিকরা সমবেত। বহু-আলোচিত ব্যক্তিটিকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য তাঁরা অধীর। "দীর্ঘাকার, সুদর্শন, মর্যাদাগম্ভীর মানুষটির উপরে তাঁরা প্রশ্ন বর্ষণ করে চললেন অজস্রধারে। তিনি শান্তভাবে, দক্ষতার সঙ্গে, প্রসন্ন হাসির মেজাজে উত্তর দিতে লাগলেন।" ভারতে সদ্য-প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সম্বন্ধেই বেশী প্রশ্ন করা হল। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ঔচিত্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত মনোভাব যাই হোক না কেন 'বেসরকারী রাষ্ট্রদূত' হিসাবে বাইরের মানুষের কাছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কৃতিত্বের কথাই বললেন। একটা কথা নিতান্ত পরিষ্কার করে তুললেন—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে অংশ নেওয়া মানে প্রস্তাবিত ফেডারেশন পরিকল্পনাকে মেনে নেওয়া নয়। কদাপি নয়। কংগ্রেস ফেডারেশন পরিকল্পনার সঙ্গে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়বে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেখানে বিপন্ন সেখানে কংগ্রেসের মনোভাব কী, স্পষ্টভাষায় সুভাষচন্দ্র খুলে বললেন। সুভাষচন্দ্র জানালেন—"সাম্রাজ্য-বাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করছে, আমাদের সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি তাদের জন্য, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে।" উপক্রুত চীন ও স্পেনের জন্য কংগ্রেসের মমত্বের কথা জানিয়ে বললেন, জাপানের নিন্দা কংগ্রেস করেছে। চীন ও স্পেনের জন্য ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়রা যা করেছে, তাতে গভীর সন্তোষ জানালেন।

* * *

১১ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্যাংক্রাশ টাউন হলে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হল। বৃটিশ কমিউনিষ্ট নেতা রজনী পাম দত্ত সভাপতিত্ব করেন।

বিপুল সংবর্ধনায় সুভাষচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বহুভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার পরে বললেন :

"এই যে এত ভালবাসা আপনারা আমাকে জানালেন, অবশ্যই তা জনজীবনে আমার ভূমিকার জন্য। হাঁ, আমার সে জীবন ঝঞ্ঝাময়, কিন্তু তার মধ্যে প্রচুর রোমান্সও রয়েছে। এখানে আমার চেয়ে অল্প বয়সী যারা উপস্থিত রয়েছে, তোমাদের আমি আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, বিদেশী শাসনের অন্ধকার দিক আছে সত্য, কিন্তু যে সব তরুণ-তরুণী দুঃসাহসের জীবন চায় তারা অ্যাডভেঞ্চারের রোমান্স এই শাসনে যথেষ্টই পাবে। আরও আশ্বাস দিতে পারি, শুধু প্রভূত রোমান্সই পাবে না, সেইসঙ্গে প্রচুর স্নেহ-ভালবাসাও পাবে—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যত পীড়ন করবে, তোমার দেশবাসী তত ভালবাসাই তোমাকে ফিরিয়ে দেবে।"

"সকল দিক দেখে মনে হয়, ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আর একটি ভয়ঙ্কর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কংগ্রেস তার জন্য প্রস্তুত।"

কংগ্রেস নিশ্চয় প্রস্তুত। তবু—

"যদি পরবর্তী আন্দোলন ব্যর্থ হয়, ভারতের জনগণের ভিতর থেকে নবীন ও উত্তম নেতৃত্ব আসবে।"

* * *

সুভাষচন্দ্র বসু কিছুই গোপন করতে ভালবাসেন না। মেরুদণ্ড খাড়া রেখেই তিনি চলতেন, সেই তাঁর ভবিতব্য। সুতরাং পরদিন ১২ই জানুয়ারী অপরাহ্নে ক্যাক্সটন হাউসে ইণ্ডিয়া লীগের পার্লামেন্টারী কমিটির সদস্যদের সম্মুখীন হয়ে সরাসরি বললেন :—

"যে মুহূর্তে ভারতে ফেডারেশন পরিকল্পনা চালু করা হবে, তখনি চরম সঙ্কট ঘনাবে ; কংগ্রেস ফেডারেশনের প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিখ্যাত ভারত-বন্ধু ইংরেজ ; যথা, স্যার জন মেনার্ড, লর্ড ক্যারিংডন, মিঃ রেজিন্যাল্ড সোরেনসেন, এম. পি. মিঃ হেনরি পোলক, মিঃ বেন ব্রাডলি, মিঃ রোনাল্ড কিড, মিঃ রেজিনাল্ড ব্রিজম্যান ইত্যাদি।

এইদিন সকালেই "মেজর এটলি, লর্ড স্নেল এবং আর্ল অব কিনোউলের সঙ্গে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর দীর্ঘ একান্ত আলোচনা হয়েছে।"

সকালের ঐ আলোচনা সত্ত্বেও (কিংবা ঐ আলোচনার জন্যই) অপরাহ্নের আলোচ্য সভায় সুভাষচন্দ্রের বলতে বাধল না :—

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে কোনো ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের সাহায্য পাওয়া যাবে, এহেন চিন্তার দিন একেবারেই গেছে। সংগ্রাম আমাদেরই—সে সংগ্রামের সম্মুখীন আমরাই হব। ইংরেজ শ্রমিক দলের কার্যকলাপ দেখে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। ব্রিটেনে যাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, ভারত স্বাধীন না হলে ব্রিটেন কদাপি সমাজতন্ত্রী দেশ হবে না।"

*   *   *

প্রত্যাশিত সংবাদটি এসে গেল ১৪ই জানুয়ারী—সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ঐদিন কনওয়ে হলে ইণ্ডিয়া লীগ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় সংবাদটি ঘোষিত হলে সভাগৃহ হর্ষে উদ্দীপনায় ফেটে পড়ল। সভাগৃহ পরিপূর্ণ: ইংল্যাণ্ডে সুভাষচন্দ্রের এতাবৎ সর্ববৃহৎ জনসভা। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা মিঃ জর্জ লনসবেরী। শ্রমিক দল ও উদারনৈতিক দলের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অভিনন্দন জানিয়ে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ আর্থার গ্রীনউড, এম পি, লর্ড লিস্টোয়েল, মিঃ লরেন্স হসম্যান, মিঃ বেসিল ম্যাথুস, মিঃ আর্নেস্ট থর্টল প্রভৃতি।

সভাপতি জর্জ লনসবেরী তাঁর ভাষণে কিছু স্পষ্টোক্তি করেন: "যাঁরা মনে করেন মিঃ বসু ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নন, কিংবা তাঁকে অতীব ভয়ঙ্কর মানুষ মনে করেন, কংগ্রেস সভাপতি পদে তাঁর এই নির্বাচন তাদের প্রতি যোগ্য উত্তর। আশা করা যায়, মিঃ বসুর সভাপতিত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে দৃঢ়তর পদক্ষেপ করবে।"

নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ বক্তৃতা। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে এহেন জোরালো সমর্থন ইংলণ্ডের দায়িত্বশীল মহলে তখন অল্পই দেখা গেছে। নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায় উপযুক্ত ভাষণ। ভারতবর্ষকে যে লড়ে স্বাধীনতা নিতে হবে, ব্রিটিশ শ্রমিক দলের কাছ থেকে প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্র তা শুনলেন। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ হবে সংগ্রাম—তাও জানলেন। এঁর কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র যে প্রকাশ্য প্রশংসা লাভ করলেন, বিশিষ্ট কোনো ইংরেজ রাজনীতিক ঐ ভাষায় তাঁর প্রশংসা করেছেন কিনা সন্দেহ। মনে রাখতে হবে, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অথচ ভারতের পরাধীনতায় বস্তুগতভাবে লাভবান ইংরেজ শ্রমিক দলের কঠোর সমালোচক ছিলেন

সুভাষচন্দ্র। ক্যাক্সটন হাউসের সমাবেশে ঠিক দুদিন আগে তিনি সে-কথা বলেছেন।

উত্তর দিতে উঠে সুভাষচন্দ্র তাঁর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রশংসা-বাক্যাদির জন্য ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে নির্দয় সরলতার সঙ্গে বলেন,—শ্রমিক দল ভারতকে বাস্তবিক কোনো সাহায্য করবে, এ সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে। তবে তিনি বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় বিশ্বাসী। ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারবে না।

১৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার রাত্রে ভারতীয় স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, সিলোন স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন মজলিশ, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস সোসাইটিজ ইন গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড—এই সকল সমিতি মিলিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে ১১২, গাওয়ার স্ট্রিট, লণ্ডনে অভ্যর্থনা জানায়।

ছাত্রদের সভা বলে সুভাষচন্দ্র অনেকখানি অন্তরঙ্গ সুরে, ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে কথা বলেছিলেন। ভাবী লেখকদের জেলে যেতে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন: তোমাদের মধ্যে যারা লেখক, গ্রন্থকার বা কবি হতে চাও, তারা কারা-জীবনকে শিল্পের উপাদান বিবেচনা করে আমার মত জেলে যাবার চেষ্টা করো।

স্বাধীনতার স্বরূপ কী, সেই স্বাধীনতার শত্রু কে, কিভাবে তাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে সে সম্পর্কে এই আপোষহীন যোদ্ধা বললেন:

"এ-দেশে তোমরা যারা রয়েছ, তোমাদের ভাবতে হবে দেশের মানুষকে কিভাবে মুক্তি দিতে পারো। সর্ববিষয়ে তাদের মুক্তি দিতে হবে—রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে দিতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার অর্থ যদি হয় জমিদার, পুঁজিপতি, অভিজাত শ্রেণী বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার জন্য তৈরী থেকো।......

ভারতীয় জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ফলেই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ তার বন্ধু পায় জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্য থেকে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ঐসব স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করা।"

নিছক স্বাধীনতা-সংগ্রামীরূপে যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে দেখতে বা দেখাতে চান, তাঁদের কাছে সুভাষচন্দ্রের ঐ রূপ অপরিচিত ও অনাবশ্যক সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেই আমরা আসল সুভাষচন্দ্রকে পাব।

শুধু ভারতীয় ছাত্ররাই নয়, ইংরেজ ছাত্ররাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ১৪ই জানুয়ারী সম্বর্ধিত হয়েছিলেন লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের পক্ষ থেকে। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক টনী। তারপরে ইউনিভার্সিটি লেবার ফেডারেশনের ভবনে অন্য অনেক শিক্ষাবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

"রবিবার সারাদিন তিনি কেম্ব্রিজে কাটালেন। তাঁর সেই পুরাতন শিক্ষা-নিকেতনের ছাত্ররা তাঁর জন্য অনেক কিছু কাজকর্মের বরাদ্দ করে রেখেছে। অক্সফোর্ডও সম্ভবতঃ একই ধরনের সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাবে।"

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র মিলিত হলেন। "সোসিয়ালিস্ট লীগের অগ্রজ সদস্য মিঃ হোরাবিন মিঃ বসুর সম্মানে এক বিশেষ অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় মিঃ বসু বিখ্যাত বামপন্থী লেখক ও মনস্বী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন ষ্ট্র্যাচী, গোলানৎস, রিকওয়ার্ড, মরিস, ব্রাউন, এবং মিসেস নাওমিচিশন। আমি আরও শুনেছি যে, মেজর এটলী সুভাষচন্দ্র বসুর কথাবার্তায় এমনই আকৃষ্ট হয়েছেন যে, তিনি আরও সাক্ষাৎকার কামনা করেছেন।"—সাংবাদিক লিখলেন।

সে সাক্ষাৎকারের সুযোগ মেজর এটলী পেয়েছিলেন। শ্রমিক দলের সম্পাদক মিঃ মিডলটনের আমন্ত্রণে মধ্যাহ্ন ভোজে সুভাষচন্দ্র শ্রমিক দলের রাজনৈতিক ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট যেসব নেতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ এলুইন, মেজর এটলী, মিঃ গ্রীনউড, মিঃ আর্নেস্ট বেভিন, মিসেস পেথিক লরেন্স।

এই ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র সরাসরি প্রশ্ন করে বসেন, শ্রমিক দলের কার্যসূচীর মধ্যে ভারত-প্রসঙ্গ নেই কেন? তাঁর এই ধরনের খোলা কথাকে তখনকার মত খোলা মনেই শ্রমিক নেতারা গ্রহণ করেন।

এই ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র নাকি শ্রমিক নেতাদের মনে উত্তম ধারণা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আসলে মনে হয়, শ্রমিক নেতার বুঝেছিলেন, সুভাষচন্দ্র কী পদার্থ।

* ২ *

বারট্রাণ্ড রাসেলের লেখার বিশেষ ভক্ত সুভাষচন্দ্র রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে পারেন নি। "লণ্ডনের সংবাদসূত্রে প্রকাশ মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু

আর একটি শেষ রাত্রির আলোচনায় বসেছিলেন, সে আলোচনা মিঃ রাসেলের সঙ্গে। মিঃ বসু কেম্ব্রিজ থেকে শেষ রাত্রির আগে ফেরেন নি।"

হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গেও কথাবার্তা বাদ যেতে পারে না। কৃষ্ণ মেননকে সঙ্গে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। অধ্যাপক হলডেন এবং ডাঃ আইভরের সঙ্গেও কথাবার্তা হল ১৮ই জানুয়ারী রাত্রে।

* * *

সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে; লণ্ডনের ক্রয়ডন বিমানবন্দর থেকে বিমানে ভারতযাত্রা করেন ১৯শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে আটটায়।

সাংবাদিক লিখেছেন: "ভারতের এই অতিথি সারাক্ষণই ব্যস্ত। জনসভায় বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার, একান্ত আলোচনা, ছাত্রদের নির্দেশদান— সব কিছু তার মধ্যে আছে। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বহুসংখ্যক ইংরেজ রাজনীতিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবী এবং কমিউনিস্ট দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দিনে গড়ে তিনটি করে সভায় বক্তৃতা করেছেন।

"তিনি যে খাটো কোনো মানুষ নন তা স্পষ্টই বোঝা গেল যখন দেখা গেল, মিঃ এটলীর স্তরের ব্রিটিশ রাজনীতিক, মিঃ আর্নেস্ট বেভিনের স্তরের ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের স্তরের ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক এবং মিঃ হ্যারি পলিটের স্তরের ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা তাঁর সঙ্গে ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও তা থেকে ব্রিটিশ জনগণের পক্ষে দরকারী তথ্য সংগ্রহ করেছেন।"

এই তালিকায় দুজনের নাম নেই, পরবর্তীকালে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র যাঁদের নাম করেছেন। তাঁরা হলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার লর্ড হ্যালিফ্যাকস ও লর্ড জেটল্যাণ্ড। সেই সঙ্গে লর্ড অ্যালেন। হয়ত এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ খুবই গোপনে হয়েছিল, তাই সংবাদপত্রে ওঠেনি।

সুভাষচন্দ্র এই দিনগুলিতে কর্মব্যস্ত ছিলেন।

* * *

ভারতীয় রাজনীতিকরা যখন শত্রুপক্ষের সহৃদয়তায় ও সহায়তায় অভিভূত হন, তখনই আমরা আতঙ্ক বোধ করি। ভয় হয়, এই বুঝি তাঁরা নিজের প্রাপ্তি ও দেশের প্রাপ্তিকে এক করে ফেললেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা

যতখানি পান, সমষ্টি স্বার্থ থেকে দিয়ে আসেন অনেক বেশী। শান্তিবাদী ইংরেজ ও গুপ্তচর ইংরেজের দ্বারা পরিবৃত থেকে গোল-টেবিল বৈঠকের সময়ে গান্ধীজী যে রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের সমালোচনার কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে সুভাষচন্দ্র অনুরূপ ক্ষেত্রে আইরিশদের আচরণের উল্লেখ করেছিলেন। ইংরেজ উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিকেরা জহরলালকে কিভাবে গ্রাস করে ফেলেছিলেন, সেকথাও সুভাষচন্দ্রের রচনা মারফৎ আগে দেখেছি। সেই সকল উদারচরিত, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন ইংরেজরাই তো লণ্ডনে সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে ধরেছিলেন, প্রশংসাও করেছিলেন, এবং লণ্ডনের সুমধুর স্মৃতির কথাও সুভাষচন্দ্র বলেছেন। সাফল্যের হাসি তাঁর মুখে ও মনে। সুভাষচন্দ্র কি নমনীয় হননি, যিনি উচ্চাঙ্গের গর্ব করে বলেছেন—মেরুদণ্ড তাঁর সোজা আছে, থাকবে।

লণ্ডনে বহু আতিথ্যে ও সম্বর্ধনায় রসায়িত সুভাষচন্দ্র ইংরেজদের জাতশত্রু ডি ভ্যালেরার সঙ্গে গোপন আলোচনা করেছিলেন এরই মধ্যে এক মধ্যরাত্রে। কী আলোচনা হয়েছিল, তা জানতে ইংরেজ সাংবাদিকদের মনে কৌতূহলের অবধি ছিল না; এত আলো ও মালার মধ্যেও লোকটি তাঁর সঙ্গে কথা বলে এল, ইংরেজকে ইংরেজের অস্ত্র যে ফিরিয়ে দিয়েছে-- অনেকের মনেই কাঁটার মত বিঁধেছিল ব্যাপারটা। মনে হয়েছিল, সহাস্য সুন্দর মর্যাদাধারী লোকটি আসলে সত্যই ভয়ঙ্কর।

সুভাষচন্দ্র যখন লণ্ডন থেকে ভারতগামী বিমানে উঠলেন, তখন পিছনে কয়েক সহস্র করতালি, সামনে বহু কোটি বাহুর আহ্বান। সুভাষচন্দ্র কী করবেন, কী করতে পারেন, ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস সেই বার্তাকে ধারণ করবার জন্য অপেক্ষা করে রইল?

———

সামান্য তিনটি ঘটনা
ও
অসামান্য একটি লোক

—অনিল কুমার চন্দ

সামান্য তিনটি ঘটনা আপাত দৃষ্টিতে অতি সামান্যই মনে হয়—কিন্তু এই সামান্য ঘটনা তিনটির ভিতর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম কি অসামান্য আমাদের নেতা—সুভাষচন্দ্র।

তাঁর কলকাতা জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল, যার স্মৃতি আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই ঘনিষ্ঠতা সুরু হয়েছিল চিঠির মাধ্যমে এবং তার সূত্রপাত করেছিলেন তিনিই। ১৯৩৬ সালে ইউরোপ থেকে চিঠি লিখে আমার পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লিখেছিলেন ভারী সুন্দর একটা চিঠি। সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল তার অনেক পরে—যখন তিনি শ্রীনিকেতনে শিল্প ভবনের একটি বিক্রয় কেন্দ্র কলকাতায় আমাদের আমন্ত্রণে শুভ উদ্বোধন করতে এসেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি (তখনকার দিনে কংগ্রেস সভাপতিকেই রাষ্ট্রপতি অভিহিত করা হত) নির্বাচিত হবার পর তিনি দু তিন দিন বিশ্রাম নেবার জন্য শান্তিনিকেতনে এলেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে। সংগে ছিলেন শ্রদ্ধেয় নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়—যিনি পরে কলকাতার পৌর প্রধান (Mayor) নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেবার সুভাষচন্দ্র বাইরের কোনো সভাসমিতিতে যাননি, নিছক ছুটি কাটাতেই তাঁর এই অবস্থান। শুধুমাত্র একদিন শ্রীনিকেতনের অদূরবর্তী—"আমার কুঠি" তে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

এই অসামান্য কর্মবীর আবার সময় সময়ে বাঙালী জীবনের এক বৈশিষ্ট্য, আড্ডাও বেশ জমাতে পারতেন।

মুঠো মুঠো সুপুরী খেতেন। পকেটে সর্ব্বদাই থাকতো রূপোর ছোট একটা বাক্স। দু একবার উল্লেখ করেছিলেন, "আমি মশাই উড়িষ্যার লোক—সুপুরী ছাড়া আমার চলবে কি করে?"

বাইরের গণ্যমান্য অতিথি কেউ এলে স্বাক্ষর সংগ্রহকারীদের (autograph hunters) হাত থেকে তাঁদের বাঁচাবার জন্য তখনকার দিনে আমাদের রীতি ছিল ওদের খাতাগুলি আমাদের দপ্তরে রেখে যেতো—সুবিধে মতো তাঁর স্বাক্ষর লিখে দিতেন—কেউ কেউ হয়তো ছোটখাটো কবিতা বা বাণীও রেখে যেতেন। সেবার ছেলেমেয়েদের তিন চারশ' বই জমা পড়লো আমার দপ্তরে। আমি কয়েকবারই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর এই দায়িত্বের কথা। গল্প গুজবের আসর তিনি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলেন সে'ত নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু তার জন্যে এত তাড়া কিসের? সময় ত' ঢের আছে। এম্নি করে তাঁর শান্তিনিকেতনের ছুটি ফুরিয়ে এলো—শেষ সন্ধ্যা। পরের দিনই সকাল বেলার ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাবেন। আমার শিরে বজ্রাঘাত—তাঁর স্বাক্ষর জোগাড় না করতে পারলে ছেলে-মেয়েরা আমার চুল ছিঁড়ে নেবে একথা তাঁকে সসম্ভ্রমে মনে করিয়ে দিলাম। দশটা রাত হোলো—আমার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। শান্তিনিকেতনে আমাদের অতি ভোরে ওঠার প্রয়োজন—রীতিও তাই। সুভাষচন্দ্র তখন বলেন—দিনত' বইগুলো।—মুক্তি আমার আসন্ন ভেবে মনের আনন্দে এগিয়ে এলাম। সুভাষচন্দ্র তখন বল্লেন—বাঙালী ছেলেদের বইএ ত বাংলা স্বাক্ষর দিতে হবে—অবাঙালীদের ইংরেজীতে। কোনটা কার তা বলতে হবে। আমি বললাম তার কি প্রয়োজন। অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হবে—আপনার স্বাক্ষর হলেই হবে।

অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তিনি বল্লেন—আপনি আমাকে বইগুলো দিয়ে বাড়ী চলে যান। এই বলে প্রত্যেকটি বই ধরে বইটির মালিক বাঙালী কি অবাঙালী বের করে বাংলা বা ইংরেজীতে প্রয়োজন মত স্বাক্ষর দিতে লাগলেন। লজ্জায় দুঃখে আমি চুপ করে বসে রইলাম—তিনি দীর্ঘকাল ধরে এক একটি বইএ স্বাক্ষর করে গভীর রাত্রে বিশ্রাম করতে গেলেন। সে রাত্রের কথা মনে হ'লে, এখনো আমার মন লজ্জায় ক্ষোভে ভরে ওঠে। কিন্তু সেদিন বুঝেছিলাম সাধারণ মানুষে আর মহামানবে কি তফাৎ।

পরের দিন সকাল বেলা তিনি কলকাতা ফিরে গেলেন। আমরাও জনকয়েক সেই ট্রেনে কলকাতা চল্লাম. আমাদের গ্রন্থন বিভাগের একটা অধি-বেশন ছিল। তখনকার বিশ্বভারতীকে আমরা ঠাট্টা করে বলতাম নিঃস্বভারতী—আজকালের মত টাকার ছড়াছড়ি ছিল না। 'সেদিন কলকাতায় কার্য্যোপ-লক্ষে যেতে হলে আমরা ভাতা পেতাম সাত টাকা করে। আমরা সবাই

তখনকার ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের যাত্রী। সুভাষচন্দ্র ওদের দ্বিতীয় ক্লাসের রিটার্ণ টিকিট ছিল—কিন্তু তাঁরা আমাদের সঙ্গেই এক গাড়ীতে চল্লেন। সে ট্রেনটি ছিল অত্যন্ত শ্লথগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন—যাত্রী বিরল। সুভাষচন্দ্র সে ট্রেনেই কলকাতা যাচ্ছেন খবর রটেছিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে অগুনতি লোক—মালা চন্দন—সুভাষচন্দ্র কি জয়—বন্দেমাতরম্—ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কিছুই বাদ গেলো না। গুসকরা স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে একটি ছোট্টছেলে তাঁকে ভারী সুন্দর একটি গোলাপ উপহার দিল। সত্যি অতি সুন্দর. বেশ বড়ো—কোনো সৌখীন লোকের সখের বাগানের সেরা ফুলটি তুলে এনেছে নেতাকে অর্ঘ্য দেবার জন্যে। ফুলটি হাতে নিয়ে—সুভাষচন্দ্র খুব তারিফ করলেন, বল্লেন কলকাতা নিয়ে যাবো এবং সযত্নে ওপরের বাঙ্কে তুলে রাখলেন। আমাদের সঙ্গে মস্ত একঝুড়ি খাবার আমাদের বৌঠান শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী দিয়ে দিয়েছিলেন, রাস্তায় খাবার জন্যে। খুব হুল্লোর করে ট্রেনেই পিকনিক করা গেল।

কোনো একটা ছোট স্টেশানে গাড়ী থেমেছে—সুভাষচন্দ্র জনতার মধ্যে নেবে গেছেন—মালা চন্দন নিচ্ছেন। আমি আমার দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম আয়োজনে ব্যস্ত। তখনকার দিনে আমাকে মাঝে মাঝেই বিশ্বভারতীর কাজে কলকাতা যেতে হতো। আমার সংগে Duck back এর ছোট্ট একটি রাবারের বালিশ থাকতো—ফুঁ দিয়ে হাওয়া পুরে দিলেই চমৎকার বালিশ তৈরী হয়ে যেতো। ফুলটি দূরে সরিয়ে বালিশটি উপরে রেখে একলাফে বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লাম। সুভাষচন্দ্র গাড়ীতে উঠে একেবারে আর্ত্তস্বরে চিৎকার করে বল্লেন—আমার ফুলটি চেপে দিলেন? আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম—ফুলটি ঠিকই আছে। আমি দূরে সরিয়ে রেখেছি। তিনি যেন হারানো রত্ন ফিরে পেলেন এমনিভাবে ফুলটি তুলে নিলেন। মনে পড়লো গারিবাল্ডির কথা—বই এ পড়েছিলাম যে তিনি তাঁর হাজার মুক্তি সেনানীদের নিয়ে ন্যাপেল্‌সের (Naples) রাজার বিরুদ্ধে লড়াই কচ্ছেন। একটা পাহাড়ের ঘাটি দখল করবার জন্য জোর লড়াই চলেছে—তাঁর সৈন্যেরা প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন—সংগীন অবস্থা। এমন সময় হঠাৎ গারিবাল্ডি হুকুম দিলেন, বর্ষণ থামাও কিছুক্ষণ—পাশের একটা ঝোপে বসন্তের অগ্রদূত একটি নাইটিংগেল পাখী আপন মনে মধুর গান কচ্ছে—তিনি সবাইকে সে গান শোনবার জন্যে আহ্বান করলেন।

অন্তরে এই কবিপ্রাণ না থাকলে কি আর লাল কেল্লাতে কৌমীনিশান তুলবার জন্যে "তনমনধন" দিয়ে সবাইকে ডাক দিতে পারতেন তিনি?

এবার তৃতীয় ঘটনার উল্লেখ করি। যখন জহরলালজী চুঙ্‌কিঙে চৈনিক নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আমাদের চীনভবনের অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক তানয়ুনশেন ও আমি কলকাতায় আসি কিছু জরুরী পরামর্শের জন্যে। আমরা দিন কয়েক কলকাতায় ছিলাম ও তান সাহেব একদিন রাষ্ট্রপতিকে লাঞ্চ খাবার আমন্ত্রণ করলেন তখনকার চীনে পাড়ার বিখ্যাত রেষ্টুরেন্ট নানকিনে। তখনকার চৈনিক কনসাল-জেনারেল ও ১০/১২ জন নেতৃস্থানীয় চীনে ভদ্রলোক সেই ভোজে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ছাড়া আমিই মাত্র আরেকজন ভারতীয় ছিলাম সেখানে। Bird's nest soup, sharks fin, lotus seed প্রভৃতি নানাবিধ চৈনিক রীতি অনুযায়ী কয়েকঘণ্টা সেই ভোজন চল্লেও বেশ মনে পড়ে বিকেলে চায়ের সময় পর্যন্ত সেই বৈঠক চলেছিল। সুভাষচন্দ্র পরের দিন তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীতে প্রফেসার তান ও আমাকে খেতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যা আটটার পর আমরা দুজনে তাঁর ওখানে উপস্থিত হলাম। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা খুবই সমাদরের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কারণ সুভাষচন্দ্র তখনো তাঁর নানাবিধ সভাসমিতি শেষ করে বাড়ী ফিরতে পারেন নি—একটু দেরী হতে পারে বাড়ীতে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। ৯ টার কিছু পরে তিনি ফিরলেন ও দেরী হয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে ডিনার টেবিলে আসতে আদেশ দিলেন। তান সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে বল্লেন, আমাকে মার্জনা করবেন আমি আপনার সঙ্গে খেতে বসতে পারছি না। এক্ষুনি চুঁচুড়া যেতে হবে—এইমাত্র খবর এসেছে যে সেখানকার এক কংগ্রেস কর্মী টি. বি. রোগে মরনোন্মুখ—বড় আগ্রহ প্রকাশ করেছে মরবার আগে দেখতে চায়। আমাকে এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে। আমি তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে বল্লাম যে তাঁর অতিথি বিশিষ্ট এক বিদেশী—অধ্যাপক, একটু একসংগে বসে না গেলে কি অপরাধ হবে না? তিনি বল্লেন নিশ্চয়ই অপরাধ হবে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো অপরাধ হবে যদি আমি মৃত্যুপথ যাত্রী সেই কর্মীর পাশে গিয়ে না দাঁড়াই—এই বলে প্রফেসারের কাছে আরেকবার ক্ষমা চেয়ে ঝড়ের মত সিঁড়ি দিয়ে নেবে তাঁর অপেক্ষমান গাড়ীতে চেপে ঝটিতি চলে গেলেন।

দেশে নেতার অভাব নেই—কিন্তু নেতাজী শুধু এক—আমাদের সুভাষচন্দ্র।

॥ ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠন ও সুভাষচন্দ্র ॥

— ক্ষণেশ্বর ঘোষাল

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক মননধারা তাঁর সাম্য-সমন্বয়ী দর্শন থেকেই উৎসারিত হয়েছে আর ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তিভূমির উপরই গড়ে উঠেছে সুভাষীয় দর্শনের বনিয়াদ। সুভাষচন্দ্রের অখণ্ড সাম্য ভাবনার উৎস হ'ল প্রেম —যা ভারতবর্ষের আত্মিক সাধনার মূলীভূত বিষয়বস্তু। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি; এটিও ভারতীয় ঐতিহ্যের আঙ্গিক। সুভাষীয় চিন্তাধারায় তাই পৃথিবীর যা কিছু মহৎ চিন্তা ও কর্মের বিকাশ ঘটেছে বা ঘটবে সে সবের সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সুভাষচন্দ্র মানুষের দুঃখকে আপন দুঃখ করেছে। এই দুঃখ থেকে দ্রুত উত্তরণের তাগিদে তিনি মহা-বিপ্লবী এবং এক বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে চরম আঘাত দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছেন। কিন্তু তাঁর অনিবার্য অন্তর্ধানে সেই স্বাধীনতা বিশ্বে মানুষের অখণ্ড স্বাধীনতার ফলিত দর্শনে রূপায়িত হতে পারেনি। কিন্তু সুভাষদর্শন আগামী দিনের দর্শন— ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে সেদিকেই অগ্রসর হ'তে হবে। সুভাষ-জীবনের যে অনন্য বহুমাত্রিক (multidimensional) বিকাশ ইতিহাসে রূপায়িত হয়েছে তার মধ্যেই পরিস্ফুটিত হয়েছে সামাজিক রাষ্ট্রিক আর্থিকক্ষেত্রে সুভাষীয় নব্যদর্শনের কাঠামো। আর্থিক বৈষম্য-জর্জর, পরাধীনতাক্লিষ্ট, রাষ্ট্রের অত্যাচারে হতবাক, জড়বাদী আক্রমণে আত্মিকদৈন্যপীড়িত মানুষের মুক্তির বাণী নিয়ে এই নব্যদর্শন বর্তমান পৃথিবীতে সফল রূপায়ণের পথে এগিয়ে চলবে, কারণ প্রগতির নিয়মেই মুক্তির পূর্ণতর বিকাশ ঘটবেই। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'ভারতের একটা মিশন (mission) আছে, ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে।' এই জীবন্ত প্রত্যয় সুভাষচন্দ্রকে ভারতপথিকে রূপান্তরিত করেছে। সুভাষচন্দ্রের অখণ্ড সাম্যদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নূতন বৈপ্লবিক আর্থিক সংগঠন ও ভারতের নূতন অবদানের আঙ্গিক হয়ে উঠবে। মেদিনীপুর ভাষণে (২৯.১২.২৯) সুভাষচন্দ্র সাম্য-স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলেন 'আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীন মুক্তি-সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, যে সমাজে ব্যক্তি সর্বতোভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে

না—যে সমাজে অর্থের বৈষম্য আর থাকিবে না…।' অমরাবতী ভাষণে (১.১২.২৯) বলেন, 'আমরা যে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ঐশ্বর্যের উপর সকলের সমান অধিকার, বৈষম্যমূলক সামাজিক বিধান প্রত্যাহার…।' ১৯৪০ এর জুন মাসে অনুষ্ঠিত নাগপুর সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতীয় জনগণের হাতে সব ক্ষমতা অর্পণের ডাক দেন। সাম্য ও স্বাধীনতার নূতন সমন্বয়ের উপরেই সুভাষচন্দ্রের আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত হয়েছে। এই সমন্বয় সাম্যহীন স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা হননকারী সাম্যের দর্শন বা প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। সুভাষদর্শনে '…স্বাধীনতা মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই ভ্রাতৃত্ব।' (অমরাবতী ভাষণ)।

বর্তমান পৃথিবীতে দুটি বিতর্কমূলক আর্থিক কাঠামো আমাদের মণীষাকে আচ্ছন্ন করে। একটি স্বাধীন অর্থনীতি (liberal economy) এবং দ্বিতীয়টি কম্যুনিষ্ট অর্থনীতি। প্রথমটি ধনবাদী অর্থনীতির নামে শতাব্দীরও বেশী পশ্চিমী দেশ সমূহে এবং আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আর দ্বিতীয়টি রাশিয়া প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট শাসিত দেশে রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে গঠিত। উভয় প্রকার অর্থনীতির গোঁড়া কাঠামো আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কম্যুনিষ্ট দেশসমূহে অধিক উৎপাদনের স্বার্থে এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সুষ্ঠু বণ্টনের দাবীর চাপে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা প্রকার মিশ্র অর্থনীতির জন্ম হচ্ছে। এর মাধ্যম হ'ল রাষ্ট্রের পরিচালনায় বা আইনগত নিয়ন্ত্রণে বৃহৎ শিল্প এবং ব্যক্তিগত পরিচালনায় বা উৎসাহে মুখ্যতঃ মাঝারি বা ছোট শিল্প। উভয় প্রকার অর্থনীতিতে সাবলীলতার অভাব লক্ষ্যণীয়। স্বাধীন অর্থনীতির দেশ-গুলিতে যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োগ রয়েছে সেখানে সাম্যাভিমুখী বণ্টনের পথে ব্যাপক বাধার প্রাচীর আর কম্যুনিষ্ট শাসিত দেশসমূহে মানুষের বিকাশে দুস্তর বিঘ্ন দাঁড়িয়ে আছে।

সুভাষদর্শনে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিক প্রচেষ্টার সফল সমন্বয়ে গড়ে উঠবে নূতন সাম্যতান্ত্রিক সমাজ ও তার সাবলীল অর্থনীতি। এই দর্শনের পথ ধরেই অখণ্ড সাম্য স্বাধীন সমাজ রূপায়িত হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষ সেই রূপায়নে অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করুক। এই নূতন সমন্বয়ের দিকদর্শন রচনায় জন্য সুভাষচন্দ্র প্রাচীন ইতিহাস থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ভারতবর্ষের অতীত আর্থিক কাঠামোগুলির মধ্যে এক বিশেষ ভারসাম্য রক্ষিত হ'ত। সমাজ-তান্ত্রিক ধারণাও অবিদিত ছিল না। পাবনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণে

(২৭শে মাঘ ১৩৩৫) সুভাষচন্দ্র বলেন, অনেকের ধারণা socialism বা Republicanism বুঝি বা পাশ্চত্য সামগ্রী কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। socialism বা Republicanism প্রাচীন ভারতের অবিদিত ছিল না। ক্ষুদ্রক, মালব, লিচ্ছবি প্রমুখ রিপাবলিকগুলি দীর্ঘদিন সফলভাবে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রেখেছে। ভারতবর্ষে এরূপ ৮২টি অতীত রিপাবলিকের পরিচয় মেলে। এই রিপাবলিকগুলি ছিল ধনসম্পদে শক্তিশালী এবং কোন কোন রিপাবলিক ১৩০০বৎসর পর্যন্ত সজীবতার স্বাক্ষর রেখেছে। সাম্যতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ছিল তাদের ব্যাপক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীক ব্যবস্থার আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান। রিপাবলিকগুলির রাষ্ট্রকোষ কখনও শূন্য থাকত না এবং তারা আর্থিক পবিচালন ব্যবস্থায় দক্ষতাব পরিচয় দিয়েছে (দ্রষ্টব্য Hindu Polity P.170—K. P. Jayaswal) চাণক্য লক্ষ্য করেছেন এই রিপাবলিকগুলি শক্তিশালী কৃষি ও শিল্প সংগঠন গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালেব রাজতন্ত্রেও ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গ্রামীণ আর্থিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ করা যাযনি। কৌটিল্য বলেছেন রাজার কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা নাই, প্রজার ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা (প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞপ্রজানাঞ্চ হিতে হিতম—অর্থশাস্ত্র Book I)। জৈমিনীর মীমাংসা পরিষ্কারভাবে বলেছেন বাষ্ট্রের ভূসম্পত্তিতে বাজার কোন অধিকার নাই, রাজ্য-বিজয় দ্বারাও তা অর্জিত হয় না। ভূসম্পত্তি সকলের জন্য—তার থেকে শ্রমের মাধ্যমে সকলে ফসল অর্জন কববে (Hindu Polity P.—344)। রাজার ক্ষমতার উপবে এই সমস্ত নীতির অনিবার্য প্রভাব ছিল। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ভারতবাসীকে পঞ্চায়েতেব কথা স্মরণ করিয়ে দেবাব প্রয়োজন হয় না—এই প্রতিষ্ঠান অতীত যুগ থেকে চলে আসছে। শুধু গণতান্ত্রিকতাই নয় উন্নত ধরণের অন্যান্য সামাজিক রাষ্ট্রিক মতও অতীত ভারতের অজানা ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সাম্যতন্ত্র পশ্চিমী প্রতিষ্ঠান নয়। আসামেব খাসী অধিবাসীদের এখনও নীতিগতভাবে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন নাই। সমগ্র গোষ্ঠী সমবেতভাবে সমস্ত জমির অধিকারী। আমি নিশ্চিত যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এরূপ নিদর্শন মিলবে এবং অতীতে আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল' (মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সভায় ভাষণ ৩.৫.২৮)। মুসলিম প্রশাসনের যুগেও গ্রামীণ কাঠামো অনেকটা অপরিবর্তিত ছিল। ব্রিটিশ আগমনের পরে ভারতের অতীত গ্রামীণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। (Indian Struggle P—10)।

ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া তাই অপরিহার্য ছিল। ভারতের অতীত আর্থিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদর্শন রয়েছে এবং ভারতের জনগণ যেগুলি সম্পর্কে স্বভাবতঃই পরিচিত, সুভাষচন্দ্র ভারতের সেই অতীত ঐতিহ্যের বৈভবে নূতনের সংযোজনে আধুনিক ভারতের সামাজিক রাষ্ট্রিক আর্থিক কাঠামো রূপায়ণের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, '...কৃষ্টিগত আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোন থেকে জাতীয়তাকে কখনো কখনো সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর এবং আক্রমণাত্মক বলে নিন্দা করা হয়। ...আমার উত্তর হ'ল—ভারতের জাতীয়তা সঙ্কীর্ণ নয়, স্বার্থপর বা আক্রমণাত্মকও নয়। মানবজাতীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ সত্যম শিবম সুন্দরমের ভাবে অনুপ্রাণিত।' ভারতের মহান জাতীয় ঐতিহ্যের উপর সাম্যতান্ত্রিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই সুভাষচন্দ্রের আর্থিক নীতির লক্ষ্য। এই নীতি অবশ্যই একদলীয় শাসনাধীন কম্যুনিষ্ট সমষ্টিতান্ত্রিক (totalitarian) অর্থনীতি থেকে স্বতন্ত্র।

কম্যুনিষ্ট অর্থনীতির চিন্তা তার দর্শনের মতই একপেশে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মতে "আধুনিক যুগের বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলনের মধ্যে যা কিছু ভালো ও প্রয়োজনীয় পাওয়া যাবে, সে সবের সমন্বয় সাধন করাই ভারতবর্ষের কাজ। কোন পূর্বকল্পিত বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্বহেতু কোন আন্দোলনকে অবহেলা করলে আহাম্মুকী হবে।' (Indian struggle P 39)। ভারতের অতীত ঐতিহ্যের উপর নূতন নূতন পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ অংশের সমন্বয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রগতিমূলক সাম্য-সমন্বয়ী মতবাদ গড়ে তুলেছেন এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে রংপুর ভাষণে (৩০.৩.২৯) তিনি বলেন, '...এই সমাজতন্ত্র কার্লমার্কসের পুঁথিতে জন্ম নেয়নি এবং এর উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষেরই যুগাগত চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মধ্য থেকে।' কম্যুনিজমের জাতীয়তা ধর্মনীতি ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ভিন্নমত সুবিদিত। টোকিয়ো ভাষণে তিনি বলেছেন, 'কম্যুনিজম যেখানে দুর্বল—তা হচ্ছে কম্যুনিজম জাতীয় প্রবণতার কোন মূল্য দেয় না। আমরা ভারতবর্ষে চাই একটি প্রগতিশীল পদ্ধতি যা সমগ্র জনতার সামাজিক প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়—আজকের জার্মানীতে ন্যাশনাল সোস্যালিজম যে জিনিষটি অর্জন করতে পারেনি।' উক্ত ভাষণে তিনি মন্তব্য করেন, 'ন্যাশন্যাল সোস্যালিজম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সাধনে এবং জনগণের অবস্থার উন্নতিসাধনে সক্ষম

হয়েছে কিন্তু তা ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়নি।

কম্যুনিজমের পরিকল্পিত অর্থনীতি সুভাষচন্দ্রের বিশেষ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা ও পদ্ধতি রয়েছে যা পরে আলোচিত হবে। অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট মতবাদ জোরালো নয়, 'যেমন মুদ্রাবিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে এর কোনও নূতন অবদান নাই। এ সম্পর্কে এই মতবাদ চিরাচরিত অর্থনীতিই অনুসরণ করে চলেছে। যাই হোক সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মুদ্রা-বিষয়ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান এখনও নিকটবর্তী নয়' (Indian struggle—P315)। সময়ের বিচারে স্বীকার করতে হবে মার্কস একজন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এবং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বগুলির মত তাঁর আর্থিক তত্ত্বসমূহের সীমাবদ্ধতা রয়েছে On the Economic Theory of Socialism by Lange & Taylor—P. 13)। বর্তমান বিশ্বে বিপুল পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রগতি তার পথ কেটে চলেছে অনেক পুরাতন চিন্তাবিদদের তাত্ত্বিক সীমারেখা অতিক্রম ক'রে। মুদ্রাতত্ত্বের বিষয়ে গেসেলের ফ্রি-মানিতত্ত্ব সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে পিগু ও মার্শাল কাজে আসিবে না। ইউরোপ ও ইংলণ্ডে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরাতন মতবাদ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতেছে এবং পুরাতন মতবাদের স্থলে নূতন মতবাদ আসন গ্রহন করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় সিলভিও গেসেলের উদ্ভাবিত 'ফ্রি-মানি' মতবাদ জার্মানীর ছোট একটি জনপদে প্রবর্তন করা হইয়াছিল এবং তা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণিত হইয়াছে।' (Indian Struggle—P. 376-77)। মুদ্রাতত্ত্ব আর্থিক সংগঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার। সেজন্য সুভাষচন্দ্র একটি সফল মুদ্রাতত্ত্বের অন্বেষণ করেছেন। গেসেলের মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কীনসের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। কীনস বলেছেন, 'বলা যেতে পারে মার্কসের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সমাজবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই এই পুস্তকের লক্ষ্য। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ বংশধরেরা মার্কস অপেক্ষা গেসেলের চিন্তা থেকেই বেশী শিক্ষালাভ করবে।...ষ্ট্যাম্পযুক্ত মুদ্রার বিষয়ে গেসেলের চিন্তার বলিষ্ঠতা স্বীকার্য।' (দ্রঃ General Theory of Employment Interest & Money—keynes P. 355-358)।

কম্যুনিজমে শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে নেতাজী টোকিয়ো ভাষণের

মধ্যে বলেছেন, 'আর একটি বিষয়ে সোভিয়েৎ রাশিয়া অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং তা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ ব'লে কৃষকদের সমস্যা শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা অপেক্ষা অধিক গুরুতর' সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর ভাবে সচেতন ছিলেন তবুও কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কৃষক সমস্যাকে তিনি অধিকতর গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন।

সুভাষচন্দ্র শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কেও কমুনিজমের থেকে স্বতন্ত্রমত পোষণ করেন। টোকিয়ো বক্তৃতায় নেতাজী বলেছেন, শ্রেণী সংগ্রাম এমন একটি জিনিষ ভারতে যার কোন প্রয়োজন নাই। যদি স্বাধীন ভারতের সরকার জনতার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে তাহলে শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজন নাই। আমরা রাষ্ট্রকে জনতার সেবকরূপে সংগঠিত করে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারি।'

পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োগে সুভাষচন্দ্রের ধ্যানধারণা স্বতন্ত্র।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'স্বভাবতঃই আমরা অন্যান্য দেশের পরিক্ষানিরীক্ষাগুলি বিবেচনা ক'রে দেখব কিন্তু কার্যতঃ ভারতীয় পন্থায় এবং ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেজন্য আমরা গ্রহণ করবো ভারতবাসীর প্রয়োজনের উপযোগী এক ভারতীয় পদ্ধতি।... যদি সমাজবাদী আদর্শের ভিত্তিতে আর্থিক সংস্কার করতে হয় তবে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলবে না। সেজন্য চাই একটি কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক পদ্ধতির রাষ্ট্র—যে রাষ্ট্র জনগণের সেবকরূপে কাজ করবে।' সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্র হবে সেবাধর্মী অর্থাৎ তা পীড়ণমুক্ত হবে। কর্তৃত্ব মূলক রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ কয়েক বৎসরের জন্যই মাত্র থাকবে (দ্রঃ Indian Struggle P. 312)। তাঁর লক্ষ্য হ'ল জনগণের হাতে সব ক্ষমতা অর্পণ। ভারতবর্ষে তাঁর চিন্তার রূপায়ণের জন্য যে দল গড়ে উঠবে তার কার্যনীতির খসড়ার মধ্যে তিনি বলেন, ইহা দেশের কৃষি ও শিল্প জীবনের পুনর্গঠনে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে।' (I S. P. 812-13)। লক্ষ্য হবে আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্রগঠন, দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবণের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বৃহৎ আকারে উৎপাদন। উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ক্ষেত্রে সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং সকলের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার পরই সুভাষচন্দ্র প্লানিং কমিশন গঠনে তৎপর হ'ন যাতে-স্বাধীনতা উত্তর যুগে কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব না ঘটে।

সুভাষচন্দ্রই ভারতে প্লানিং এর সর্বপ্রথম সাংগঠনিক প্রবক্তা, একথা সকলের বিদিত। তিনি বলেছেন, 'যদি দাসত্ব দূর করা যায় তা হ'লে কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা আর থাকবে না এবং অর্থনৈতিক অবস্থার এত পরিবর্তন ঘটবে যে চেনাই যাবে না...।' (সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্লানিং—শঙ্করীপ্রসাদ বসু—পৃঃ ১১৩-১৪)। ১৯৩৮ এর ২রা অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের এক সভায় তাঁর ভাষণে বলেন, '...আমাদের জাতীয় জীবনে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা ব্যাপক, সেজন্য জাতির প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের কৃষক সমাজের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার উন্নতি সাধন অবশ্য কর্তব্য। জীবন যাত্রার মান বাড়িযে তুলতে হবে। তবে শুধুমাত্র কৃষির দ্বারাই তা সম্ভব হবে না।

লক্ষ্য পূরণের জন্য শিল্পোৎপাদন বিপুল ভাবে বাডাতে হবে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড অংশকে শিল্পে নিযুক্ত করতে হবে।......

প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ আমেরিকার সমপর্যায়ের...এখন প্রয়োজন দেশের স্বার্থে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে তার ব্যবহার।...পরিকল্পিত শিল্পায়নের পূর্বসর্ত হ'ল—পরিকল্পিত বিদ্যুতায়ন। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই কুটির শিল্প ও ভারীশিল্পের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।...কুটির শিল্প সংগঠনে আমি দৃঢবিশ্বাসী।...শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন ভারী মাঝারি ও কুটির শিল্প। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য ভারী শিল্পের প্রয়োজন বেশী।

এই সভায় তিনি জাতীয় পরিকল্পনার নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন মূল শিল্প প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির বিষয়ে নীতি গ্রহণ করতে হবে...শিল্পগুলি হ'ল--শক্তি উৎপাদন, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও আবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শিল্প এবং যানবাহণ যোগাযোগ সংক্রান্ত শিল্প ইত্যাদি।

শিল্প কুশলতার জন্য জাপানী ছাত্রদের মত আমাদের ছাত্রদিগকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ পাঠাতে হবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে যাতে তারা ফিরে এসেই সরাসরি নূতন শিল্প সংগঠনের কাজে নিয়োজিত হ'তে পারে।' তারপর তিনি গবেষণা সংস্থা ও পরিকল্পনার জন্য

পরিসংখ্যান সংগ্রহ সংস্থা গঠণের বিষয় বিবেচনার কথা বলেন। আঞ্চলিক শিল্প সংগঠন, প্রতিটি প্রদেশের সঠিক আর্থিক সমীক্ষণ এবং কুটির ও বৃহৎশিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ তারিখে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া প্ল্যানিং কমিটির প্রথম সভায় উদ্বোধনী ভাষণে কুটির শিল্প বিষয়ে গান্ধী- পন্থীদের বিদ্বেষমূলক প্রচারের জবাব দিয়ে বলেন, 'কুটিরশিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত সংঘাত নাই। আমি কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্প ও বৃহৎশিল্প এবং প্রতিটি শিল্পের সংহত অবস্থিতির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়নের আবেদন রাখি।' এরপর তিনি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেমন জাপান, জার্মানীতে কুটির শিল্পের উন্নত অবস্থানের উল্লেখ করেন এং পন্য বাজার জাত করার সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন। জাপানের বিদ্যুতায়ন ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই ভাবে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে একটি সংহত শিল্প সংগঠন গড়ে তোলার নীতি সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের সামনে সুস্পষ্ট রূপরেখা রেখেছেন।

কৃষি সমস্যার ব্যাপারে ১১. ৬. ২৬এর এক চিঠিতে তিনি বলেন কৃষি সমস্যার সমাধান Co-operationএর দ্বারা হ'তে পারে অন্য পথ নাই। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও নূতন ভূমিনীতি প্রবর্তনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সবল ও স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য জাতির ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যম জাগ্রত ক'রে প্রকৃত পঞ্চায়েতী সংগঠণের মাধ্যমে কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলেন।

সুভাষচন্দ্র শিল্পশ্রমিকের নিজস্ব ভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান এবং বলেন আমষ্টারডাম বা মস্কোর আজ্ঞাবহ হয়ে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না।

এইভাবে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্ল্যানিং কমিশন সংগঠণের মধ্যে এবং আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থনীতি সংগঠণের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ ও কর্মে আমাদের সমক্ষে একটি পূর্ণ আর্থিক সংগঠণের রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের নানা ভাষণ ও আজাদ হিন্দ সরকার ও তার আর্থিক সংগঠনের সব তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। এগুলি প্রকাশিত হ'লে তাঁর চিন্তাবৈভবের পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যেত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক পরীক্ষাগুলি বিচার ক'রে দেখতে হবে। অনুকরণের দ্বারা— সভ্যতার বিকাশ ঘটে না। নূতন বৈপ্লবিক চিন্তা সাধনার দ্বারা জনগণের হাতে সব ক্ষমতার রূপায়নে সাম্য-সমন্বয়ের পথ রচিত হয়। সুভাষদর্শন আমাদের সে পথের দিকেই আহ্বান জানিয়েছে।

॥ কালজয়ী সুভাষচন্দ্র ॥

—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেতাজি একটি বিচ্ছিন্ন পুরুষ নন। তাঁব ক্রিয়াকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নেতাজী ভারতীয় ঐতিহ্যেরই সার্থক অবদান। বাঙলার ভূমিতে শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে যে রেনেসাঁর সূত্রপাত—যাকে একদা বামমোহন, বামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, গিবিশচন্দ্র, অববিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, অবণীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ কালজয়ী প্রতিভাধব মানববৃন্দ এবং যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, সূর্য্য সেন ও শৌর্যবান শহিদগোষ্ঠী প্রচণ্ড প্রবাহে প্রবাহিত রেখেছিলেন—তারই মহান সৃষ্টি এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্রের মর্ম-গুরু রূপে পাই স্বামী বিবেকানন্দকে, সক্রিয় বিপ্লব গুরু রূপে পাই বিপ্লব-স্রষ্টা অরবিন্দকে, কর্ম ও শিক্ষাগুরু রূপে পাই যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য বেণীমাধবকে।

একদিক থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর 'নেতাজি' হয়ে ওঠার মূলে মহাত্মা গান্ধীর অবদান সামান্য নয়। সে অবদান প্রবল পাহাড়ী স্রোতকে দুরন্ত 'ঝর্ণা' হয়ে ওঠার সাধনায় কঠিন উপলখণ্ডের নির্মম অথচ সার্থক বাধা দানের মত। বাধা, ও আঘাত না এলে সুভাষচন্দ্রের বুঝি 'নেতাজি' হয়ে ওঠা সম্ভব হত না।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেশবাসীব সমক্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয় ১৯২৮ সালে, কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে। সুভাষচন্দ্রের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী' কংগ্রেসী 'হিন্দুস্থান সেবাদলে'র ছাঁদে গড়া হয়নি। সামরিক পোষাকে দৃপ্ত, সামরিক কুচকাওয়াজে দক্ষ, বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের সহযোগিতা ও নিষ্ঠায় প্রাণবন্ত এই বিরাট 'পুরুষ ও নারী বাহিনী' যখন জাতীয় যৌবনকে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে দিচ্ছিল, জাতির আগামী দিনের রণসজ্জার স্বপ্ন তার রক্তে সঞ্চারিত করছিল —তখন কংগ্রেসের ভাগ্যবিধাতা গান্ধীজি সেই বাহিনী পরিদর্শন করে ব্যঙ্গচ্ছলে তার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: ও যেন 'ফিলিপস্ সার্কাস!' যেন

'চিলড্রেনস প্যান্টোমাইম!'...মহাত্মা গান্ধী সুচতুর লোক। তিনি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বা তার 'জি. ও. সি'কে সার্কাস পার্টি বা ছেলেখেলার খেলুড়ে নেতা মনে করলে অমন কঠোর উপহাস করতেন না। আদপে তিনি সুভাষের চোখে এবং তাঁর বাহিনী গড়ার টেক্‌নিকে সেদিন সর্বনাশের ছায়া দেখেছিলেন। এ সর্বনাশের আগুনে তাঁর অহিংসার প্রাসাদ ভস্মীভূত হবার লক্ষণ তাঁর কাছে হয়ত ধরা পড়েছিল। অথচ তাঁর চিত্ত অহিংসার মোহে আচ্ছন্ন থাকায় তিনি সুদূরের অঞ্জন চোখে পরে ঐ 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' এর মধ্যে ভাবী দিনের 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' বা 'ঝান্সীর রাণী বাহিনী'র অঙ্কুরও দেখতে পাননি, 'জি. ও. সি.' সুভাষচন্দ্রের পদক্ষেপে বিশ্ববিশ্রুত সুপ্রীম কমাণ্ডা'র 'নেতাজি'র পদধ্বনিও শুনতে পাননি।...

তৎপর উক্ত কংগ্রেস-অধিবেশনেরই সাধারণ সভায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্পষ্ট ভাষায় আনীত হল 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর অপূর্ব ভাষণ আজও আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু গান্ধীজির প্রভাবে প্রস্তাবটির হার হল। অবশ্য প্রস্তাবক হার মানলেন না।...

আপাত দৃষ্টিতে জয়ী হলেও গান্ধীজি বুঝলেন যে, 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' এ যে রোধ করার বস্তু নয়, তাই অচিরে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রস্তাব কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন আরো এগিয়ে গেছেন। তাঁর দাবী—কংগ্রেসকে সঙ্গে সঙ্গে 'পাশাপাশি জাতীয় সরকার' (Parallel Govt) স্থাপন করার প্রস্তাবও নিতে হবে।...এমনি করে দুর্জ্জয় যৌবন শান্ত প্রবীনের শাসন বারে বারে নাশন করতে চেয়েছিল। তবু বলব, নবীন সুভাষ এবং প্রবীন গান্ধীর মানসিক ও ব্যবহারিক দ্বন্দ্বে জাতির কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি—বরঞ্চ সেইকালে উহা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে আশাতীত গতিবেগে এগিয়ে দিচ্ছিল। কারণ, উভয়ে পরস্পরের প্রতি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধাশীল, অথচ আপন কর্তব্যে অবিচল ও নিষ্ঠায় অনন্যসুন্দর। তাই ইতিহাস বলছে যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে দুইটি প্রখর ও অব্যাহত ধারা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতিনিধি তরুণ সুভাষের ও অহিংস যুদ্ধের নায়ক প্রবীন গান্ধীর নেতৃত্বে একই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বিধৌত করেছিল। সেই ধারাস্নানে দুর্ধর্ষ সর্বভারতীয় কংগ্রেস তাই তৎকালে জাতির সংগ্রামতীর্থে পরিণত হয়ে দেশবাসীকে নিয়ে চলেছিল 'আদর্শ' রূপায়নের পথে, দৃঢ়তর পদক্ষেপে।...

১৯৩৯ সালের 'ত্রিপুরী কংগ্রেসে'র ইতিহাস এবং গান্ধীজি চালিত কংগ্রেস

হাই-কম্যাণ্ডের অপকীর্তি সর্বজন-বিদিত। তার বিশদ বর্ণনার স্থান এখানে নয়। আমরা এখানে শুধু উল্লেখ করব তৎকালীন ঐসব ঘটনাকে ঘিরে একটি মানুষের রি-য়্যাকশনের কথা। তিনি সামান্য কোন মানুষ নন। তিনি পৃথিবী-বরেণ্য রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সংস্থা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গান্ধীজির অনুমোদনে 'হাই-কমাণ্ড' ডিসিপ্লিনারি য়্যাকশান নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই জঘন্য অবিমৃষ্যকারিতা সহ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত মহাত্মাকে তার করলেন তিনি ১৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর : "Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity."

দুদিন পরে কংগ্রেস কর্মবীর গান্ধীজি উত্তরে জানিয়ে দিলেন : "Your wire was considered by working committee. With knowledge they have they are unable lift ban. My personal opinion is you should advise Subhas babu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well."

উভয়ের মধ্যে আরো পত্রাদির আদান-প্রদান হয়েছিল এ প্রসঙ্গে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অনড়-ঔদ্ধত্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের (মহাত্মারও গুরুদেব) পরপর অনুরোধকে উপেক্ষা করতে দ্বিধাগ্রস্থ হননি।

এখানেই গান্ধীজি ক্ষান্ত হলেন না। দীনবন্ধু এনড্রুজ সাহেবের পত্রোত্তরে তিনি লিখেছিলেন : "I feel Subhas is behaving like a spoilt child of the family".

সে পত্রের তারিখ ছিল ১৯৪০ সালের ১৫ই জানুয়ারি।

মহাত্মার রাজনীতিক এসব কার্যের মূলে যে আতঙ্ক ও 'কমপ্লেক্স' ছিল তার আলোচনা এখানে অবান্তর। কারণ সুভাষ বিরোধিতা তাঁর ব্যক্তিগত ও দলগত রাজনীতিক প্রাধান্য রক্ষায় প্রয়োজন ছিল বলেই 'পলিটিশিয়ান্' রূপে তিনি ওসব কাজ করতে পারেন। তাতে বলার কিছু নেই। তবে এখানে এইটুকু বললে অবান্তর হবে না যে—কালজয়ী দ্রষ্টার দৃষ্টি থেকে ঋষি কবি কিন্তু আগামী দিনের সুভাষকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে 'দেশনেতার' আসনে বরণ করে গেলেন কবি, অথচ আদর্শগত সংকীর্ণ-স্বার্থের চাপে দৃষ্টিক্ষুণ্ণ হয়ে গান্ধীজি বুঝতে

পারলেন না, বা বুঝতে চাইলেন না সেই 'সুভাষ'কে।···রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে বললেন : "সুভাষচন্দ্র, বাঙালী কবি আমি, বাঙলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।" তিনি আরো বললেন : "বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণী দূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাঙলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।"···

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেখে যাননি তাঁর আশীর্ব্বাদপুষ্ট 'বাঙলার অধিনেতা' সুভাষচন্দ্র কি ক্ষিপ্রতম গতিতে সারা ভারতবর্ষের শুধু নয়—সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে 'নেতাজি'র আসনে বৃত হয়েছেন। তিনি না দেখলেও দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে যে ঋষিকবির বাণী সার্থক হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ধারাবাহিক জাতীয় সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়কের আসন লাভ করেছেন। এই পুরুষ বিশ্বখ্যাত শুধু নন—বিশ্বজনস্বীকৃত শ্রদ্ধেয়, রাজনীতিক, শ্রদ্ধেয় সংগঠক ও জাতিস্রষ্টা। তাই তাঁর সম্বন্ধে বরেণ্য পণ্ডিত মিঃ ই. এফ. ওটেন এর উক্তি উদ্ধৃত করব। তাঁর 'Sorg of Aton and other verses' নামক কাব্যগ্রন্থে আমরা পাই :

SUBHAS CHANDRA BOSE

Oblit—1945

"Did I once suffer, Subhas, at your hand ?
Your patriot heart is stilled ! I would forget !
Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty, Icarus-like your courage planned
To meet the skies, and storm in battle set
The ramparts of high Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.
High Heaven yielded, but in dignity
Like Icarus, you sped towards the sea
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire that brightly glowed
In India's mighty heart and flamed and flowed
Forth from her Army's thousand victories won !"

'কালি ও কলম' নামক পত্রিকার বৈশাখ—সংখ্যায় (১৩৭৬) ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার লিখিত 'ওটেন ও সুভাষচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কবিতাটি সংযুক্ত হয়েছে। লেখক তাঁর আচার্য ডক্টর প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কবিতার পুস্তকখানা সংগ্রহ করেছেন। শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয় কৃত ওটেন সাহেবের কবিতার চমৎকার গদ্যানুবাদটি হল :

"সুভাষ! তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম? তোমার সেই স্বদেশভক্ত হৃদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! একথা যে ভুলিতে পারিলেই ভালো হইত। আজ মনে পড়ে যে, তোমার দেশে তুমি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলে তাহা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সহিত 'আইক্যারাসে'র (গ্রীক পুরাণের জনৈক বীর) মত আকাশে উঠিয়া অমরাপুরীর দুর্গপ্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দুর্জয় সাহসময় সংকল্প করিয়াছিলে? তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক এবং রূঢ় রক্তাক্ত দাবী করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট মিশান্ পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি (High Heaven) তোমাদের দাবী মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছিল; কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে আইক্যারাসের মত সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল। তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলিয়া গেল। ঐ তাপ হইতেছে ভারত মাতার বিশাল হৃদয়ে যে স্বদেশভক্তির আগুন প্রোজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে ঐ দীপ্তি ভাস্বর রূপে প্রবাহিত হইয়াছিল।" ('কালি ও কলম'—পৃ: ১০০৫-১০০৬)।

এই ওটেন সাহেবই হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক, যার সঙ্গে উক্ত কলেজের ১৯১৬ সালের এক ঐতিহাসিক লগ্নে, প্রকাশ্যে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং ভারতবর্ষের বিধাতা ব্রিটিশের আত্মজ এক সম্মানিত অধ্যাপকের অঙ্গে হাত তোলা তখনকার দিনে অকল্পনীয়। এই একটি দুর্ঘটনায় দুর্ধর্ষ ইংরেজ স্তম্ভিত হয়েছিল—আজও ছোট-বড় অনেক ইংরেজই সেই 'সুভাষ'কে ক্ষমা করতে পারে নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র হাত তুলেছিলেন তাঁর অধ্যাপকের উপর ব্যক্তিগত কোন কারণে নয়। জাতির সম্মান রক্ষা করার ন্যায্য প্রত্যয়ে। প্রকাশ্যে ওটেন সাহেবও অবশ্য তাঁর জাতির তরফ থেকেই আপত্তিকর এক মন্তব্য করেছিলেন। মোটের উপর ব্যক্তিগত উষ্মা বা স্বার্থের কোন স্থান এ-সংঘর্ষে ছিল না। এটা ছিল কমবেশি

একটি 'ন্যাশানাল ফাইট'। তাই বোধ হয় একটি স্বজাতি বৎসল বীর অপর একটি স্বজাতি বৎসল শৌর্যবান যুবককে প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধা করে এসেছেন, নিজে 'Sufferer' হয়েও। তাই তিনি প্রায় তিরিশ বছর পর (১৯৪৫ সালে) 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি'র সর্বাধিনায়ক, তাঁর প্রাক্তন বিদ্রোহী ছাত্র, সুভাষ চন্দ্র বসুর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হতেই এ কবিতাটি লিখে ফেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনার পর থেকে ওটেন সাহেব সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ সাগ্রহে ও সশ্রদ্ধায় অনুধাবন করে সবিস্ময়ে তাঁকে দেখলেন ইম্ফল রণাঙ্গনে বিপ্লবী মহানায়কের বেশে; ব্রিটিশ সমর শক্তির বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করতে। ইংরেজ অধ্যাপক ছাত্র সুভাষকে তন্মুহূর্তে হয়ত আপন মনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছিলেন: 'তরুণ বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়'। বিশ্বজয়ীর গৌরবে যে অধ্যাপক তাঁর দুরন্ত ছাত্রকে গ্রহণ করতে পেরেছেন তার প্রমাণ ঐ ছোট্ট কবিতা। বীর না হলে বীরত্বের সমাদর করা যায় না। মহানুভব না হলে কালজয়ী মহত্বের স্বরূপ চোখে ধরা পড়ে না।

প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়-এর 'ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব' হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত সংকলিত।

॥ নেতাজীর রণ-চেতনা ও সামরিক নেতৃত্ব ॥

—ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইপের বিমান-দুর্ঘটনা এবং তার ফলে নেতাজীর মৃত্যু যাঁরা প্রচার-সর্বস্ব বলে মনে করেন এবং আদৌ বিশ্বাস করেন না ডঃ সিংহ তাঁদের অন্যতম। নেতাজী যে দাইরেনে (রুশ-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ার বন্দর) রুশীয়দের (স্ট্যালিন-শাসিত) হাতে বন্দী হয়ে সাইবেরিয়ার ইয়াকুটস্ক বন্দীশালায় নিঃসঙ্গ এবং নিশ্চিত অবলুপ্তির অপেক্ষায় কাল যাপন করছেন, ডঃ সিংহ ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের দ্বারা এই তথ্য সংগ্রহ করে সরকারী স্তরে নেতাজীকে মুক্ত করে আনার জন্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তাইপের অকুস্থল থেকে ঘটনা ও তথ্যের সূত্র ধরে মস্কো যাওয়ার পথে নেতাজীর অসামান্য শক্তির সম্বন্ধে যে সব তথ্য তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এই নিবন্ধটি তারই একটি অংশবিশেষ। এই অংশটি তাঁর লিখিত "নেতাজী রহস্য" হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত সংকলিত।]

আমাদের যুগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত কোন ভারতীয় নেতা সুনিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণ করেন নি। ব্রিটিশ শাসনের শেষ বছরগুলিতে শাসকরা স্বাধীনতালাভে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় গণচেতনাকে প্রায় কণ্ঠরোধ করে এনেছিল। ভারতীয় গণমানস আত্মবিকাশের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে।[১]

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির শীর্ষসময়ে রুখে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র। সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যের বুকে শেল হানলেন।

সূর্যালোকের প্রথম ঝলকে উদ্ভাসিত য়ুয়ানশান শীর্ষ। (৩৬৭৩ ফুট উচ্চ) পর্বতমালার পাদদেশে কিলুং নদীর দক্ষিণ তীরে ফরমোজার রাজধানী তাইপের বিমান বন্দর যেখানে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার কথা উল্লিখিত। একটি সি—

(১) "Freedom struggle surveyed"—স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারী ১৯৪৩ বার্লিনে প্রদত্ত ভাষণ [Selected speeches of Subhas chandra Bose, Publication Division, page 164]

সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্রে

৪৭ শ্রেণীর বিমানে আরোহণ করলাম প্রত্যক্ষ করতে—কি পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে শেষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

আমাদের বিমান চালক ছিলেন কর্নেল ইয়ে। তাঁর পাশের আসনটিতে আমাকে বসালেন। কিনমেন দ্বীপপুঞ্জের দিকে বিমানের গতিপথ স্থির করে আমরা কথাবার্তা সুরু করলাম।

"জাপানীদের হাত থেকে বিমান ঘাঁটি নেবার সময় আমি প্রথম বৈমানিক দলে ছিলাম।"।

"কিনমেন দ্বীপ তখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে ?"

"না, এমন বিশেষ কিছু নয়। একাজ নেবার আগে নয়াদিল্লীতে আমি মিলিটারী এ্যাটাসে ছিলাম। ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার সময় আপনারা যেমন দুর্ভোগে পড়েছিলেন জাপানীদের কিনমেন ছাড়ার সময় আমাদেরও ঠিক তাই হয়েছিল।"

"আপনারা পদাধিকারবলে এশীয় জনজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দিকটি সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল"

"নয়াদিল্লীতে থাকার সময় আমি দেখেছি যে, আপনারা জাতীয় জীবনে সামরিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব দেন না। ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হতে পারে—এমন চিন্তার ছোঁয়া-ঘেঁষাকে আপনাদের নেতারা প্রকাশ্যে ঘৃণা করেছেন।"

"সত্যিই তাই"।

"আমার বেশ মনে পড়ে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করার জন্য অস্ত্র ধারণের কথা যদি কেউ বলে থাকেন, তিনি হলেন আপনাদের একমাত্র নেতা সুভাষচন্দ্র বসু[২]। আর তার জন্যে তাঁকে কী মূল্যই না দিতে হয়েছে।"

"এ সম্পর্কে তাঁর কার্যকলাপ আপনার কিছু জানা আছে ?"

"নিশ্চয়ই আমি জানি। আমাদের চুংকিং সরকারকে (মিত্রপক্ষের দোসর) তাঁর সম্বন্ধে খবর দেওয়া আমার কাজ ছিল। জাপানের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে সামরিক গতিবিধি ও বিজয়ের

(২) "It is my firm conviction that Mother India can only be freed by resisting the British tyranny with armed might and that the Indians can not liberate India without shedding their blood. Freedom gained without shedding blood, will not be real freedom." ["Need for Direct Action'.—Address to Imperial consultative Political council, Tokyo, June 23, 1943 : Selected speeches of Subhas Bose, Publication Divisioo. page 182]

পরিকল্পনায় আমরা যোগাযোগ রেখে চলছিলাম। সুভাষ বসু ছিলেন আমাদের প্রধান অন্তরায়। তাঁর শক্তি ছিল আমাদের দশ পনের ডিভিশন সৈন্য বাহিনীর সমতুল। তিনি আমাদের শত্রু ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করেছি। কারণ তিনিই দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়দের মধ্যে অন্যতম অবিসম্বাদী সমর-নায়ক"।

"তাঁর চরিত্রের কোন দিকটি আপনাকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল?"

"যুদ্ধ চেতনায় তাঁর মহান অবদান[৩]।"

"সে আবার কি?"

"সমর-বিজ্ঞানে যাকে বলে 'সামগ্রিক রণচেতনা'র অনুকূলে গণমানসকে জাগ্রত করা। আত্মসমর্পণের চিন্তা কোনদিনই সুভাষ বসুর মনে জাগে নি। তাঁর আদর্শে যুদ্ধ হল 'জাতীয় যুদ্ধ—শেষ বিজয়ে'[৪]। সে যত দীর্ঘ হোক বা তার জন্য যত মূল্য দিতে হোক না কেন—শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া..."

"বসুর যুদ্ধ চেতনার বৈশিষ্ট্য কি?"

"তাঁর লক্ষ্য হল জাতীয় বিজয়। তাঁর আদর্শে জাতীয় বিজয়ের জন্য সমগ্র জাতি—জাতির রণনীতি এবং কূটনৈতিক কৌশল সব কিছুর সমন্বয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি হবে। গণচেতনার একমাত্র লক্ষ্য হবে যুদ্ধ জয়। এমন একটি যুদ্ধে সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সত্তা এককে রূপান্তরিত হবে। যুদ্ধ শেষ হবে শেষ বিজয়ে—যখন ভারত, চীন, জাপান এবং পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।"

"অতি উত্তম"।

'আত্মসমর্পণও নেই, নেই পরাজয়'। এই আদর্শেই বসুর সঙ্গে সংঘাত লাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী সমরনায়কদের।[৫]

(৩) কর্ণেল ইয়ে পরে এই প্রসঙ্গে চীনা কমিউনিষ্টদের কবল হইতে কিনমেন ও চীন মূলভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের অবলম্বিত রণকৌশল সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের সমরনীতির (সামগ্রিক রণচেতনা) অনুসরণের কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

(৪) "On Assuming Direct Command of I. N. A."—Order of the Day, August 25, 1943—selected speeches of Subhas chandra Bose, Publication Division, page 206; এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য "Japan has no design" ২৩ এপ্রিল, ১৯৪২ জার্মানীর আজাদ হিন্দ বেতার থেকে প্রচারিত ভাষণ।

(৫) জাপান সরকারের প্রতিষ্ঠিত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'হিকারী কিকানী'র সদম্ভ অস্তিত্বের কাছে যেমন নতি স্বীকার করেন নি, তেমনি বিক্ষুব্ধ জাপ-সামরিক দলের নেতা জেনারেল তারাওচীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাতেও দ্বিধা করেন নি।—দ্রষ্টব্য: "সুভাষচন্দ্র"—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯০-১৯৬।

*　　　*　　　*

সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন নেতাজী উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের উপর ব্রিটিশ ব্যূহদ্বার হল সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এবং কলকাতা। জাপানীদের হাতে সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুনের পতন হল। স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী পরিচালনা করে কলকাতায় প্রবেশ করার পরিকল্পনা রচনা করলেন নেতাজী।

রবার্ট ক্লাইভের যুগ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভিত্তির ওপর এত প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়নি।……এশিয়ার আকাশে স্বাধীনতার আলোকসম্পাত করেছেন নেতাজী।

[হিটলারের নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তির পরেও জার্মানীর পটভূমিকায় মুক্ত বাহিনী গঠনের কাজে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর] এশিয়ার রণাঙ্গনে অপ্রত্যাশিত অনুকূল পরিবেশের সুযোগ গ্রহণের জন্য নেতাজী কিয়েল থেকে একটা জার্মান সাবমেরিনে রওনা হলেন ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী। আটলান্টিকে দীর্ঘ পাড়ি দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে মাদাগাস্কারের ৫০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তিনি পৌঁছলেন। সেখান থেকে একটা জাপানী সাবমেরিনে (১-২৯) তিনি আরোহণ করলেন ভারত মহাসাগর পাড়ি দেবার জন্য ২৮শে এপ্রিল। সুমাত্রার উত্তরখণ্ড সাবাং-য়ে তিনি অবতরণ করলেন। এবং সেখান থেকে টোকিও পৌঁছলেন ১৯৪৩ সালের ১৩ই জুন, দীর্ঘ আঠারো সপ্তাহব্যাপী যাত্রার পর। মুহূর্তের জন্য কালক্ষেপ না করে নেতাজী সামরিক তৎপরতায় নিযুক্ত হলেন। ছ'সপ্তাহের মধ্যেই তিনি প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন।

নেতাজী এত দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন যে, নিজে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর গ্রহণ করে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। সাধারণ অভিবাদন এবং যুদ্ধধ্বনি জয় হিন্দ সহ ত্রিবর্ণরঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা জাতীয় পতাকা নির্দিষ্ট হল। (প্রত্যেক আজাদী সৈনিকের পোষাকের ওপর লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট করলেন একটি ব্যাজ— ব্যাজে চিত্রিত ভারতবর্ষের মানচিত্র, তার তলায় তিনটি শব্দ,…ইত্তিফাক্‌, ইত্‌মাদ্‌ আর কুরবালি ··একতা বিশ্বাস আর আত্মোৎসর্গ)।

অস্থায়ী ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষশক্তি এবং তাদের সমর্থক সরকার সমূহের স্বীকৃতি লাভ করে। অস্থায়ী সরকারের পতাকাতলে দূরপ্রাচ্যের ভারতীয়দের সকল সম্পদ—ধন জন নিয়োজিত হল যুদ্ধপ্রস্তুতির

জন্য। জাপানীদের নিকট থেকে নেতাজী একমাত্র জাপ অধিকৃত ভারতীয় এলাকা—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যার্পণ দাবি করেন। তাঁর এই দাবি জাপানীরা পূরণ করে। জাপানীদের নিকট থেকে তিনি আরও প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, ভবিষ্যতে যেসব ভারতীয় অঞ্চল জাপানীদের দখলে আসবে সেগুলির শাসন কর্তৃত্ব ন্যস্ত হবে তাঁর সরকারের হাতে।[৬] অস্থায়ী সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃতির প্রতীক হিসাবে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নূতন নামকরণ হল শহীদ এবং স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ—১৯৪৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর।

দুটি মৌল ঐতিহাসিক কর্তব্যের আহ্বান নেতাজী এবং তাঁর মুক্তিফৌজের ওপর বর্তে। যথা—মাতৃভূমির মূল ভূখণ্ডের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য সাধনের পর মুক্তিফৌজকে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে রূপান্তর করা।

টোকিও-তে তিনি ঘোষণা করেন—"ভারতের পক্ষে অন্য কোন পন্থা নেই…ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষবিরোধী সংগ্রাম ছাড়া। যদিও অপর কোন জাতির পক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গে আপোসরফা সম্ভব হয়, ভারতের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবাস্তর। বৃটেনের সঙ্গে আপোসরফা অর্থ ক্রীতদাসত্ব। এবং আমরা সংকল্পবদ্ধ যে, দাসত্বের সঙ্গে আর কোন মীমাংসা নেই।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দূরপ্রাচ্যের অপরাপর সামরিক তৎপরতার সমষ্টিগত বিশ্লেষণমূলক বিচারে প্রত্যয় হবে যে বৃটেনের সঙ্গে নেতাজীর যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাস্তব তাৎপর্যময় এবং তার ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারী। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ভারতের ভাগ্যচক্রের গতি পরিবর্তিত করে অন্ধকারময় ক্রীতদাসত্বের

(৬) "এখানকার একটি 'আজাদ হিন্দ দল' জাপানীদের জানায, যেহেতু 'মোরে' থেকে ভারতবর্ষ শুরু হয়েছে সেই হেতু এখান থেকেই আমাদের রাজ্য শুরু হচ্ছে। এখানকার যা কিছু জিনিসপত্র আছে সবই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের। আর সেইজন্য সেই দল সবকিছু সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু জাপানীরা বলে যে, ইম্ফলের এখনও পতন হয়নি, ইম্ফলের পর থেকেই তোমাদের কাজ শুরু হবে, তার আগে নয়; এই নিয়ে দুপক্ষেই কিছুদিন একটা গোলযোগ চলে। পরে জাপানীদের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার মীমাংসা করে দেন। তাঁরা বলেন, যেহেতু, 'মোরে' থেকে ভারতবর্ষ শুরু সেই হেতু এখান থেকেই 'আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট' তাদের কাজ শুরু করবার অধিকারী। যে জাপানীরা এতে বাধা দিয়েছে তারা অন্যায় করেছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো বার বার বলেছেন—"An inch of land occupied either by Nippon or by I N. A. on India, will be controlled by the provisional Grovernment of Free India." (দ্রঃ "আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে" —ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেজর, আই. এন. এ.——পৃঃ ৩৪)

জীবন থেকে রবিকরোজ্জ্বল স্বাধীনতায়। এবং সারা এশিয়ার পট পরিবর্তন হল।

ভারতের যুদ্ধধ্বনি নেতাজীরই অবদান। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ প্রভুত্বকালে ভারতের কোন যুদ্ধধ্বনি ছিল না। রণাঙ্গণে মাতৃভূমির জন্য সর্বাত্মক ত্যাগের আদর্শে দেশবাসীকে তিনিই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেন।[৭] ভারতীয় সৈনিকের জীবনও এই মহান লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়।

প্রমাণ হল যে ব্রিটিশদের ওপর থেকে ভারতীয় দাসসুলভ প্রভুভক্তির অবলুপ্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রত্যক্ষ আঘাত পেয়েছে। তাঁর এই সাফল্য অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এটাই নেতাজীর সর্বোত্তম অবদান। ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সিঙ্গাপুরের এক জনসভায় নেতাজী ভাষণ দিচ্ছিলেন। ষাট হাজার মানুষের জনতার নিকট নেতাজী-সেদিন বলেছিলেন—"আমার মত বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বলে ভারতীয় কোন জাতীয়তাবাদী নেতা দাবি করতে পারেন না।"[৮] তাঁর এই দাবির ষোল আনাই যুক্তিসম্মত।

কুচকাওয়াজ পরিদর্শনেব সময় তিনি আজাদ বাহিনীকে আদেশ দিয়েছিলেন—"আমাকে অনুসরণ করুণ···আমি আপনাদের বিজয় গৌবব ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাব।"

তাঁর প্রতিভাময় নেতৃত্ব দিয়ে নেতাজী সামবিক ও অসামরিক সকল শ্রেণীর কর্মচারীর হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর পতাকাতলে পূর্ব এশিয়ার কুড়ি লাখ ভারতীয় অধিবাসী সমবেত হয়। "সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি" প্রয়োজন—এই ধ্বনি দিতে তিনি তাদের আহ্বান করেন। তিন হাজার সৈন্য ও তিন কোটি সিঙ্গাপুর ডলার (ভারতীয় টাকায় প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি) সংগ্রহের লক্ষ্য ধার্য করেছিলেন নেতাজী। কিন্তু নির্দিষ্ট ধ্রুবতারা হল—"আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ। আমাদের শত্রু পরাক্রমশীল, সুযোগ-সন্ধানী এবং দুর্ধর্ষ। ক্ষুধাব যাতনা, তৃষ্ণা, অনশন—সব তুচ্ছ করে শত্রুর মোকাবিলায় আপনাদের শ্রান্তিহীনভাবে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যু

(৭) "I may also assert without the slightest oxaggeration that there is no nationalist leader in India who can claim to possess the many-sided experience that I have been able to acquiro." ["why I left India"—Speeches at mass meeting Singapur, 9 July 1943]

(৮) Why I Left India" [from selected speeches of Subhas Chandra Bose, Puolication Division, page. 198]

বরণ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে স্বাধীনতা আপনাদের দ্বারপ্রান্তে আসবে।[৯]

মালয়ে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়কে নেতাজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—"দেশ যুদ্ধে লিপ্ত। এই সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, আপনাদের ধনসম্পদ আপনাদের পরিতৃপ্তির জন্য তাহলে আমি বলব একটা আপনাদেয় ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। আপনাদের জীবন, আপনাদের সম্পদ, এখন আপনাদের নয়। সব কিছুই ভারতের এবং একমাত্র ভারতের সেবার প্রয়োজনে। আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত-ভাবে যদি অগ্রসর না হন তাহলে অবশ্যই মনে রাখবেন আমরা দাসত্ব-বন্ধনে চিরকাল আবদ্ধ থাকবো না··· দেশের কাজে যারা আমাদের সাহায্য করতে না রাজ, তারা আমাদের শত্রু।"[১০]

* * *

রণাঙ্গণে সাফল্যময় নেতৃত্বের দুটি প্রধান সামরিক অঙ্গ হল—সত্ত্ব-প্রস্তুতি এবং অতর্কিত আক্রমণের ক্ষমতা। ইম্ফল অভিযানের সময় নেতাজী এই দুটি সামরিক কৌশল অবলম্বন করতে কখনও ভোলেন নি।[১১]

ইম্ফল রণাঙ্গণে অতর্কিতে শত্রু-শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নেতাজী কৌশলপূর্ণ সৈন্য-বিন্যাসের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। রণক্ষেত্রে আজাদহিন্দ ফৌজ যখন মুহূর্তময় পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন তাঁর রেডিও কেন্দ্র থেকে তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রিটিশ ইস্তাহার বলে এক ধারা-বিবরণী প্রচার হল—"আজাদ হিন্দ বাহিনী কালাদান অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। পলেতাওয়া, তিদ্দিম এবং তোংজাং এখন তাদের দখলে। পালাম এবং ফেটি হোয়াইটও শত্রু কবলিত। আমাদের সপ্তদশ পদাতিক বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করছে।"[১২]

(৯) For the present, I can offer you nothing except hunger, thirst, privation, forced marches and death. But if you follow me in life and in death, as I am confident you will, I shall lead you to the victory and freedom." ["To Delhi To Delhi"—speech at military review of the Indian National Army, July 5, 1943: Selected speeches of Subhas chandra Bose, Publicatiou Division, P. 193]

(১০) "A Word To The Rich" ২৬ অক্টোবর ১৯৪৩ মালয়ের বণিক সভায় প্রদত্ত ভাষণ—(পৃঃ ২২৩)—এখানে সুভাষচন্দ্র ন্যূনপক্ষে ১০ কোটি টাকা আদায়ের সীমা ধার্য করেছিলেন।

(১১) ইম্ফল রণাঙ্গনকে অনেক ঐতিহাসিক বিখ্যাত ওয়াটারলু-র যুদ্ধের সঙ্গে তুলনার দাবি রেখেছেন।

(১২) সৈনিক মনোবলকে উর্ধমুখী রাখার জন্যে যেহেতু সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন "A true soldier needs both military and spiritual training" সেহেতু তিনি অবসর যাপনের কালে সৈনিকদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করাতেন এবং নিজে সেখানে উপস্থিত থাকতেন। [দ্রঃ "সুভাষচন্দ্র"—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২০৩]

অচিরেই যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য সুভাষ ইম্ফল প্রান্তে ব্রিটিশদের আক্রমণ করলেন। (১৯৪৩ সালের ২৬ আগস্ট তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহশালার বা প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।) ব্রিটিশদের সঙ্গে আপসরক্ষার নীতি অনুসরণ করেছেন অন্য নেতারা। তাই সুভাষের মত সমর পরিচালনায় নেতৃত্বের সুযোগ তাঁদের আসেনি।...

ইম্ফলের যুদ্ধে নেতাজীর সাফল্য লাভ না হলেও বৃটেনের সম্মুখে বাস্তবচিত্র ফুটে উঠল। ব্রিটিশরা উপলব্ধি করল যে ক্ষুণ্ণ আনুগত্য-সম্পন্ন ভারতীয় সৈনিকদের দিয়ে ব্রিটিশ স্বার্থে আর ভারতকে পদানত রাখা চলবে না। ভারতীয় বাহিনীর সর্বশেষ ব্রিটিশ সৈনাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন "...প্রগতিশীল অফিসাররা সাধারণতঃ জাতীয়তাবাদী। তাঁরা চাইলেন ভারত স্বাধীন হোক। হোয়াইট হল থেকে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা হবে, এটা তাঁদের পছন্দ হোল না।"

হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীর অভিযানে এইসব জাতীয়তাবাদী অফিসারগণ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বিশেষ শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেসব ব্রিটিশ অফিসারেরা তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, দেশ বিভাগের পরে তাঁরা অনেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করেন। ফলে তাঁদের অধীনস্থ বাহিনীকে পরিচালনায় স্বয়ম্ভর হতে হয়েছে। দেশরক্ষার জন্য তাঁরা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার মান এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নেতাজীর নেতৃত্বের মৌলনীতি অনুসরণ করেছেন। সর্বাগ্রে বিবেচ্য ছিল দেশের স্বার্থ। তাই সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা এবং প্রতি আক্রমণের দিকে তাঁরা বিশেষ নজর রেখেছেন। ব্রিটিশদের অভিযোগ ছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় বাহিনীর শৃঙ্খলাজ্ঞান একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু হল সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রমাণ হয়েছে যে, বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মোকাবিলায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী স্বয়ম্ভর।...... সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এই নবপ্রেরণা উন্মেষের জন্য অবশ্য ধন্যবাদ প্রাপ্য হল নেতাজীর।

* * *

দূরদর্শী আত্মত্যাগী পুরুষ তিনি। রণাঙ্গনে সঙ্গীন পরিস্থিতির মধ্যে তিনি তাঁর লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে অনন্যসাধারণ একাগ্রতা এবং প্রীতির পরশ দিয়ে সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা করেছেন। তাঁর অনুগামীরাও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উচ্চ মনোবল সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বাহিনীতে রূপায়নের উদ্দেশ্যে আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের কর্তব্য নেতাজীর আদর্শ অনুসরণ করা।...লক্ষ্য সাধনের জন্য রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের প্রেরণা দিয়ে নেতাজীর মত আদেশ দিতে হবে—আমাকে অনুসরণ করুন।

* * *

নেতাজীই ছিলেন একমাত্র জাতীয় নেতা যিনি গান্ধীবাদী অহিংসায় আস্থা না রেখে সামরিক বলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানির পর ভারতীয় পৌরুষের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। সুভাষের আগে আর কেউ ভারত থেকে ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে ভারতীয় ফৌজী বাহিনী সংগঠনে এগিয়ে-আসেন নি। স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন দেশরূপে বেঁচে থাকতে হলে যে জাতীয় মর্যাদার পুনরুদ্ধার আবশ্যক, সুভাষ তা সম্পন্ন করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় বীরে পরিণত হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সামরিক নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যরা পলাশীর যুদ্ধের বদলা নিয়েছে। বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাঁর বীরত্ব ও সামরিক নেতৃত্ব ভারতের সামরিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।

* [মূল রচনাটির সঙ্গে বন্ধনী ও পাদটিকাগুলি সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত। নেতাজীর বিস্ময়কর রণ-নৈপুণ্য ও সামরিক জ্ঞান প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মেজর জেনারেল শাহনাওয়াজ লিখিত "আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী" গ্রন্থটি পাঠ করিতে পারেন।]

॥ নেতাজী ও নীতিবোধ ॥

—প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র রাজনীতি থেকে নীতিকে বিসর্জন দেন নি। যে নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন, যে আদর্শে তার আস্থা ছিল, নির্ভয় চিত্তে তা অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি সারাজীবন হাসি মুখে দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা বরণ করে নিয়েছিলেন। নেতাজী ছিলেন আদর্শের জন্যে আপোষহীন সংগ্রামের পুরোধা। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ, তুচ্ছ লিপ্সা কখনই তাঁকে কর্তব্যের কঠিন পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এই কঠোর জীবনব্রতের মূলে ছিল গভীর নীতিবোধ ও আদর্শনিষ্ঠা।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর চরিত্রের এই দিকটি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছিল। অল্পবয়সে তাঁর চরিত্রে আধ্যাত্মিক প্রভাব গভীর রেখাপাত করে। স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ আদেশে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। ঐ সময়ে তাঁর মাতৃদেবীর কাছে একটি পত্রে তিনি লিখছেন, 'আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ-ভাবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল।' (১৷৭) ঐ পত্রে আবার তিনি লিখছেন, 'আমরা বৃথা "ধন" "ধন" বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবি না প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধিরাজরাও দীন ভিখারী।' আর একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে—আর কার কিরূপ উন্নত চরিত্র তাহা কার্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই পড়া বিদ্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র-জ্ঞান-কার্য। (১৷২৭) এই চিঠিগুলি তাঁর মায়ের কাছে লেখা ১৯১২-১৩ সালে যখন সুভাষ-চন্দ্রের বয়স মাত্র ১৫/১৬ বৎসর। আবার ১৯২৯ এ লাহোরে ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণেও এই বিশ্বাসের পুনরুক্তি করলেন সুভাষচন্দ্র। Book-Worms, gold-medalists and office clerks are not what university should endeavour to produce but men of character who will

become great by achieving greatness for their country in different shape of life.

"The Students Movements to day is not a movement of irresponsible boys and girls. It is a movement of responsible, thorough going men and women who are inspired with one ideal —viz, to develop their character and personality and thereby render the most effective and useful service to the cause of their country" (২।৯২).

অল্পবয়সে সুভাষচন্দ্র আর্তত্রাণ ও সমাজসেবার কাজে লেগে পড়লেন। কিন্তু তাতে মন ভরল না। সতের বছর বয়সে বাড়ী থেকে তিনি গোপনে পালিয়ে গেলেন, উদ্দেশ্য সন্ন্যাস অবলম্বন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব এখানেও দেখা যায়। "আমি বলিলাম বিবেকানন্দের ideal হচ্ছে আমার ideal.' পিতৃদেবের কাছে এই ছিল তরুণ সুভাষের জবাব। (১।৪১) আবার মান্দালয় জেল থেকে ১৯২৬এ এক পত্রে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে "পত্রাবলী" ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়।' (১।২১৯) আবার ১৯২৯-এ রংপুরে রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন, 'It was Swami Vivekananda who gave a new turn to the history of Bengal as he repeatedly said that man making was his mission in life,

'In the work of man-making, Swami Vivekananda did not confine his attention to any particular sect but embraced the society as a whole. His fiery words let a new India emerge through the workshop and from the huts and bazars—are still ringing in every Bengalee home.

'This socialism did not desire its birth from the books of Karl Marx. It has its origin in the thought and culture of India. (২।২৩৪-৫).

তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী না হতে পারলেও আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষচন্দ্র ঐ নীতির প্রশ্নে লোভনীয় চাকুরিত্যাগ করে বলিষ্ঠ আদর্শ দেখালেন। এই সময় তাঁর মনের অবস্থা তিনি প্রকাশ করেছেন। মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা একটি পত্রে, 'তাহা ছাড়া এখানে আসল প্রশ্ন নীতির।

নীতি অনুসারেই আমি এই শাসন-যন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারি না। গোঁড়ামিতে, স্বার্থানুশক্তিতে, হৃদয়হীনতায়, সরকারী মারপ্যাঁচের জটিলতায় এই শাসন-যন্ত্র বিকল, ইহার প্রয়োজনের দিন বিগত।' (১।৯৮) অপর একটি পত্রে লিখছেন তিনি 'আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চচিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল।... দারিদ্র ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করিয়া বাবা ও মার নিকট পত্র দিয়াছি।' (১।১০০) তিনি স্বীকার করেছেন 'অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ।' দেশবন্ধুর মহান ত্যাগব্রতও সুভাষচন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। (১।১০০) অন্যত্র তিনি লিখছেন, সুতরাং এই ত্যাগ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার কোনও পথ দেখিতেছি না। এই ত্যাগের অর্থ আমি ভালরূপ জানি। দারিদ্র্য, দুঃখ ক্লেশ, কঠিন পরিশ্রম ত আছেই, আরও নানা ভোগ আছে যাহার কথা স্পষ্টভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই...।' (১।১১৩) আবার সুভাষচন্দ্র লিখছেন, 'আমি বুঝিয়াছি যা আপোষহীন বস্তু—ইহাতে মানুষের অধঃপতন এবং আদর্শের হানি হয়।— সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাই।' যৌবনের তোরণে দাঁড়িয়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র এই নির্ভীক ঘোষণা করলেন। (১।১১৬)

দেশবন্ধুর নেতৃত্ব স্বীকার করে সুভাষচন্দ্র রাজনীতির মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গীকৃত করলেন। শাসকশ্রেণীর আঘাত নেমে এল তাঁর উপর। কারাবরণ, লাঞ্ছনা তাঁর সঙ্গী, কিন্তু সংগ্রামে তিনি বিচলিত নন। মান্দালয় জেল থেকে একটি পত্রে লিখছেন, 'suffering ব্যতীত মানুষ, কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না —তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালোভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।' (১।১৯৩) অন্যত্র তিনি লিখলেন, 'কারাগারে আমার যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হইতেছে যে, জীবন সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত

ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল ও সংঘর্ষাত্মক।' (১।৩১১) 'আমি দোকাদনার নহি, দর কষাকষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি। আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যাস, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না যে, তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব। —আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে।' (১।৩১২) ১৯৪০-এ বাংলার লাটসাহেবের কাছে লেখা একটি পত্রে এই বিশ্বাসেরই পুনঃপ্রকাশ দেখতে পাই। তাতে সুভাষচন্দ্র লিখছেন, 'Hence it is evident that nobody can lose through suffering and sacrifice. If he does lose anything of the earth earthy, he will gain much more in turn by becoming the heir to a life immortal.

"This is the technique of the soul. The Individual must die, so that the nation may live. To-day I must die so that India may live and may win freedom and glory."

সুভাষচন্দ্রের নীতির লড়াই ত শুধু ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে হয়নি, হয়েছিল রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে যাদের পুরোধা ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। সেই কাহিনী এখানে সবিস্তারে বলবার অবকাশ নেই। এ-নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবু সুভাষচন্দ্রের ন্যায়নিষ্ঠার একটি নিদর্শন গান্ধীজীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে পাই, "Deshbandhu Das often used to tell us, "life is larger than politics." That lesson I have learnt from him. I shall not remain in the political field one single day if by doing so I shall fall from the standards of gentlemanliness..." (২।২৬৯)

এই নীতিনিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতির পদ ত্যাগ করতে সুভাষচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার লোভে তিনি কংগ্রেসকে দ্বিখণ্ডিত করতে গেলেন না, বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব হল বিদ্রোহী নেতা হিসাবে। তাঁর গোপন দেশত্যাগের গুপ্তকথা আজ প্রকাশ পেয়েছে। কি দারুণ সাহসিকতার সঙ্গে তিনি দেশত্যাগ করলেন, তা সকলের মনে চমক জাগায়। মুসোলিনী তাঁকে রোমে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা গ্রহণ করলেন না, বললেন, "What is the use of easier life at Rome if it can not help India's

Independence?"• (৩।১৯) কিন্তু নাৎসীদের ব্যবহারেও তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। তারা এমন সব শর্ত দিতে লাগল, যা সুভাষচন্দ্রের মর্যাদায় লাগল। নাৎসীদের তিনি বললেন—"For the sake of my country, I have risked my neck to come to Germany. For the same reason I am prepared to risk my neck to return to India if I can not achieve my purpose. The British C. I. D. in very efficient and just as I escaped inspite of it I shall escape your Gestapo also." (৩।১৯) শেষ পর্যন্ত স্বয়ং হিটলার সুভাষচন্দ্রের সমস্ত দাবী স্বীকার করে নিলেন।

এরপর সুদূর প্রাচ্যে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব হল নেতাজীরূপে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তিনি। কয়েক বছর আগে কম্যুনিষ্ট চীনে যাবার পথে ব্যাংককে গিয়েছিলাম। সেখানে তাই-ভারত সংস্কৃতি সদনের কর্মকর্তা প্রৌঢ় প্রবাসী ভারতীয় বণিক পণ্ডিত রঘুনাথ সিং-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ব্যাংককে নেতাজীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নেতাজীর কথা বলতে বলতে তিনি চোখের জল ফেললেন প্রগাঢ় ভক্তিতে। সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র সেনাবাস স্বয়ং পরিদর্শন করতেন সেনাবাহিনীর ভোজন কালে, সবার ভোজন শেষ হলে, তবে তিনি নিজে আহার করতেন, এই তথ্য শোনালেন প্রৌঢ় ভারতীয় সহকর্মী মহাশয়। সমগ্র বিশ্ব চমৎকৃত হল যখন নেতাজীর নেতৃত্বে ইম্ফল ও কোহিমায় আজাদ হিন্দ বাহিনী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করল। নেতাজী বেতারে ঘোষণা করলেন, "Azad Hind! To fight and win India's liberty, and then build up in India with full freedom to determine her own future with no interference! Free India will have a social order based on the eternal principle of Justice, Equality and Fraternity," (২।৩২২) এই উদাত্ত ঘোষণায় নেই কোনও হীনতা, নেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মবিক্রয়। আমেরিকার উদ্দেশ্য বেতার ভাষণে তিনি বললেন, "It is not Japan that we are helping by waging war on you and on our mortal enemy—England. We are helping ourselves...we are helping Asia." (৪।১২৯) কত বড় বুকের পাটা থাকলে তবে জাপানী রেডিও মারফৎ এত নির্ভীক উক্তি করা সম্ভব! মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, "Mahatma Gandhi has firmly planted our feet on the staight road to liberty. He and other leaders are

now rotting behind prison bars. The task that Mahatmaji began has therefore to be accomplished by his countrymen at home and abroad." (২।৩৩১)

কিন্তু ইতিহাসের লিখন অন্যরকম হল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর পরাজয়, কিছু সংখ্যক সহযোদ্ধাদের বিশ্বাসঘাতকতা আর দলত্যাগ, জাপানী সহযোগীদের বিমুখতা—বহু বিরুদ্ধ ঘটনা নেতাজীর সামনে। Huge Toye লিখছেন, '...there was no one with whom he could talk freely in moderating terms of friendship: he had for himself only the rosary, the tiny Gita he carried, the inner silence. The moment passed as such moments do, leaving him purged and calm." (৪।১৪২) এই জীবনীকার জানাচ্ছেন রণাঙ্গনে নেতাজী প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন (৪।১৪০-১), কিন্তু বাধা পেলেন। তাঁকে বর্মা ছাড়তে হল। তিনি বললেন, "I do not leave Burma of my own free will, I would have preferred to stay on here and share with you the sorrow of temporary defeat." স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর উক্তি, "Go down as heroes, go down upholding the highest code of honour and discipline." (৪ ১৪৬-৭)

যে নীতিবোধ দিয়ে নেতাজীর জীবন শুরু হয়েছিল সেই নীতিবোধ জীবনের সংকট মুহূর্তে তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। গীতার মহামন্ত্র তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছিল।

যিনি মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে পারেন, তিনিই ত মৃত্যুঞ্জয়।

সূচী:—১। সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী ১৯১২-১৯৩২ দ্বিতীয় সংস্করণ

২। Important speeches and writings of Subhas Bose; Edited by J. S. Bright, Lahore, 1946

৩। Netaji in Germany, N. G. Ganpulay

৪। The Springing Tiger, Huge Toye.

॥ নেতাজী ও ভারতের স্বাধীনতা ॥

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

এক

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একজন জন্ম মিষ্টিক, তিনি জীবনের এবং জগতের মাঝখানে একটি অখণ্ড সত্যকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এক আদি শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। ভারতের মানুষ যুগযুগান্ত ধরে মাতৃসাধনা করেছে, এই মাতৃআরাধনার মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কর্ম ও জীবন পর্যালোচনা করলে পাওয়া যাবে সেই রহস্যময় বস্তুর সন্ধান। দেশ ছাড়া আর কোনো কিছুই জীবনের প্রথম উন্মেষ থেকে রহস্যময় অন্তর্ধান পর্যন্ত সব কিছুই একটা তেজোময় দেশপ্রাণতা ছাড়া আর কিছু নয়। এক আশ্চর্য দেশপ্রাণতা, কোনো ভয়, কোনো লোভ তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক নেতামাত্র নন, অতি উচ্চস্তরের এক সুমহান আধ্যাত্মিক আদর্শবাদী মানুষ হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন হবে। ত্যাগের আদর্শ সন্ন্যাসীর হোমাগ্নির মত সর্বদাই তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত ছিল।

শিবাজী একদা এক ধর্মরাজ্য পাশে ছিন্ন খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে বেঁধে দেওয়ার প্রয়াস করেছিলেন—সে ধর্ম জাতীয়তার ধর্ম। সুভাষচন্দ্র শিবাজীর সেই স্বপ্নকে সফল করার চেষ্টা করেছিলেন। সহায় সম্বলহীন একজন মানুষ বিদেশের ভূমিতে কেবলমাত্র নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসামান্য মনোবল, আর আত্মিক শক্তির দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তাঁর কর্মশক্তির প্রমাণ আজাদ হিন্দ ফৌজ। তিনি কারো তাঁবেদার ছিলেন না—তার প্রমাণ মিলেছে লাল কেল্লার সেই ঐতিহাসিক বিচার সভায়! তিনি তাই আজ উপকথার নায়ক। আজাদ হিন্দ রণাঙ্গনের ইতিহাস মানবিকতার মহান্ স্পর্শে এক পবিত্র স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করে এনেছে।

সুভাষচন্দ্র বললেন—"করো সব নীচবর, আর বনো সব ফকীর—" সব বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য ফকীর হও। তাই তাঁর আহ্বানে ভারতীয়রা

সেদিন সব ত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। মহাবিপ্লবীর স্বপ্নকে সফল করতে সকলে হাসিমুখে আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত।

সমগ্র জাপান যেদিন পার্লহারবারের নায়ক এডমিরাল ডোগোর মৃত্যুর শোকে মুহ্যমান সেইদিন প্রত্যুষে সিঙ্গাপুর থেকে একটি সামরিক বিমানে তোকিওর হানেদা বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন নেতাজী। জাপানী সরকার ও ইমপিরিয়াল জেনারেল ষ্টাফ তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। পরদিন প্রভাতী সংবাদপত্রে নেতাজীর আগমন বার্তা এবং সেই সঙ্গে ভারত থেকে পলায়নের চাঞ্চল্যকর কাহিনীও পরিবেশিত হল। নেতাজীর আগমনে যে ভারতীয় অভিযান জোরদার হয়ে উঠবে এমন ইঙ্গিতও ছিল· জাপানের সংবাদপত্রে।

সুভাষচন্দ্র পক্ষকাল সেইখানে ছিলেন। আর সংবাদপত্রের হেডলাইন প্রতিদিনই তাঁর সম্পর্কে রচিত হত। বেতার বক্তৃতা, প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে আলোচনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিগেমাৎসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রেস-কন্‌ফারেন্স ইত্যাদির আর শেষ নেই। এর কিছুকাল পরে ১৯৪৩-এর ১৬ই জুন তারিখে জেনারেল তোজো ইমপিরিয়াল ডায়েট (রাজ্যসভা) জাপানের ভারতবর্ষীয় নীতি ঘোষণা করলেন। দর্শকের আসনে সেদিন ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তোজোর এই ভাষণ প্রসঙ্গে নেতাজী সেদিন বেতার বক্তৃতায় বললেন—

"An epoch making declaration on that will live in history for all time."

এই ঐতিহাসিক বেতারভাষণে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে অক্ষশক্তির মনোভংগীর কথাও ঘোষণা করলেন। তখন সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস যে অক্ষশক্তি যুদ্ধে বিজয়ী হবে। স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে সুভাষ বললেন —ইংরাজ আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি সুতরাং অন্য কোনো শক্তির পক্ষে আমাকে প্রলুব্ধ করা সম্ভব নয়। কেন তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন তাও তিনি জানালেন এক বেতার বক্তৃতায়—

"It was accordance with the will of my countrymen that I left home and home-land and whatever I have done since then, was also in accordance with their will"

সুভাষচন্দ্র জানালেন যে ভারতের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরা যদি সাহায্য না করেন তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা কম। সুভাষচন্দ্রের

এই দৃপ্ত ঘোষণা একটা প্রচণ্ড শিহরণ এনে দিল। তোকিও-র ইমপিরিয়াল হোটেলে হাজার হাজার টেলিগ্রাম এসে পৌঁছাতে লাগল। সে সব টেলিগ্রামে ছিল সাদর অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ সমর্থনের এবং সর্বপ্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি। সেদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল। সুভাষচন্দ্রকে সবাই ভারতের প্রাণপুরুষ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে গেলেন, সেখানে ভারতীয়গণ তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানালেন। সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবে এক অভিনব সাড়া জাগল সর্বত্র। ভারতের রাজনীতিতে তখন অচল অবস্থা চলছে। লর্ড লিনলিথগো চলে গেছেন, এসেছেন লর্ড ওয়াভেল ভাইসরয় হয়ে। কিন্তু এসব সত্বেও ভারতভূমিতে অচল রাজনৈতিক অবস্থা বেশ সচল হয়েছিল। নয়াদিল্লীস্থ ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র স্বাভাবিক কারণেই সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মৌন অবলম্বন করেছিল। তাই ভারতভূমিতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ জানতে পারল না।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধ সেই সময় এমন এক অবস্থায় পৌঁছেচে যে বিজয়লক্ষ্মী কার গলায় বরমাল্য অর্পণ করবেন তা অনুমান করা কঠিন। সুভাষচন্দ্র অমিতবিক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ ফৌজ। মুক্ত ভারতের নাম হ'ল—আজাদ হিন্দ। আর 'জয়-হিন্দ' কথাটির দ্বারা অভিবাদন জ্ঞাপন করার প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হল। সুভাষচন্দ্র হলেন 'নেতাজী'।

এর কিছু পরে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে হলে অল-ইষ্ট-এশিয়া-কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হল। সভাগৃহের ভিতরে অসংখ্য মানুষের ভীড়, বাইরেও কম নয়। সেদিনকার সভার সভাপতি ছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন—

"I have brought you this present Subhas Chandra Bose—who needs no introduction to you, to India or to the world. He symbolizes all that is best, noblest, the most daring and most dynamic to the youth of India."

রাসবিহারীর বক্তৃতার শেষ ধ্বনি ছিল—"ইনকিলাব জিন্দাবাদ'. কিন্তু আর একটি কথা সেই সঙ্গে যুক্ত হল, "দেশসেবক সুভাষ কি জয়।"

সুভাষচন্দ্র ভাষণ দিলেন। সুদীর্ঘ ভাষণ। ভারতের রাজনৈতিক সংকট, য়ুরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি, তারপর বললেন—

"Action in a war crisis, demands, above all, military discipline"

এই প্রথম ভাষণেই সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। এই সরকার স্বদেশে বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করবে এবং বিপ্লব সার্থক হলে—

"It will then make room for a permanent government to be set up inside India, in accordance with the will of the people."

এদিনের এই ঐতিহাসিক ভাষণের শেষেই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—

"In this final march to freedom, you will have to face hunger, thirst, privation, forced marches—and death,"

এর পরদিন সুভাষচন্দ্র তাঁর বে-সামরিক পোষাক ত্যাগ করলেন, পরলেন সামরিক পোষাক। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ডতর রূপ ধারণ করল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকবৃন্দের প্রতিও তাঁর প্রভাব অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ল। সকলে তাঁকে ভারতের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে বরণ করে নিলেন।

সুভাষচন্দ্রের ছিল অদম্য উৎসাহ এবং প্রচণ্ড প্রাণশক্তি। জাপানের ভূমিতে পৌঁছে তিনি একটি মুহূর্তও বৃথা অপচয় করলেন না। সাংগঠনিক কাজে সমস্ত মন দিয়ে লেগে গেলেন।

সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানালেন—"চলো দিল্লী" এবং সাউথ ইষ্ট এশিয়ার ভারতীয়গণের জন্য একটি স্লোগান রচনা করলেন—

"Let the slogan of all Indians in East Asia be ; total mobilization for a Total War,"

এই ঘোষণা ধ্বনিত হল সিঙ্গাপুরের এক বিশাল জনসভায়। পুরুষ বাহিনীর মত নারী-বাহিনীও গড়ে উঠল। অসংখ্য নরনারী আত্মদানের জন্য এগিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্র লেঃ কর্ণেল এ, সি চ্যাটার্জিকে সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত করলেন। কাজ সুরু হল।

সুভাষচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন হাসান। তিনিই সর্বপ্রথম প্রস্তাব করলেন সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' হিসাবে সম্বোধন করা হোক। অচিরেই এই অভিধা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সর্বত্র ধ্বনিত হল "নেতাজী জিন্দাবাদ"।

সুভাষচন্দ্র আবার বেতারভাষণে বললেন—

"The road to Delhi is the road to freedom" সুভাষচন্দ্রের ভাষণ এবং চতুর্দিকে ভ্রমণ এবং জনসংযোগের ফলে ভারতবাসী মাত্রেই মনেপ্রাণে গভীর প্রেরণা লাভ করলেন। সকলের মনে নতুন উদ্দীপনা। সুভাষচন্দ্র মালয় ও থাইল্যাণ্ডে জনসভা, সম্মেলন এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য প্রচার করতে লাগলেন। জাপানী বোমারু বিমানে তিনি থাইল্যাণ্ড এবং বর্মা সফর করলেন। ব্যাংকক, রেঙ্গুন, ম্যানিলা, সাইগন প্রভৃতি দেশে যেখানেই ভারতীয়রা ছিলেন তাঁরা সকলে সুভাষচন্দ্রের সভায় ও মিছিলে যোগ দিলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর অপূর্ব আত্মত্যাগ ও দেশপ্রাণতায় সকলকে মুগ্ধ করলেন। একদিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন—

"Before the end of the year (1943) we shall stand on Indian soil,"

এই কথায় জাপানীরা বিস্মিত হল। এই কথা সেনসর করে তারা বাদ দিতে চায়। নেতাজীর প্রচারবিভাগ একথা যখন তাঁকে জানালেন তখন তিনি বললেন—"আমি নিজেই আমার বেতার ভাষণে একথা বলব।"

জাপানীরা বললেন—"তা করতে পারেন। তবে সরকারি সংবাদ মারফত নয়। সেই রাতেই আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ নেতাজী বললেন—

"Before the end of this year, we shall stand on Indian soil".

সুভাষচন্দ্রের দুর্জয় সাহস। কারো ভ্রুকুটি, কোনোরকম প্রলোভন, উৎকোচ কিছুই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না।

সুভাষচন্দ্র জীবিত কি অন্য লোকে, সাইবেরিয়ায় কি হিমালয়ে—তা কেউ জানে না। কিন্তু তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি জীবিত সহস্রজনের মনের মন্দিরে। তাঁর দুর্জয় সাহস, অমিতবিক্রম এবং মহান্ আত্মত্যাগ তাঁকে এই অমরত্ব দান করেছে।

দেশ ও বিদেশে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে জল্পনার আর শেষ নেই। "Last years of British India" নামক গ্রন্থের লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডকে বলতে হয়েছে—

"India owes more to him (Netaji Bose) than to any other—even though he seemed to be a failure,"

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সুভাষচন্দ্রের আত্মোৎসর্গের ফলে। নিরপেক্ষ ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করবে।

[দুই]

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের তনয় একখানি মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন "জওহরলাল নেহরু, এ বায়োগ্রাফি"। এই গ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে একাদেমীর পুরস্কারও পেয়েছে, সুতরাং আশা করতে পারেন যে, গ্রন্থটি অন্তত সুলিখিত হবে, তথ্যের দিক থেকে যথাযথ হবে। বিকৃত ইতিহাস হয়ত পরিবেশিত হবে না। কার্যতঃ কিন্তু তা হয়নি। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, ইচ্ছা করেই বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, একজনকে অতি বৃহৎ করে আঁকার প্রয়াস করতে বসে আশ-পাশের অনেককেই খর্ব করা হয়েছে। বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত একখানি সুলিখিত পত্র লিখে কিছু জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই সুখরঞ্জনবাবুর বক্তব্য বিশেষ কাট-ছাঁট না করেই উদ্ধৃত করছি, কারণ তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত। তাঁর বিবেচনায় ডঃ সর্বপল্লী গোপালের "কয়েকটি মন্তব্য ও তথ্য সম্পর্কে কিছু বলা দরকার", তিনি তাই বলেছেন—"১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি প্রদেশে (৬-টিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা; ২টিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা) ভালোভাবে জয়লাভ করে। সর্বপল্লী গোপাল বলেছেন, নেহরু ওই সময় কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে বলেছিলেন। নেহরু তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিলেন ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধিতা করার কৃতীত্ব কি শুধুই নেহরুর প্রাপ্য? টেণ্ডুলকার সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খানের যে জীবনী লিখেছেন তাতে সীমান্ত গান্ধীর জবানীতে বলা হয়েছে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন।"

এরপর ডঃ সর্বপল্লী গোপাল তাঁর পুরস্কৃত জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—"সুভাষ একজন মানুষ, হেরে যাওয়ার জন্যই যাঁর জন্ম।"

সুখরঞ্জন বাবু এই উক্তির প্রতিবাদে মন্তব্য করেছেন—"ডঃ গোপাল যে দৃষ্টিকোণ থেকে (অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবনে সাফল্য) ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সমসাময়িক কালের ইতিহাসে গান্ধীজী ও সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খানের চেয়ে বড় হেরে যাওয়া মানুষ ভারতবর্ষে বিশেষ জন্মায়নি। সুভাষ ত এঁদের কাছে হেরে যাওয়ার পাল্লায় শিশু।"

এই উক্তির সমর্থনে সুখরঞ্জনবাবু দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন, ইতিহাসকারের কাছে ঐতিহাসিক সততাই প্রত্যাশিত—করুণা নয়।

সুখরঞ্জন বাবুর এই সংক্ষিপ্ত চিঠিখানি মূল্যবানবোধে তার প্রাসঙ্গিক সারাংশ মাত্র দিলাম, মূল চিঠিখানি আরো দীর্ঘ এবং দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ।

সুভাষচন্দ্রকে ইদানিং কিছুটা ক্ষুদ্র করে দেখানোর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দেখে মনে হয় এর পিছনে একটী সুপরিকল্পিত চক্রান্ত আছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, খোসলা কমিশনের কর্তা স্বয়ং খোসলা সাহেব নিজেই একটি সুভাষ প্রসঙ্গ "(লাষ্ট ডেজ অব নেতাজী)" রচনা করেছেন যা মানহানিকর উক্তিতে পরিপূর্ণ, সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করেছিলেন। আসামী খোসলা সাহেব ক্ষমা চেয়েছেন নিংশর্তভাবে (যুগান্তর ৪-৪-৭৮)।

কিছুকাল পূর্বে জনৈক অজ্ঞাতকুলশীল পাঞ্জাবী লেখক পাঞ্জাবী সম্পাদিত "ইলাসট্রেটেড উইকলী" পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করায় সামান্য বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি করেছেন জনৈক রবার্ট হার্ডি এনড্রুজ নামক ভাড়াটে মার্কিন লেখক। ইনি "সিকাগো ডেইলী নিউজের" "নিউ উইক ম্যাগাজিনের" প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তিনি দীর্ঘকাল ভারতে ভ্রমণ করেছেন, নেহরু পরিবারের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কারণ গ্রন্থকার পরিচয় প্রসঙ্গে "ফ্লাপে" লিখিত আছে—"He has frequently travelled and studied in India and has known Madame Pandit (vijaylakshmi) and her family for many years."

পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তাঁর একটি ফটোও এই গ্রন্থে শোভা পাচ্ছে। গ্রন্থটির নাম—"A Lamp for India, the story of Madame Pandit" (প্রায় চারশ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। লণ্ডন থেকে আর্থার বারকার লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, দাম বিয়াল্লিশ শিলিং)।

এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্র উল্লিখিত হয়েছেন। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। গ্রন্থটির ১১৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—

"*Violent young Bengali, Subhas Bose, frankly said,* "I, not Jwaharlal Nehru, should lead against the old men who have run the Congress too long already". ক্ষমতালোভী তরুণ

সুভাষ এমনই অসহিষ্ণু ছিলেন একথা ইতিহাস বলে না। তাঁর মুখে যে উক্তিও কোনদিন তিনি করেন নি তাই বসানো হয়েছে। এই কথাগুলি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব দানের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু গ্রন্থটির ১৬৭ পৃষ্ঠায় যে কথাগুলি লিখিত হয়েছে সুভাষচন্দ্রের অতি বড় শত্রুও সে সব কথা লিখতে লজ্জায় লাল হয়ে যেতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবং পরবর্তীকালের আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রকাশিত তথ্যাবলী থেকে সুভাষচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিরহিত মনের সে পরিচয় আজ পাওয়া যায় তা আজ সমগ্র বিশ্বের মানুষের জানা আছে। এনড্রুজ লিখছেন—

"Gandhi had chosen Jwaharlal over Subhas Bose. Now Bose more radical than ever, Jeered at apparant failure of Gandhi's doctrine of non-violence, roused Hindu fanatics by calling for action against Muslim aggression, and went everywhere recruiting support to make himself Jwaharlal's successor as Congress President. Nothing could have done more, to strengthen Jinnah's hand,"

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 'হিন্দু ফ্যানাটিকস'দের যোগাযোগ এবং মুসলমান এগ্রেসনের বিরুদ্ধে মাথা তোলা ইত্যাদি অবান্তর কথার কি উত্তর হতে পারে? এগ্রেশন কাকে বলে? কখন হল? সুভাষ বসু কখন হিন্দু ফ্যানাটিকসদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন? যাঁরা সমকালীন ইতিহাস জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই এই মন্তব্য পাঠ করে উপেক্ষার হাসি হাসবেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ভারত—প্রদীপ মাদাম পণ্ডিত, যাঁর জীবনী গ্রন্থ "A Lamp for India", তিনি তাঁদের এই 'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড'টিকে এইসব মিথ্যা তথ্য বিষয়ে কিছুটা ওয়াকিবহাল করতে পারতেন।

'Guardian' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী এবং বিখ্যাত সাংবাদিক জিওফ্রে মুর হাউস তাঁর "Calcutta" (Widenfield and Nicholson, London : Price Rs. 90/-) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মাত্র কয়েকটি কথায় সুভাষচন্দ্রের এক সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস বর্ণনা করেছেন যা তথ্য এবং ইতিহাসের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য—

"When not there (Prison) he was either enjoying

election as Mayor of Calcutta making an uneasy peace with Gandhi, or travelling Europe ; and there he was always warmly welcomed by a motely collection of politicians, from Ribbentrop to stafford cripps, from Hitler to clement Atlee, from Eamon de Velera to Edward Benes. At home he was crowned with the Presidency of Congress in 1938, arrived at its annual assembly on a carriage drawn by fifty one bullocks through fifty one gates of honour and almost at once began to find himself out manouvered for the altimate hallmark of Indian approval by the shrewd Gandhi, who preferred more biddable Nehru as his first lieutenant".

(পৃঃ ১৮৫)

নেহরু "more biddable" বা আজ্ঞাবহ বলেই গান্ধীজীর স্নেহধন্য হয়েছিলেন, formidable নেতাজীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে নয়। একথা যাঁরা প্রত্যক্ষ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত (এখনও তেমন মানুষ কিছু জীবিত আছেন) তাঁরাই জানেন।

এই সূত্রে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখের 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'তে দিল্লী সংস্করণ প্রকাশিত একটি সংবাদ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নু্য-ইয়র্কের সিটি ইউনিভারসিটির ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ লিওনার্ড গর্ডন নেহরু মেমোরিয়ালের মুজিয়ম এ্যাণ্ড লাইব্রেরী কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় "সুভাষচন্দ্র বসু এ্যাণ্ড দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" বিষয়ে যে ভাষণদান করেন উক্ত সংবাদপত্রে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই ভাষনে ডঃ গর্ডন বলেছেন—

"Netaji Subhas Chandra was not a fascist, though he did admire powerful governments working for public good, and he allied with the Germans and then the Japanese for what he believed were the best interests of India."

ডঃ গর্ডন "ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" বিষয়ে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত, তিনি তাঁর ভাষণে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর জীবনের তিনটি বিশিষ্ট পর্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ত্রিশের দশক এবং চল্লিশের দশকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এবং আই. এন. এ.। ডঃ গর্ডন এই সভায় বলেন—

"Netaji Subhas saw himself in the tradition of revolutionaries, who had sought first to prevent British rule, and then to end it"

ডঃ গর্ডন বলেছেন, নেতাজীর ফ্যাসী বিরোধী মনোভাবে নেহরুর মত "তীব্রতা" (Passion) ছিল না, কিন্তু যুদ্ধকালীন ব্রিটিশের দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, উৎপীড়িত জাতির পক্ষে ভালোমন্দ বিষয়ে বিচারশীল হওয়া চলে না। ডঃ গর্ডনের ভাষায়—

"International Politics of other nations, in his view, did not matter, what counted their willingess to make a common front against British Imperialism."

ডঃ গর্ডন এই আলোচনায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে সহযোগিতায় কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনের পরবর্তী পর্বের বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন এবং পরিশেষে বলেছেন—

"—After studying the life of Subhas Bose, it was also necessary to pay attention to the parallel career of Sarat Chandra Bose, who has hitherto been ignored by historians."

এই সভায় সভাপতি ছিলেন তখনকার কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ এবং সংবাদটি "সমাচার" কর্তৃক প্রদত্ত, তথাপি কলিকাতার কোন সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখিনি। ডঃ গডর্নের ভাষণের মধ্যে অনেক কঠোর সত্য আছে এবং এমন অনেক কথা আছে যা ডঃ সর্বপল্লী গোপাল প্রভৃতির মতো সুবোধ ঐতিহাসিকদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিতে পারে।

২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৭ তারিখে নেতাজী ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রাক্তন জাপানী রাষ্ট্রদূত (১৯৪২—৪৫) এবং নেতাজীর দোভাষী কাকিৎসুবো যে ভাষণ দান করেন তা হয়ত এই প্রবন্ধের পাঠকবর্গের অধিকাংশের নজরে পড়ে থাকতে পারে, সুতরাং সেই কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এই সভায় তখনকার রাজ্যপাল ডায়াস এবং তখনকার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় উপস্থিত ছিলেন ও ভাষণ দিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের কাছে দুটি প্রশ্নের সদুত্তর চেয়েছেন। প্রশ্ন দুটি নীচে দেওয়া হল—

(১) "সেদিন যদি নেতাজী বিদেশে পালিয়ে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন না করতেন তাহলে কি আমরা এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পেতাম ?"

(২) সফল আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নেতাজী ঘরে ফিরে এলে কি ভারত দুটুকরো হত ?" (আনন্দবাজার পত্রিকা—২৪.১.৭৭)

এই প্রশ্নের প্রথমটির জবাব পাওয়া যাবে মাইকেল এডওয়ার্ডস নামক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক রচিত "Last year of British India' নামক গ্রন্থের একটি মন্তব্যে, তিনি বলেছেন ভারতের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসু।

India owes more to him (Netaji Bose) than to any other man—even though he seemed to be a failure.

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব অতি সহজ। নেতাজী ছিলেন চিরদিন আপস-বিরোধী, তিনি কখনই আপস-প্রিয় আরাম কেদারায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিনা বাধায় গ্রহণ করতে পারতেন না ; এটা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ।

নেতাজী ভারতের জাতীয় জীবনে এক অপরাজেয় পুরুষ।

পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র
ও
বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান

—এস. এ. আয়ার

জার্মানীতে যুদ্ধের সময় মুক্ত ভারত বাহিনী গঠন করা এক জিনিস কিন্তু সুদূর ইউরোপ থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সেই বাহিনীকে পরিচালিত করে এনে ভারতের অভ্যন্তরস্থ বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হলেও, একেবারে এক পৃথক ব্যাপার।

সুভাষচন্দ্রের কাছে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাস, যখন বিশ্বযুদ্ধ পক্ষ বিস্তার করল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং জাপান ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনার ছক নিয়ে বসে পড়লেন পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছোবার—মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মা এবং পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য দেশের বিরাট সংখ্যক ভারতীয়দের মধ্য থেকে মুক্ত ভারত বাহিনী গঠন করে তোলার। যদি জাপান, বর্মা এবং আর সব যুদ্ধকালীন সরকারের কাছ থেকে সক্রিয় এবং উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে মুক্ত ভারত বাহিনীকে বর্মা সীমান্তে সমবেত করে অপর প্রান্তে ভারত সীমান্তে অবস্থিত ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমন ও পর্যুদস্ত করে বাংলা এবং আসামের মধ্যে প্রবেশ করানো সহজসাধ্য হবে। বাংলা এবং আসাম সীমান্তে ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ড সারা দেশ জুড়ে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে আনবে একবৈপ্লবিক জাগরণ।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধোন্মাদনা সুরু হওয়ায় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই, ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, যিনি জাপানে ত্রিশ বছর রাজনৈতিক নির্বাসনে কাল কাটাচ্ছিলেন পূর্ব-এশিয়ার সমস্ত ভারতবাসীর কাছে বেতার মারফত আবেদন জানালেন ব্রিটিশ শক্তির কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে সংগ্রামী ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লীগ গঠন করার জন্যে।

১৯৪২-এ সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলো জাপানীদের হাতে। মালয় এবং সিঙ্গাপুরের ঔপনিবেশিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত ইংরেজরা ভারত থেকে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছিল, তাদের পরিত্যাগ করে চলে যেতে

হল। আত্মসমর্পনের সর্তানুযায়ী তারা জাপানী সামরিক অধিকর্তার হাতে দিয়ে গেল ২০,০০০ ভারতীয় সৈনিক এবং অফিসার, যুদ্ধ বন্দী হিসেবে। জাপানীরা ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের জানিয়ে দিল, যে দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়েছে "জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং কেপ্টেন মোহন সিং-এর উপর, যার ওপর নির্ভর করবে তোমাদের জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন।" এই হোল ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর জন্ম-কাহিনী; যা পরবর্তিকালে পূর্ব এশিয়ার হাজার হাজার অসামরিক যুবককে চম্বুকের মত আকর্ষণ করেছিল এবং পরবর্তিকালে নেতাজীকে সাহায্য করেছিল তিনটি যোদ্ধ্ বাহিনী গঠন করতে যার মধ্যে সশস্ত্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০ এরও ওপর।

১৯৪২-এর জুনে রাসবিহারী বসু ব্যাঙ্ককে সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক বৃহৎ এবং ঐতিহাসিক সমাবেশে নেতাজী সুভাস বসুকে জার্মান থেকে পূর্ব এশিয়ায় এসে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের আমন্ত্রণ জানালেন।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে শত্রু অধ্যুষিত জলপথে জার্মান সাবমেরিনে, আফ্রিকা ঘুরে, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে, সুমাত্রা, পেনাঙ-এ নব্বুই দিনের বিপদ সংকুল অভিযাত্রা, তারপর সেখান থেকে উড়োজাহাজে জাপান এবং পরিশেষে সিঙ্গাপুর আগমন নিঃসন্দেহে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে জাপানে পৌঁছেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একটি মুহূর্ত নষ্ট না করে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার পূর্বপরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো এবং তাঁর উচ্চপদস্থ সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন—কতখানি সাহায্য তারা করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে। তাঁদের কাছ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধাস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি পাবার পরিপূর্ণ আশ্বাস এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি লাভ করার পর নেতাজী টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ভাষণ প্রচার করে তাঁর অজ্ঞাতবাসের পর্ব্ব ভাঙ্গলেন।

ভারতীয় মুক্তি ফৌজকে বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে খতম করে দেবার জন্যে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার জন্যে এই মহান এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধার আগমণের সংবাদে পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়রা উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল।

জাপান থেকে নেতাজী বোস উড়োজাহাজে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করেন

২রা জুলাই, ১৯৪৩। দুদিন পরে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের সমগ্র পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ রেখে রাসবিহারী বসু যুবক বোসের হাতে আন্দোলনের নেতৃত্ব সমর্পণ করলেন। এই সুবিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করে, প্রত্যুত্তরে নেতাজী আভাষ দিলেন অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার যার নেতৃত্বাধীনে মুক্তিফৌজ মার্চ করে যাবে মাতৃভূমির দিকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে।

পরদিন সিঙ্গাপুরের টাউন হলের বিপরীত দিকের বিস্তৃত ময়দানে মুক্তি-ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী খাঁকি পোসাক পরিধান করে ঘন শ্রেণীবদ্ধ ফৌজীবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন। এই প্রথম মুক্তিযোদ্ধার মুখে দিলেন যুদ্ধ-ধ্বনি "চলো দিল্লী" এবং সমবেত অসামরিক নাগরিকদের মুখে শ্লোগান দিলেন "সর্বাত্মক সৈন্য সমাবেশ।" তারপর সুরু হোল এক দেশ থেকে আর এক দেশে তাঁর ঝটিকা সফর—মালয়, থাইল্যাণ্ড, ফরাসী ইন্দো-চায়না—সেই সব দেশের ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সর্বস্ব এমন কি জীবন পর্যন্ত দান করার আহ্বান জানাতে। যেথানেই গেছেন, সাবা পেয়েছেন অভূতপর্ব। সংক্ষেপে, পূর্ব এশিয়াব ভারতীয়রা মুক্তি পাগল হয়ে উঠেছিল।

তারপব নেতাজী ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেনস্ লীগেব প্রধান কার্যালয ঢেলে সাজালেন—কর্মপরিষদের বিস্তৃতি ঘটালেন। লীগের প্রধান কার্যালয়ে তখন যেসব বিভাগ বহাল ছিল—সেগুলো হচ্ছে—সাধারণ অর্থ, প্রচার, গোয়েন্দা, নিয়োগ ও শিক্ষা। নেতাজী এই বিভাগগুলিকে আরো জোরদার করলেন এবং সেই সঙ্গে যোগ করলেন, (১) সমাজ-কল্যাণ (২) নারী সংক্রান্ত (৩) জাতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতি (৪) পুনর্গঠন (৫) সরবরাহ (৬) বৈদেশিক (৭) গৃহনির্মান এবং যানবাহন।

ডঃ লক্ষ্মী স্বামিনাথন, যিনি পরে ঝান্সী রাণী বাহিনীর কমাণ্ড্যাণ্ট এবং আই. এন. এ-র কর্নেল হয়েছিলেন, তিনিই ছিলেন এই নারী বিভাগের দায়িত্বে। পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র এই লীগের শাখাগুলিকে এইভাবে মজবুত করে তোলার জন্যে নির্দেশ পাঠানো হল।

নেতাজী তাঁর সময়কে লীগের প্রধান কার্যালয় এবং আই. এন. এর সর্বাধিনায়কের কার্যালয়ের মধ্যে ভাগ করে নিলেন।

তিনি যখন ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে আই. এন. এ. যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা তাঁর সর্বাত্মক সৈন্য সমাবেশের

আহ্বানে নির্দ্বিধায় সাড়া দিয়েছে, তখন তিনি তাঁর সুযুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন ভারতের বাইরে, সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের ঐতিহাসিক ২১শে অক্টোবরে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজে। পূর্ব এশিয়ায় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের চার মাসের কম সময়ের মধ্যে তিনি নিলেন এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

তারপর থেকে ঘটনা প্রবাহ ছুটে চললো ঘূর্ণী ঝড়ের বেগে।

পরদিন ঝান্সী রাণী বাহিনীর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হল—সিঙ্গাপুরে। গৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে শ'য়ে শ'য়ে ভারতীয় মহিলা, বালিকা মুক্তি যুদ্ধের সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দেবার জন্যে দারুন উৎসাহে এসে ভীড় জমাতে লাগলো ক্যাম্পে। তাদের দেওয়া হয়েছিল নিঃসঙ্কোচ সামরিক শিক্ষা এমন কি রাইফেল ছোড়া এবং বেয়নেট চার্জের পদ্ধতিও শেখানো হয়েছিল।

অনুসারী রাত্রে আজাদ হিন্দ অস্থায়ী সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই নেতাজী ভারতীয় নাগরিক ও সামরিক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিলেন এবং তাদের নিকট থেকে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্ব সমর্পণের পবিত্র প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই ন'টি দেশ—জাপান, জার্মানী, ইতালী, ক্রোয়েটা, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপাইন এবং মাঞ্চুরিয়া—অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে তাদের যথাবিহিত স্বীকৃতি জানাল।

অস্থায়ী সরকার গঠনের এক সপ্তাহ পরে, নেতাজী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া কনফারেন্সে যোগদানের জন্য টোকিও এলেন। সেখানে তিনি মুক্ত ভারত অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানের যথাযোগ্য সম্মান পেলেন জাপ-সম্রাটের কাছ থেকে।

বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার কনফারেন্সে জাপানের প্রিমিয়ার তোজো ঘোষণা করলেন (৬ই নভেম্বর) যে, জাপান সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্থায়ী সরকারের হাতে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তুলে দেবেন—

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে ফিরে ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতের মুক্তাঞ্চল আন্দামানের মাটিতে পা দেবার জন্যে নেতাজী রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে অস্থায়ী সরকার ঠিক করে ফেলেছিলেন আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম পরিবর্তন করে হবে শহীদ এবং স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ।

আন্দামান যাত্রার প্রাকালে একটি কমিটি গঠন করলেন পূর্ব এশিয়ার

ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় সংহতি গঠনের ব্যাপারে বিশেষ করে ভাষা, পোষাক, খাদ্য, অভিবাদন, প্রতীক, উৎসব ইত্যাদি নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সুপারিশ করার জন্য। এই সাংগঠনিক কাজটির উপর তিনি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয়দের একসূত্রে গাঁথার জন্যে।

আন্দামান থেকে নেতাজী ব্যাঙ্কক ঘুরে এলেন বর্মায় এবং রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠা করলেন অস্থায়ী সরকারের সদর কার্যালয় এবং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ ও আই. এন. এ-র সর্বময় কর্তৃত্ব। এখন থেকে হল দুটো সদর কার্যালয়—প্রথমটি রেঙ্গুনে, তারপর সিঙ্গাপুর।

বর্মা যেহেতু ভারতের সীমান্ত এবং আই. এন. এ. যেমন করেই হোক, সেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বিতাড়ন করার চরম প্রতিশ্রুতি নিয়েছে, সেইহেতু নেতাজী দিবারাত্র পরিশ্রম করে চললেন এই নতুন সদর দপ্তরকে একটা শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করার। তিনি ততদিন বিশ্রাম নিতে পারেন নি, যতদিন নিঃসংশয় হতে পেরেছিলেন যে বর্মা ঘাঁটি প্রকৃতিই সেইরকম একটা তক্তায় পরিণত হয়েছে, যেখান থেকে শত্রুর টুঁটি টিপে ধরার জন্য ঝাঁপ দেওয়া যেতে পারে।

তারপরই এলো সেই নাটকীয় ঘোষণা—আরাকান ফ্রণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধে আই. এন. এ-র প্রথম গুলিবর্ষণ—৪ঠা ফেব্রুয়ারী; ১৯৪৪—সার্থক সংগ্রাম।

১৮ই মার্চ ১৯৪৪—আই. এন. এ-র ঐতিহাসিক নথিপত্রে চিরকালের জন্য লেখা থাকবে রক্ত রঞ্জিত অক্ষরে। সেই ঐতিহাসিক দিনে প্রথমবারের মত আই. এন. এ. অতিক্রম করলো বর্মার সীমান্ত, দাঁড়ালো ভারতের পবিত্র মাটিতে। নেতাজী ২১শে মার্চ ১৯৪৪ এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন পূর্ব এশিয়াকে, ভারতকে এবং পৃথিবীকে।

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়ের নিকট প্রতিটি মাসের ২১ তারিখ এক পবিত্র দিন—কেননা ১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসের ঐ দিনটিতে সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার।

এইভাবে তাঁর সিঙ্গাপুরে আগমনের ন'মাসের মধ্যে আই. এন. এ-কে পুনর্গঠিত করে মালয় থেকে থাইল্যাণ্ড হয়ে বার্মা অতিক্রম করে শুধু ভারত সীমান্তে পরিচালনা নয়, সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে ভারতের মাটিতে দাঁড় করানো—নেতাজীর কাছে ছিল বিস্ময়কর।

রেঙ্গুনে সদর কার্যালয় স্থানান্তর আর আই. এন. এ-র ঐতিহাসিক বর্মা

ভারত সীমান্ত অতিক্রমের মধ্যে নেতাজী ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেনস্ লীগের এক বিশাল পরিবর্ধন আনলেন। অস্থায়ী সরকারের মধ্যেও ব্যাপ্তি আনলেন সরবরাহ, মানব নিয়োগ এবং রাজস্ব দপ্তর তৈরী করে। অর্থ, সম্পদ এবং সামর্থকে সর্বাত্মক সামরিকীকরণের কাজকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য লীগের সদর-কার্যালয়ে আরো বারোটি দপ্তর যুক্ত করা হোল।

রাণী ঝান্সী বাহিনীর ক্যাম্প খোলা হ'ল রেঙ্গুনে এবং পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র খোলা হল ক্যাম্প ভারতীয় অসামরিক যুবকদের দ্রুত প্রশিক্ষণের জন্য। এই সমস্ত ক্যাম্প থেকে সুকঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে বেরিয়ে আসতে লাগলো হাজারে হাজারে সৈনিক।

১৯৪৪ সালের ৫ই এপ্রিল নেতাজী রেঙ্গুনে স্থাপন করলেন প্রথম আজাদ হিন্দ জাতীয় ব্যাঙ্ক। এবং সেইদিনই যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে রওয়ানা হলেন—যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে গেলেন সদর কার্যালয়। এই সময় তিনি সঙ্গে নিলেন স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঝান্সী রক্ষী বাহিনীর একটি দলকে।

এই সময় বর্মা-ভারত সীমান্তের আটটা 'সেকটরে' লড়াই চলছিল,—লড়াই চলছিল ইম্ফল ও কোহিমায়। ভারতীয় মুক্তি ফৌজের হাতে ইম্ফলের পতন ছিল প্রতিটি ঘণ্টার প্রত্যাশিত সংবাদ। এর পরিণতি হল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু।

কিন্তু ভাগ্যের ইচ্ছা বুঝি ছিল অন্যরকম; ইম্ফলের তিন মাইলের মধ্যে মুক্তি ফৌজকে দাঁড়িয়ে পরতে হল। তাদের ছিল বিমান বহরের অভাব। অপরদিকে মরণ-পণ করে শত্রুপক্ষের আক্রমণ অপ্রতিহত হয়ে উঠলো বিমানের সাহায্যে। যে কোন মূল্যে ইম্ফল রক্ষার জন্য আদেশ এসেছে লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের কাছে। বর্মার অবিশ্রান্ত বর্ষায় আই. এন. এ-র সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল।

আই. এন. এ-র কাছে পশ্চাদপসরণের আদেশ এল পরবর্তী আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য।

১৯৪৪ সালের জুন-জুলাই—ঘটলো চরম পতন—ম্যালেরিয়া আর পেটের রোগে আক্রান্ত সৈনিকেরা পশ্চাদপসরণ করে ফিরে আসতে লাগলো মান্দালয় এবং রেঙ্গুনে।

আই. এন. এ-র সঙ্গে অসামরিক বাহিনীও ইম্ফলে পরবর্তি আক্রমণের জন্য সময় এবং শক্তি নিয়ে দশগুণ ফিরে এল। কিন্তু শত্রুপক্ষের সুসজ্জিত বিমান

বহরের কাছে পর্যুদস্ত হল—তারা এগিয়ে গেল মিথটিলা, পিয়ানমা হ'য়ে রেঙ্গুনের দিকে।

রেঙ্গুনে নেতাজীর অবস্থান বিপজ্জনক অনুমান করে অস্থায়ী আজাদহিন্দ সরকারের ক্যাবিনেট সদস্যরা তাঁকে বাধ্য করলেন রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য।

অবশেষে ১৯৪৫ সালের মে মাসের মাঝামাঝি মিত্রশক্তির কাছে জার্মানীর আত্মসমর্পণের এক সপ্তাহ পরে নেতাজী—তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছালেন ব্যাঙ্ককে।

তারপর, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আই. এন. এ-র ভবিষ্যৎ সংগ্রাম প্রণালী নিয়ে চলল মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘন ঘন আলোচনা।

এমনই যখন পরিস্থিতি ১৯৪৫ এর জুন মাসে খবর এলো ভারতস্থ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল তাঁর কর্ম পরিষদে ভারতীয় অনুপ্রবেশের মাত্রাধিক্যের প্রলোভন দেখিয়ে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসকে ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমের বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে সহযোগিতা করবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।

স্বভাবসুলভ খোলা মন নিয়ে মহাত্মা গান্ধী সবরকম সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিলেন যাতে বিদেশী শাসকের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধের অবসান হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সেই মঞ্চ থেকে সরে এলেন এবং কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হোল ১৯৪৫ সালের জুন-জুলাই-এ সিমলা অধিবেশনে কংগ্রেসের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে।

ওয়াভেলের প্রস্তাব শুনেই নেতাজী ব্যাঙ্কক থেকে ছুটে এলেন সিঙ্গাপুরে ১৮ই জুন এবং একমাস ধরে রাতের পর রাত বেতার ভাষণ মারফৎ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ওয়াভেল প্রস্তাব গ্রহণ না করার পক্ষে যথাসাধ্য যুক্তি দেখিয়ে অনুরোধ জানাতে লাগলেন…

সিমলা অধিবেশনের ব্যর্থতা এবং কংগ্রেস কর্তৃক ওয়াভেল প্রস্তাবের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের খবর শুনে নেতাজী উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

তারপর তিনি মালয় সফর সেরে যখন সেরামবানে অবস্থান করছেন—শুনলেন রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এর পরে পরেই ১১ই আগষ্ট মধ্য রাত্রে সিঙ্গাপুর থেকে আগত লীগের একজন কর্মকর্তার কাছে শুনলেন জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ।

সিঙ্গাপুরে রাসবিহারীসহ নেতাজী

আই. এন. এ-র কাছে সেটি ছিল এক অন্ধকারময় মুহূর্ত।...আই. এন. এ আত্মসমর্পণ করবে না—করবার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু এর পক্ষে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়—একে যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে।

সামরিক দিক থেকে বিচার করলে আই. এন. এ অকৃতকার্য—কিন্তু তা শুধু সামরিক দিক থেকেই। যেখানেই তারা লড়াই করেছে, অর্জন করেছে অমর গৌরব। নেতাজীর এবং আই. এন. এ-র. অতুলনীয় কষ্ট স্বীকার এবং আত্মত্যাগ বর্মা, চীন, জাপান, থাই, মালয়, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামে এক অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বসূচনায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানুষেরা, যারা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন, অগ্রসরমান জাপানীদের প্রচণ্ড শক্তির সামনে থেকে তাদের শাসকদলকে যারা পালিয়ে যেতে দেখেছে, তারা বিমুগ্ধ হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের গতিশীল নেতৃত্বে ভারতের সংগ্রামের দৃশ্যে। বর্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামের মানুষেরা কঠিন শপথ নিয়েছে যুদ্ধের শেষে তারা কোনমতেই তাদের পূর্বতন শাসককে আবার শাসন করবার জন্য ফিরে আসতে দেবে না—চিরকালের জন্য তারা স্বাধীন হয়ে থাকবে।

নেতাজী তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন সিঙ্গাপুরে—অস্থায়ী সরকারের সামরিক বিভাগ এবং অসামরিক বিভাগের কাছে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত নির্দেশ রাখলেন। তাঁর মন্ত্রীবর্গের একান্ত অনুরোধে তিনি শেষ মুহূর্তে স্থির করলেন সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করে আরো পূর্বদিকে চলে যেতে। যদি তিনি সিঙ্গাপুরে তাঁর কমরেডদের সঙ্গে থাকতেন তাহলে বিজেতা ব্রিটিশের হাতে তিনি বন্দী হতেন—আগ্রহ ছিল মাঞ্চুরিয়ার রুশীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি মস্কো যাবেন, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একদিন তিনি মুক্তি পাবেন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে তিনি এখন ব্যাঙ্কক যাবেন...। সেই মুহূর্তে ব্যাঙ্কক পৌঁছানোর পর কি পরিকল্পনা নেওয়া হবে, তাও তিনি জানতেন না।

জাপান সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করলো ১৫ই আগষ্ট।

বিশ্বস্ত লেফটান্টের একটা ছোট্ট দল নিয়ে নেতাজী ১৬ই আগস্ট সিঙ্গাপুর থেকে এলেন ব্যাঙ্ককে। পরদিন সকালে সায়গনে। এইখানে তিনি তাঁর

ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী পরিকল্পনা করে সেইদিনই সন্ধ্যায় আমাদের জানা তাঁর সর্বশেষ পাড়ি দিলেন আকাশ পথে। ১৯৪৫ এর ১৭ই আগষ্ট একমাত্র ভারতীয় যিনি তাঁর যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি হলেন আই. এন. এ-র ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ কর্নেল হবিবুর রহমন। নেতাজীকে নিয়ে যাবার জন্যে যে মাঝারী আকারের বোমারু বিমানটি এসেছিল তাতে জায়গার সঙ্কুলান না হওয়ায় দলের অন্য সভ্যেরা সায়গনেই থেকে গেল।

পাঁচ দিন পর ২২শে আগস্ট টোকিও বেতারে ঘোষিত হল ফরমোসার কাছে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস মারা গেছেন।

নেতাজী যাদের সায়গনে রেখে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমিও একজন—আমাদের ধারনা হয়েছিল তিনি চলেছেন দাইরেন অভিমুখে—সীমান্ত অতিক্রম করে রুশীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

॥ শ্রমিকশ্রেণী স্বার্থে সুভাষচন্দ্র ॥

—হেমন্ত কুমার সরকার

* ১৯২৩ অব্দে সুভাষচন্দ্র Young Bengal Party নামে একটি দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। সেই দলের অনুষ্ঠান পত্র হ'তে দেখা যায় সুভাষচন্দ্র ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ লাভই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। ধর্ম এবং সমাজ এবং মতামত বিষয়ে তিনি সকলের যথাসম্ভব স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। শ্রমিক এবং কৃষকগণের স্বার্থের সহিত এই দলের একীকরণ তাঁর ঈপ্সিত ছিল।

শ্রমিকগণকে যাতে অতিরিক্ত খাটতে না হয়, বেতনের একটা নিম্নতম হার থাকে, অসুখের সময় বেতন না কাটা যায়, বৃদ্ধকালে পেনসন, দুর্ঘটনা স্থলে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি পায় সে বিষয়ে চেষ্টা করা দলের অভিপ্রেত ছিল।

কৃষকগণকে অন্ততঃ নিম্নলিখিত অধিকার দেওয়া সুভাষচন্দ্রের মত ছিল।

(১) অন্যায় এবং বাজে আদায় বন্ধ করা।

(২) সুদের একটা চরম হার নির্দ্ধারণ।

(৩) গাছ-কাটা, ইঁদ বা পুকুর-কাটা এবং দালান, ইমারত করার অবাধ অধিকার।

(৪) হস্তান্তরের অবাধ ক্ষমতা।

(৫) কৃষকের ভূমিতে স্বত্বলাভ।

॥ ইতিহাস-পুরুষ সুভাষচন্দ্র ॥

—এইচ বি. কামাথ

যদি মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশ সরকারের প্রতি "ভারত ছাড়ো" হুমকি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রণধ্বনি "চলো দিল্লী"র মধ্যে রূপান্তরিত ও তীব্রতর হয়ে না উঠতো—যা সিঙ্গাপুর থেকে মণিপুর পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, —যদি মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহী অভিযান নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে সুসংবদ্ধ শক্তিতে পরিণত না হোত, তাহ'লে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে ভারত কখনই ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা পেতো না এবং ১৯৫০ এর ২৬ জানুয়ারী ভারত প্রজাতন্ত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে পারতো না।

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম মুহূর্তে গান্ধীজীর সময়-চেতনা এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামের কৌশল, নেতাজীর কথায় এবং কাজের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি; পরন্তু তাঁর নিজস্ব নীতি এবং পদ্ধতিই যে প্রকট হ'য়ে উঠেছিল নেতাজীর ভারত-ত্যাগ এবং উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নাটকীয়ভাবে দুটো দেশ অতিক্রম ক'রে যাওয়া তাঁর প্রমাণ। ১৯৪২ এর জুলাই-এ জনৈক আমেরিকান লেখক যখন মহাত্মাজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন —কেন সুভাষ বোস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য এত অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন, তখন মহাত্মাজী তার উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন—'একথা সুভাষকেই জিজ্ঞেস করুন না, ক্যান।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন? বর্ণাঢ্যে সমুজ্জ্বল, ধূমকেতুর মতো তাঁর আবির্ভাব ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চকে ঝলমল করে তুলেছিল। একটা সময় এলো, যখন সেই জ্যোতিষ্কের দীপ্তি ম্রিয়মান হ'য়ে গেল, কিন্তু অচিরেই তা আবার অভূতপূর্ব দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো ভারতে এবং শেষে এশিয়ার সমগ্র আকাশে। গান্ধীজীর অহিংস গণআন্দোলনের মধ্যে তিনি বিপ্লবের অগ্নিবান নিক্ষেপ করলেন— সময়কে দিলেন অপরিসীম গতি এবং সংগ্রামের হৃদপিণ্ডকে দিলেন দ্রুততর স্পন্দন। আর, তারই ফলশ্রুতি—ত্বরান্বিত হোল ভারতের মুক্তি।

তাঁর অনন্ত আদর্শবাদ অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল থেকে ১৯৪০ এর ২৬ নভেম্বর-এ বাংলার গবর্ণর এবং তাঁর

মন্ত্রীমণ্ডলীকে লেখা সেই চিঠিতে, যার মারফত তাঁকে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য তিনি আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। বেশ বড় সে চিঠি। তার থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি :

"এই মরজগতে সব কিছুই লয় পাচ্ছে এবং পাবে—কিন্তু ভাবধারার, আদর্শের এবং স্বপ্নের লয় নেই।...এই জগতে দুঃখবরণ এবং আত্মত্যাগের অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাড়া কোন ভাবধারাই সার্থকতা লাভ করে নি। একটা নীতির জন্য জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করা—এই অনুভবের থেকে বড় কী সান্ত্বনা থাকতে পারে?...স্বীয় আদর্শের বেদীমূলে শান্তিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ থেকে মহত্তর আর কী সার্থকতায় মানবজীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে? আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন : ভুলো না মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা। ভুলো না, জঘন্যতম অপরাধ—অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপোষ করা। মনে রেখো শাশ্বত সেই বিধান : জীবন যদি পেতে চাও, জীবন তাহলে দিতে হবে। মনে রেখো শ্রেষ্ঠ ধর্ম—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তার জন্যে যত মূল্যই দিতে হোক।...আজকের সরকারের কাছে আমার বক্তব্য : সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়ের পথে আপনাদের উন্মত্ত অভিযান ক্ষান্ত করুন। ফিরে যাবার এখনও সময় আছে। এমন অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না যা শীঘ্রই আপনাদের বিরুদ্ধে উদ্যত হবে।"

১৯৩৯ মার্চ। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সেই অভূতপূর্ব ঘটনার গতিই তাঁকে পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর নির্ধারিত কর্মের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে তুলেছিল। আমার বিশ্বাস মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসে আসার পর থেকে সে-ই হোল কংগ্রেস-দলের মধ্যে সর্বপ্রথম নির্বাচন-অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে তিনিই হলেন রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত। তিনি পরাজিত করলেন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এমন কি গান্ধীজীর সমর্থিত প্রার্থী ডাঃ পট্টভী সীতারামায়াকে। নির্বাচনের পর মহাত্মা যখন লিখলেন "সুভাষের জয়, হোল আমার পরাজয়," নেতাজী পেলেন দারুণ আঘাত। কিন্তু তার জন্যে তিনি কোনরকম প্রতিশোধ স্পৃহায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন নি। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল বিদ্বেষহীন, নির্মল।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে যখন রোগশয্যা থেকে অধিবেশনের কার্য পরিচালনা করছিলেন, তখনই প্রমাণিত হ'য়েছিল তিনি কতখানি রাজনৈতিক

ভবিষ্যদ্রষ্টা। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ছ'মাসের মধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধছে এবং এই মুহূর্তে ভারতের উচিত ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দেওয়া এবং সর্বশেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাঁর সহকর্মীরা কর্ণপাত করলেন না, পরিবর্তে, সুনিপুণভাবে পন্থ-প্রস্তাবের সুড়ঙ্গ-পথে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে পর্যুদস্ত করে চললেন। প্রকৃতপক্ষে, নেতাজীকে কংগ্রেস-গদী ত্যাগ করতে বাধ্য করা হোল। আঠারো বছর আগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্যে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন, এখন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে স্থির-প্রত্যয় নিয়ে শেষ আঘাত হানার জন্য তিনি কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিলেন।

১৯৩৯ মে মাসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে বর্শার ফলার মতো প্রতিষ্ঠিত হল ফরোয়ার্ড ব্লক। সেপ্টেম্বর মাস দেখলো ইউরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা—ত্রিপুরীতে তিনি ঠিক যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। কারারুদ্ধ হলেন নেতাজী—১৯২৩ থেকে দফাওয়ারী কারাজীবনের শেষ অধ্যায় জুলাই, ১৯৪০-এ ভারতীয় নিরাপত্তা আইনের বলে। এই অবিচ্ছিন্ন অবরোধের প্রতিবাদে আমরণ অনশন সুরু করার অল্পকাল মধ্যেই ডিসেম্বরে তিনি কারামুক্ত হলেন। বাড়িতে রাখা হোল তাঁকে অন্তরীণ করে, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সদা সতর্ক সরকারী পাহারায়। তারই মধ্যে ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে তিনি অন্তর্ধান করলেন—দুর্গম যাত্রাপথের যাত্রী—পেশোয়ার, কাবুল, মস্কো হয়ে বার্লিনে।

বার্লিনে নেতাজী হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সমস্যা নিয়ে আলোচনাও করলেন। দেখা যায়, হিটলার, মুসোলিনী থেকে নেতাজীর আদর্শকে অধিকতর সম্মান দিয়েছিলেন। এটা আমি জেনেছিলাম ১৯৬০ সালে অক্টোবরে মিউনিকে ফুয়েরারের ব্যক্তিগত দোভাষী ডাঃ পল স্মিদ্‌ত্ (Dr. Paul Schmidt)-এর কাছ থেকে। ১৯৪২ জানুয়ারী নেতাজী জার্মানীতে বেশীর ভাগ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গঠন করলেন মুক্ত ভারত বাহিনী (Free India Legion)। বার্লিন বেতার কেন্দ্র থেকে সুরু করলেন নিয়মিত প্রচার—ভারতে যা যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ১৯৪২-এর ২০ এপ্রিল উত্তপ্ত সত্য আবেগের সঙ্গে বলতে বলতে তিনি বলেছিলেন :

"এই ত্রিশক্তি কি করেছে বা করবে, তার সাফাই গাইতে আমি আসি নি। ও কাজ আমার নয়। আমার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে আছে ভারতবর্ষ

নিয়ে···ব্রিটেনের বেতনভুক প্রচারকেরা প্রচার করছে আমি তাদের শত্রুর দালাল। আমি যখন আমার নিজের মানুষদের কাছে কথা বলি, তখন আমার কোন পরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তা আমি দেখি না। আমার সমগ্র জীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক অবিচ্ছিন্ন, অনমনীয়, আপোষহীন সংগ্রাম—সেটাই আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আমার জীবন ভারতের জন্য নিবেদিত। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাই থাকবে। আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, ভারতের প্রতি আমার এই আনুগত্য, এই একাত্মবোধ, যা আমার ছিল, তা চিরকাল ঠিক একই থাকবে।"

১৯৪২-এ যখন জাপানের ঝটিকা-অভিযানে পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ, ফ্রান্স এবং ডাচ সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল— নেতাজী বুঝতে পারলেন চরম আঘাত দেবার পরম মুহূর্ত সমাগত। জার্মান এবং জাপান সরকারের সহযোগিতায় ১৯৪৩-এর প্রথম দিকেই তিনি জার্মান পরিত্যাগ করলেন এবং হামবুর্গ থেকে পেনাঙে সাবমেরিণে তিন মাসের বিপদসঙ্কুল অভিযান শেষে পৌঁছোলেন টোকিও। তারপর ১৯৪৩ এর ১ জুলাই এলেন সিঙ্গাপুর।

এক দুরন্ত গতিশীল নেতার নাটকীয় আবির্ভাবে শুধু যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে নয়, সিঙ্গাপুর এবং পূর্ব-এশিয়ার অসামরিক জনসাধারণের মধ্যেও এত অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। দুদিন পর ৪ জুলাই রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজকে করলেন সুসংগঠিত—২৫ আগষ্ট নিলেন এর সর্বাধিনায়কত্বের দায়িত্ব—২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দের অস্থায়ী জাতীয় সরকার ঘোষিত হোল—২২ অক্টোবর গঠন করলেন রাণী ঝান্সী বাহিনী। নভেম্বরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মুক্ত হোল। নেতাজী নতুন নাম দিলেন শহীদ এবং স্বরাজ দ্বীপ। ১৯৪৪ জানুয়ারীতে আই. এন. এ-র প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হোল রেঙ্গুনে, তারপর সুরু হোল মাতৃভূমির দিকে অভিযান। আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে প্রথম পদক্ষেপ করলো ১৮ মার্চ, ১৯৪৪।

সেদিন তাদের আনন্দের ছিল না কোন সীমা পরিসীমা। হাঁটু ভেঙ্গে বসে সেদিন তারা চুম্বন করেছিল ভারত-মাতার ধূলি। কেমন করে সেই বীর সেনারা কোহিমা এবং ইম্ফল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল—'জয় হিন্দ' 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে কী উন্মত্ত উল্লাসে ভারতের পতাকা উত্তোলিত

হয়েছিল—কেমন করে হিরোসিমা আর নাগাসিকায় আনবিক বোমা নিক্ষেপের পর জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল এবং তারই ফলে আই. এন. এ-কে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল, তা কারো অজানা নেই—তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

১৯৪৫ এর ১৮ আগষ্ট ফরমোসা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা গেছেন বলে প্রচারিত হয়েছে ; এই অকুতোভয় যোদ্ধা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিকের তখন বয়স মাত্র আটচল্লিশ বৎসর।

১৯৪৬ এর প্রথম দিকে দিল্লীর লাল কেল্লায় তিনজন আই. এন. এ. অফিসারের (১) বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল বিচার ইংরাজ সরকারের এক চরমতম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এতে নৌ-বিভাগ স্ফুলিঙ্গান্বিত হয়ে উঠলো। উচ্চপদস্থ ভারতীয় সেনা বাহিনীর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো বিদ্রোহ আর আন্দোলন —ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শবাধার তৈরী হয়ে গেল।

১৯৪৩-এ বাংলার সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় বর্মা এবং শ্যাম সরকারের কাছ থেকে এক লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করে কলকাতার বন্দরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রিটিশের কাছে তিনি অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন—যে জাহাজগুলো ভারতে চাল নিয়ে যাবে তারা যাতে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে। চেয়েছিলেন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। হৃদয়হীন নির্বিকার ব্রিটিশ সরকার তাঁর সেই প্রস্তাবে কর্ণপাতই করলো না, যাতে নেতাজী ভারতের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষের কাছে ত্রাতারূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠেন।

কলকাতার ওপর বোমা বর্ষণ করার কাজ থেকে জাপানীদের তিনি সার্থকতার সঙ্গে প্রতিনিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন :

"আমি আমার দেশবাসীকে দিতে চাই আশা ও উৎসাহ, ধ্বংস এবং কষ্ট নয়। ইম্ফল জয়ের পর আমরা কলকাতার আকাশে পাঠাবো দলে দলে বোমারু বিমান, যারা বোমা ফেলবে না, ফেলবে বাংলার মানুষদের জন্যে হাজার হাজার ত্রিবর্ণ পতাকা। বোমার থেকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের পথে তা হবে আরো শক্তিশালী।"

প্রতিক্ষেত্রেই তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে আই. এন. এ-র স্বাধীনতাও অক্ষুন্ন রেখে গেছেন। তাঁর তেজোসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কাছে জাপানী নেতারা সব সময়েই মাথা নত করে গেছেন।

যদিও তাঁর কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে গান্ধীজী উপলক্ষ

ছিলেন, তবুও সুভাষ তাঁর ওপর কখনো কোন বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নি।(২) অসূয়াবিহীন ছিল তাঁর মন তাই রেঙ্গুন রেডিও থেকে ১৯৪৪ এর ৬ জুলাই তিনিই প্রথম মহাত্মাকে সম্বোধন করেছিলেন, "জাতির পিতা"-রূপে এবং চেয়েছিলেন—ভারত মুক্তির ধর্মযুদ্ধে তার আশীর্বাদ।

১৯৪৩ এর ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ অস্থায়ী সরকার ঘোষণার পর তিনি শপথ নিয়েছিলেন :

"ভগবানের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতেছি—ভারতবর্ষ এবং তার আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্য আমি, সুভাষচন্দ্র বোস, আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার এই মহান সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। আমি সর্বসময়ের জন্য ভারতের সেবক হইয়া থাকিব এবং আটত্রিশ কোটি ভারতীয় ভাই-বোনের কল্যাণ সাধনই হইবে আমার পরম কর্তব্য। স্বাধীনতা লাভের পরেও আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দ্বারা সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিব।"

তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যখন ড: পট্টভী সীতারামায়া বলেন : "Subhas may be alive or dead in body, but his spirit and his name will endure long, yea, for ever in history" (সুভাষ তাঁর দেহ নিয়ে হয়তো বেঁচে আছে কিংবা মারা গেছে, কিন্তু তাঁর কর্ম এবং তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জয়শ্রী ১৩৮২ (নেতাজী সংখ্যা) র সৌজন্যে প্রাপ্ত ও অনূদিত।

(১) শাহনাওয়াজ, ধীলন এবং সাযগল

(২) উক্ত মনোভাবের স্বপক্ষে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য ১৯৪০ এর ৯ই ডিসেম্বর একটি সাক্ষাতকারে নেতাজী যে মন্তব্য রেখে ছিলেন তা উদ্ধৃত করলাম—"আমার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি আজ আর নেই। তাঁর কাছ থেকে আমি শিক্ষা পেয়েছি, ব্যক্তিগত সম্বন্ধগুলিকে মানুষের কাছে যতখানি সম্ভব রাজনৈতিক মতবিরোধের উর্ধে রাখতে হবে। এই জন্য গান্ধীবাদীদের হাত থেকে যে লাঞ্ছনা আমি পেয়েছি এবং পাচ্ছি তা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমি পোষণ করি। সুইজারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বীর উইলিয়ম টেল-এর উপরে একটি কবিতা ইস্কুলে পড়বার সময় পড়েছিলাম—

My Knee shall bend, he calmly said
To God and God alone,
My life is in the Austrian's hands
My conscience in my own.

[শান্তভাবে কহেন তিনি আমার জানু নত হবে
ভগবানের কাছে কেবল ভগবানের কাছে,
অষ্ট্রিয়ান শত্রু হাতে যখন আমার জীবন বাঁধা
আমার বিবেক আছে, তখন, আমার কাছেই আছে]

॥ সুভাষ জীবনে দ্বৈতরূপ ॥

—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিশ শতকের শুরুতেই আমাদের রাজনৈতিক চেতনা প্রথম স্পষ্ট চেহারা নেয় এবং তখনই তা পরস্পর-বিরোধী দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। একটা ধারা ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ এবং তা সফল করার জন্যে এক দিকে যেমন দেশের ইতস্তত ছোট-বড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সহায়তা লাভের জন্যে আনাগোনাও শুরু হয়ে যায়। আর একটা ধারা ধরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ, আন্দোলন, বিক্ষোভ, সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে একের-পর-এক। সেই সঙ্গেই ঐক্য, অহিংসা ও সংগঠনের আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। এই দুটো ধারা পরোক্ষভাবে অবশ্য একে অন্যের পরিপূরকতা করেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এরা কেউ কারোকে স্পর্শ করে নি। সুভাষচন্দ্রই প্রথম জাতীয় নেতা, যিনি দুটি ধারাকে একত্র মেলান। তাই তাঁর জীবনে আমরা দেখি একই সঙ্গে অগ্নিযুগের সংগ্রামী পৌরুষ, আবার কংগ্রেসী রাজনীতির সংগঠনী দৃষ্টিভঙ্গী। দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি আমাদের ইতিহাসে অনন্য।

এই অনন্যতার গুণেই তিনি যুব ভারতের অন্তর্লোকে যত বড় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এমন আর কারোকে হতে দেখা যায় না। ভারতে এমন শহর নেই যেখানে পথে, পার্কে, শিক্ষায়তনে তাঁর একটা-দুটো মূর্তি না চোখে পড়ে। সর্বত্র তাঁর নামে পাঠাগার, সংস্কৃতি ভবন, ক্রীড়াসত্র। সমস্ত মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনী, বক্তৃতা ও রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যান। এমন সর্বাত্মক স্বীকৃতি ও আনুগত্যের মূলে আছে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামশীল ব্যক্তিত্ব, সেই সঙ্গেই আছে তাঁর সমৃদ্ধ ও কল্যাণাশ্রিত ভাবী সমাজ গঠনের আদর্শও। আমাদের প্রধানতম রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহ শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। তাই তাতে চিন্তার ঐশ্বর্য ছিল বরাবরই। কিন্তু ফুটন্ত সংগ্রামের তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক এসেছিল শুধু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়কদের কাছ থেকে। একাধারে দুদিকের পূর্ণতা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রে, তাই রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হবার সঙ্গে-সঙ্গে তরুণ

সমাজের অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন তিনি এত অনায়াসে। তাঁর সেই সার্বিক নেতৃত্বের পূর্ণ পরিচিতি এখনো ভাল করে উদ্ঘাটিত হয় নি।

যাঁরা নেতাজী হিসাবে তাঁর সেনাপতির রূপটিকে প্রধান করে দেখেন, তাঁরা ভুলে যান যে, আমাদের আন্দোলনের রাজনীতিকে তিনিই প্রথম গঠনের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহাকে ডেকেছিলেন তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি জাতীয় পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করতে। তিনি বলেছিলেন, শুধু স্বাধীনতা লাভ নয়, লব্ধ স্বাধীনতাকে জীবনের উপযোগীও করতে হবে। সেই সাহা পরিকল্পনার খবর যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, নদী নিয়ন্ত্রণ, সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ছোট-ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানার দ্বারা গ্রাম-ভারতের আত্মনির্ভরশীলতা বিধান এক দিকে, অন্য দিকে অতিকায় ইস্পাত কারখানা মোটর ও বিমান নির্মাণশালা, পারমাণবিক বীক্ষণশালা···দুইয়েরই স্থান সুচিহ্নিত হয়েছিল তাতে, যদিও দ্বিতীয়টিকে করা হয়েছিল প্রথমটির অনুবর্তী। আগে বিত্ত উৎপাদন, তারপর তার বিনিয়োগ এই ছিল তাঁর নীতি। দুঃখের বিষয় এই সাহা-সুভাষ পরিকল্পনার শেষার্ধকেই শুধু অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে দেশে। তাই দেশের ধনভাণ্ডার হয়েছে নিঃশেষিত। গ্রামগুলি হয়েছে অরক্ষিত, আর শহরগুলি হয়েছে অতিস্ফীত এবং ভারসাম্য-ভ্রষ্ট। এই পরিকল্পনার অপরাধে দৃষ্টি দিয়ে এখনো সঙ্কটমুক্ত হওয়া যায় কিনা, সে বিচার বিশেষজ্ঞদেরই করণীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বলতম কীর্তি অবশ্য আজাদ হিন্দ সরকার এবং তার পৃষ্ঠপোষিত আজাদ হিন্দ ফৌজও। ইংরেজ শাসিত ভারতে এই ফৌজই প্রথম বাইরে থেকে ভারতের মাটিতে হানা দেয় এবং পরাধীন দেশের এক প্রান্তে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ায়। ইংরেজের উন্নত অস্ত্রবলের মুখে এই অভিযান বেশী দিন আত্মরক্ষা করতে পারে নি যদিও, তবু ১৮৫৭র বিদ্রোহ ছাড়া সামরিক অভিযানের পথে স্বাধীনতা লাভের উদ্যম আর কোন দিন হয় নি বলে, এই গৌরবজনক প্রচেষ্টার সামনে জাতি চিরদিনই মাথা নুইয়ে দেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স জার্মানীর দ্বারা অধীকৃত হলে, জেনারেল দ্য গল্ দেশের বাইরে স্বাধীন ফরাসী সরকার স্থাপন করেছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি তদানীন্তন ফরাসী উপনিবেশে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি তিনি। নীওার্সে যে প্রত্যাক্রমণ

হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মিলিত ত্রিশক্তি। তা সত্ত্বেও স্থ গলের দেশপ্রেম, ফ্যাসিস্ট গ্রাসের বিরুদ্ধে জাতির প্রতিরোধ শক্তি জীইয়ে রাখার বলিষ্ঠ প্রয়াস ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ শুধু প্রতিরোধের আদর্শটিই সঞ্জীবিত রাখে নি, তাকে কর্মেও রূপ দিয়েছিল। তাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তার দান অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাবসানের পরই যে ইংরেজ ভারতের মৃত্তিকা থেকে সাম্রাজ্যের কারবার গুটিয়ে সরে পড়েছিল, তার একটা বড় কারণ আজাদ হিন্দ সম্ভূত উদ্দীপনা, যা বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহে, জব্বলপুরের বৈমানিক বিদ্রোহে, উত্তর প্রদেশের পুলিশ ধর্মঘটে এবং সারা ভারতব্যাপী রেলপথ ও ডাক-তার ধর্মঘটে রূপ পেয়েছিল। চতুর ইংরেজ বুঝেছিল আর নয়, এবার সরে পড়তে হবে।

অবশ্য আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও জুগিয়েছিল তাকে কিছুটা হুঁসিয়ারী। লাল চীন যখন ইয়াংসী পার হয়ে দক্ষিণে পৌঁছল এবং কুয়োমিণ্টাং সরকার পিছু হঠতে শুরু করল ফরমোজার দিকে, তখন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা সবাই দেওয়ালের লেখা পড়তে পেরেছিলেন। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, সবাই তখন দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের হাতে রাজ্যপাট ছেড়ে পালানই শ্রেয় বলে বুঝেছিলেন। ইংরেজের ক্ষেত্রে নেতাজীর আজাদ হিন্দ এই বুঝকে ত্বরান্বিত করেছিল। ফরাসীকে দিয়েন-বিয়েন ফুর পর জেনেভা হয়ে পালানর রাস্তা খুঁজতে হয়েছিল। মোটের ওপর বন্দী এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামে নেতাজীর অনুপ্রেরণা ঠিক ততটাই কাজ করেছিল, যতটা করেছিল ১৯০৪ সালে রুশো-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বিজয়ী এডমিরাল টোগোর দৃষ্টান্ত। একথা কে না জানেন যে, তখন থেকেই ভারতের সন্ত্রাসবাদী তরুণরা জাপানের শরণার্থী হতে থাকেন সামরিক সহায়তার আশায়? নেতাজী এই ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর আগে ছিলেন রাসবিহারী বসু, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আরো অনেকে।

আজাদ হিন্দের গঠন ও প্রস্তুতিতে জাপানের সাহায্য যাই থেকে থাকুক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতবাসীই এর পিছনে ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকায় এবং তাঁদের সুপ্ত দেশপ্রেম জাগিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তদানীন্তন জাপানের অভিপ্রায় কি ছিল বলা কঠিন। হয়ত ভাল ছিল না, কারণ ব্যারণ তানাকার যে পরিকল্পনা ধরে জাপান কোরিয়া দখল করেছিল, মাঞ্চুরিয়ায় ও চীনে অভিযান শুরু করেছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক দুনিয়ায় একটু একটু করে থাবা বাড়াচ্ছিল, তার খতিয়ানে ভারতের নামটাও অনুপস্থিত নয়।

অবশ্য নিখিল এশিয়ার সমসমুন্নতি বলয় গড়ার নামেই এই সর্বগ্রাসের নীতি ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জাপানের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করেন নি। 'ভারতের সংগ্রাম' নামক বইয়ে তিনি বলেছেন, নীতি ও আদর্শে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়েও রাশিয়া যদি বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পেরে থাকে তাহলে ভারত কেন পারবে না বৃটিশের চিরশত্রু জাপানের সঙ্গে হাত মেলাতে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ হল নিজস্ব প্রত্যয়ের কথা। তাছাড়া নেতাজী জানতেন চীন ও ভারতকে কবলিত করা জাপানের পক্ষে সাধ্যাতীত। তাই উদ্বেগ বোধ করেন নি তিনি।

॥ সুভাষচন্দ্র—বিপ্লবী না বিদ্রোহী ॥

—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুভাষচন্দ্র বোস বিপ্লবী না বিদ্রোহী, হয়তো সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন অবান্তর; কিন্তু ব্যাপক ও বৃহত্তর সুভাষ-জীবনের ঐতিহাসিক ভূমিকায় এ প্রশ্ন মীমাংসার অপেক্ষা রাখে। পরাধীন দেশে কুত্রাপি বিপ্লব ঘটেছে, সম্ভবত ইতিহাসে এর নজির নেই। পরাধীন দেশের মৌল কার্যক্রম একটি। স্বাধীনতা অর্জন করা। দেশের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে দেশকে বৈদেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত করবার পর আসে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন এবং তাই, কসুথের হাঙ্গেরী, গ্যারিবল্ডীর ইটালী, উইলিয়াম টেলের সুইজারল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা, আয়র্ল্যাণ্ড, কোরিয়ার মত কোন পরাধীন দেশে বিপ্লব ঘটেছে, একথা ইতিহাস বলে নি। যা ঘটেছে, তাকে বলেছে বিদ্রোহ, স্বাধীনতার যুদ্ধ, ইনসারেকশন।

এই সিদ্ধান্ত যদি ইতিহাস-সম্মত বলে বিবেচিত হয়, সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই বিদ্রোহী; কিন্তু চির-বিদ্রোহী;—আধা নয়, ক্ষনিকের নয়, ভূতপূর্বও নয়। পরাধীন ভারতের সুভাষ বোষ সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

নেতাজী সুভাষ পরাধীন ভারতে জন্মান নি,—জন্মেছিলেন স্বাধীন দেশে।

যেদিন আর যে মুহূর্তে একটি বিধিসম্মত স্বতন্ত্র সরকার গঠন করে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন, সেইদিন আর সেই মুহূর্তে বিজয়ের গৌরবচিহ্ন তাঁর ললাটে উঠেছিল প্রদীপ্ত হয়ে, তিনি বিদ্রোহী থেকে হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবী। তাঁর মুক্ত করা ভারতরাজ্যের পরিধি কতটুকু ছিল, এহ বাহ্য। কিন্তু ছিল এ কথাটি পরম সত্য। সে আন্দামান হোক কিম্বা নিকোবরই হোক এবং সেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের তিনি ছিলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি বা সর্বাধিনায়ক।

।। আমার চোখে সুভাষচন্দ্র ।।

ডাঃ গিরিজা মুখার্জী

সুভাষ বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের।

আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা বলতে গেলে, বলতে হয় বিশ শতকের গোড়ার কথা। তখন আমি স্কুলের ছাত্র—কলকাতায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন[১]—সেখানে গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে। এই নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির অধ্যক্ষ ছিলেন সুভাষ বসু। এখান থেকেই আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এরপর তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় যোগাযোগ ঘটে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। একটা বাংলা-সাপ্তাহিকের যুগ্ম-সম্পাদক-রূপে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম লেখা আনতে। সেই স্মরণীয় সাক্ষাৎকার এখনও আমার মনে জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। কারণ, সে সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন দারুণ লাজুক। অন্য কারো সামনে তিনি আমাকে তাঁর লেখা দিতে নারাজ হলেন। আমাকে ডেকে একেবারে তাঁর পাশের আসনে বসতে বললেন। তারপর অত্যন্ত সংগোপনে সকলের চোখের আড়াল দিয়ে আমার হাতে লেখাটি গুঁজে দিলেন। আমরা আমাদের কাগজে সে লেখাটি ছেপে-ছিলাম। খুব ভালো লেখা হয়েছিল। খুব ভালো বাংলা লিখতে পারতেন তিনি। আর তাঁর লেখার স্টাইল ছিল লেখকদেরও ঈর্ষার বস্তু। তারপর থেকে প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাত হোত। যখন আমি অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তখন মত পার্থক্য নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই ঠোকাঠুকি হোত। সুভাষচন্দ্র একটা প্রতিপক্ষ সংগঠন তৈরী করেছিলেন। তার নাম ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন। এই দুটো সংগঠনের কারণে আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য লেগেই থাকতো। সে যাই হোক, আমাদের এই মতান্তরকে তিনি কোন কারণেই মনান্তরে নেন নি। তা যদি নিতেন, তা হ'লে ১৯৩২-এ ইউরোপ যাত্রার পথে জাহাজ থেকে আমাকে লণ্ডনে চিঠি লিখে ইউরোপের কোন একটা জায়গায় দেখা করতে বলতেন না। সে সময় ইউরোপে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমি পারি নি। তবে ১৯৪২-এ; যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে, তখন ইউরোপে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম বার্লিনে। গিয়েছিলাম প্যারিস থেকে।

বার্লিনে আমরা কী করেছিলাম, যুদ্ধ চলাকালে ইউরোপেই বা কী করেছিলাম, সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমি লিখেছি। এখানে তার

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমার দুটো বই "দিস ইউরোপ" এবং 'ইউরোপ অ্যাট ওয়ার"-তে আমি তাঁর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ধারণার কথা যথাসাধ্য লিখেছি। কিন্তু ভারতের নয়া-রাজনীতি এবং সামাজিক অগ্রগতির আলোকে সুভাষ বসুর চিন্তা, তাঁর কার্যাবলী এবং তাঁর ধ্যান-ধারণার কথা উত্তরোত্তর আলোচিত হচ্ছে। তখন তাঁর চিন্তা ও কর্ম প্রণালীর সার্থক মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে—যা এতকাল হয় নি। তিনি অন্তর্ধান করেছেন পঁচিশ বছরেরও বেশী, তবুও তাঁর প্রতি ভারতবাসীর আগ্রহ এতটুকু কমে নি। এমন কি অন্তর্ধানের সেই দুর্গম পথের বিপদসঙ্কুল কাহিনীটিও উপকথায় পরিণত। সম্প্রতি দিল্লীর গান্ধী ময়দানের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে দেখে বিস্মিত হলাম, যদিও পঁচিশ বছরেরও বেশী তিনি অনুপস্থিত; তবুও তাঁর জন্মদিন পালন করার জন্য সেই বিপুল জনসমাবেশের কী উৎসাহ!

এটা প্রকৃতপক্ষে একটা রহস্য যে কেমন করে অতি অল্পকালের মধ্যে এই মানুষটি ভারতের জনগণের জীবনে এমন একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন যার ফলে তারা আজও তাঁকে একজন প্রাচীন রাষ্ট্রনেতা বা প্রবীন রাজনীতিবিদ বলে ভাবতে পারে না। ভারতের মুক্তি-সাধনার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গৃহজীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও গৃহসুখ বর্জন করে যে তরুণ দেশ-নায়ক দেশকে স্বধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার সুদৃঢ় ব্রত নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন, সেই চির তরুণকেই দেশবাসী স্মরণে রেখেছে। তাঁর স্বপ্ন আজ সফল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্বাধীনতার-রবিরশ্মিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত নেই। যাই হোক, তাঁর জীবনের উজ্জল দৃষ্টান্ত এই প্রজন্মের তরুণ ভারতবাসীর চোখের সামনে থাকা প্রয়োজন, তার ফলে তারা আমাদের মতই তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারবে। তাঁর আদর্শ হয়তো সকলে অনুসরণ করবে না, তবুও অন্তত: তৃপ্তির আস্বাদ পাবে এই জেনে যে, তিনি এই দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাতে এই দেশের মানুষেরা উপলব্ধি করতে পারে বৈদেশিক শাসন-মুক্ত স্বাধীনতার আশীর্বাদ। বর্তমানের মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয় সেই অন্ধকার, বীভৎস দিনে এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কী অর্থ! এবং ঠিক এই কারণে আমাদের পক্ষে বিশেষ করে দায়িত্বভার রয়েছে এই পর্বের চিত্র আমাদের মনে যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ক'রে রাখা। বিদেশীর নাগপাশে বদ্ধ থাকার দুর্দ্দশা যে কী ভয়ংকর এতদ্বারা আমরা সেই দুঃখময় স্মৃতি বিস্মৃত হব না।

নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্র আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রচুর অবদান রেখে গেছেন, কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং তাঁর নিরন্তর ধ্যানের অনুসারে এক মহান ও উজ্জ্বল ভারত তিনি গড়ে তুলতে পারতেন, তাহলে, তা হত অধিকতর মহান অবদান।

দেশকে পরবর্তি উন্নয়নের পর্বে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদের। সেই দায়িত্বভার অনেকখানি হাল্কা হয়ে যাবে যদি আমরা সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে আরো জানতে পারি; আর জানতে পারি কিভাবে একেবারে বাল্যকাল থেকে অবিরাম সংগ্রাম করে তিনি পরবর্তিকালে যা হয়ে উঠেছিলেন, তার স্মরণ কাহিনী।

গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন

সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এবং সরকারী চাকুরির মোহ পরিত্যাগ করে বিলাত থেকে ভারতে ফিরে আসেন ১৬ই জুলাই ১৯২১ সালে। তখন তাঁর বয়স চব্বিশের কোঠা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে পঁচিশের কোঠায়। ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২১—অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল—"Mr. Subhas Chandra Bose......who recently passed brilliantly the I. C. S. examination but refused to accept Government service has now taken charge at Kalikata Vidyapitha at 11, Wellington Square. Mr. Bose is also a graduate of Cambridge" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই তাঁকে এই কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।

"সুভাষচন্দ্র যখন কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ তখন ঐ কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ছিল এক হাজার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্গত কলেজ-গুলির যে সব ছাত্ররা দেশবন্ধুর আহ্বানে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন করার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তাদের মধ্য থেকে অনেকে এই ক্যালকাটা ন্যাশনাল কলেজ তথা কলিকাতা বিদ্যাপীঠে ছাত্ররূপে যোগ দিয়েছিল। এই কলেজটি চলত বোর্ড অব ন্যাশনাল এডুকেশন বা গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তনের পরিচালনাধীনে। কিরণশঙ্কর রায়—যিনি ইতিপূর্বে ছিলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ও সদ্য বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছিলেন;—তিনি ছিলেন গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের সেক্রেটারী। সুভাষচন্দ্র

এবং কিরণশঙ্কর যখন এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ভার নেন, তখন সেখানে বিশৃঙ্খলা চলছিল—অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা সেখানে শুধু শৃঙ্খলাই ফিরিয়ে আনেন নি দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রসারও ঘটাতে পেরেছিলেন। গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তন সারা বাংলাদেশে ১২৯টি জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনা করত। সেগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল চোদ্দ হাজার। এ ছাড়াও গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তনের অধীনে ছিল চারটি জাতীয় কলেজ—ঢাকা ন্যাশানাল কলেজ, কলিকাতা বিদ্যাপীঠ, দি ন্যাশনাল মেডিকেল ইন্‌স্টিট্যুট (১১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার) এবং বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ (আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান শাখার জন্য)। এছাড়াও ৭৮/১, আমহার্স্ট স্ট্রীটে ছিল একটি ন্যাশানাল এডুকেশন ইন্‌স্টিট্যুট, যার অঙ্গীভূত ছিল একটি কমার্শিয়াল কলেজ। ঢাকা ন্যাশানাল কলেজকে কালক্রমে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার পরিকল্পনা ছিল এবং সেই অনুসারে ঐ কলেজের বেশ কয়েকটি শাখাও পূর্ববঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল।

[—পবিত্র কুমার ঘোষ]

"বিপ্লববাদ ও সুভাষচন্দ্র"

—অনন্ত সিংহ

বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল সেই ঐতিহাসিক তথ্য বর্তমানে যদি জানা না যায় তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অপরিহার্য অধ্যায় রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৯২১ সাল থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনে বিপ্লবীদের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন আর বিপ্লবীরাও সুভাষের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক সংগঠন সুদৃঢ় করতে সুযোগ পেলেন।...সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন গান্ধীজীর অহিংসা ধর্ম এবং খদ্দর ও চরকার মহিমার মধ্যে জন্মলাভ করে নি। তাঁর বলিষ্ঠ রাজনীতির প্রথম প্রভাত দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হয়েছে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন মুখার্জী ও শত শহীদের রক্তসিঞ্চিত বাংলার মাটিতে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কোন এক আকস্মিক ঘটনা নয়—এই বৈপ্লবিক সম্পর্ক—স্বদেশপ্রেমের চরম স্বার্থত্যাগ সাহস ও নিরহঙ্কার প্রেরণার স্বাভাবিক প্রকাশ। সুভাষচন্দ্র বাংলার প্রাচীন ও তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগসূত্র স্থাপন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চির সমাধি রচনার জন্য আপোষহীন বিপ্লবের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করলেন।

পুলিসের সেই একই গোপন মুদ্রিত নথি (Secret Documents) থেকে উদ্ধৃত করছি—

"...In 1924 the terrorist members of tha Swarajya party supported the candidature of Mr. Subhas Chandra Bose as chief Executive Officer of the Corporation and ii is noteworthy that after his appoinment to that post many jobs in the Corporation were given to terrorists."

সরকার মহল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের গভীর বৈপ্লবিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা এর চাইতে বেশী করতে পারে নি। তখন কি বৃটিশ সরকার নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের "দিল্লী চল" অভিযানের ইতিহাস কল্পনা করতে পেরেছিল? সহিংস "ভারত ছাড়" সংগ্রাম "দিল্লী চল", অভিযানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুর্বার দুর্জয় ও অপ্রতিহত বৈপ্লবিক শক্তির সৃষ্টি করেছে—সেই শক্তি গান্ধীজীর অহিংসবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত ও নীতির সাক্ষ্য বহন করে।

আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা-সহ নেতাজী

॥ ইউরোপের পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্র ও ভারতের সংগ্রাম ॥

—দেবজ্যোতি বর্ম্মন

১৯৪১-এর মার্চ্চ মাসে সুভাষচন্দ্র জার্মাণী পৌঁছিলেন। ভারতীয় সৈন্য তখন পশ্চিম এশিয়ায় লড়িতেছে এবং ভারত সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটিরূপে সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ভারতে বৃটিশ শক্তিকে আঘাত করিবার প্রয়োজন হিটলার অনুভব করিতেছিলেন। এমনি এক সঙ্কট সময়ে সুভাষচন্দ্র জার্মাণীতে পদার্পণ করিলেন। রিবেণট্রপ তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। ভারতে বিপ্লবের সম্ভাবনা জানিয়া তিনি খুশী হইলেন।

সুভাষচন্দ্র রিবেণট্রপকে বলিলেন—তাঁহাকে যেন বার্লিন হইতে ভারতে বৃটিশ বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়া একটি আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের অনুমতিও তিনি চাহিলেন। রিবেণট্রপকে বুঝাইলেন যে, এই দুইটি কাজই তাঁর ইংরেজ ধ্বংসের চেষ্টায় সহায়ক হইবে। তবে সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র দাবী করিলেন যে যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। রিবেণট্রপ সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলিলেন না।

জুন মাসের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র রোম গেলেন। সেখানেও মুসোলিনীর বৈদেশিক মন্ত্রী কাউন্ট চানোর সঙ্গে অনুরূপ কথা হইল, তাঁহার নিকটও তিনি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি চাহিলেন। কাউন্ট চানোও কোন স্পষ্ট কথা বলিলেন না। আফগানিস্থানের সিংহাসনচ্যুত রাজা আমানুল্লা এবং জেরুজালেমের গ্রাণ্ড মুফতি তখন ইতালিতে।

কাউন্ট চানোর কূটনৈতিক কাগজপত্রে এই মন্তব্য পাওয়া গিয়াছে—"সুভাষচন্দ্র বসুকে বৃটিশ বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত, এই মনোভাব পোষণ করিয়াও রিবেণট্রপ মনে করিয়াছিলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক্সিস শক্তিদের পক্ষ হইতে কোন প্রকাশ্য ঘোষণা সমীচীন হইবে না। ফুরের এরূপ কোন কথা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন নাই। রিবেণট্রপের সঙ্গে বসুর যোগ আছে এবং বৃটিশ বিরোধী কার্য্যকলাপে বিভিন্ন বিভাগ সহযোগিতা করিবে।"

হিটলার কেন এই ঘোষণায় রাজী হন নাই তার কারণ নির্দেশ করিয়া চার্চিল বলিতেছেন যে ১৯৪০-এর শেষে জার্মাণীর সঙ্গে রাশিয়ার যে চুক্তি হয় তাহাতে হিটলার স্টালিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে বৃটেন পরাজিত হইলে রাশিয়া ভারতে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং জার্মাণী তাহা মানিয়া লইবে। সুভাষচন্দ্র মার্চ মাসে হিটলারের নিকট ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছিলেন। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন ২২শে জুন। চার্চিলের মতে এই কারণেই হিটলারের পক্ষে তখন ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

এক্সিস শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র বেতার ঘোষণা আরম্ভ করিতে উৎসাহ বোধ করিলেন না। বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মনোভাব জানিবার দিকেই তিনি বেশী ঝুঁকিলেন। তাঁর প্রথম ধারণা ছিল ছোট ছোট প্যারাট্রুপ সৈন্যদল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নামাইয়া দিবেন, উহারা ভারতে বৃটিশ বিরোধী প্রচার চালাইবে এবং ভারতের সংবাদ জার্মাণীতে পাঠাইবে। জার্মাণীর লামস্‌ডর্ফ ক্যাম্পে এবং আফ্রিকার সাইরেনাইকায় বহু ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়া রহিয়াছিল। উহাদের মধ্য হইতে বাছাই করা কিছু লোক মে মাসে বার্লিনে আনা হইল। ইহাদের উৎসাহ দেখিয়া সুভাষচন্দ্র সমস্ত ভারতীয় সৈন্যকে উত্তর আফ্রিকা হইতে জার্মাণী আনিতে বলিলেন। উহাদের আনা হইল। ড্রেসডেনের নিকটে আনাবুর্গ ক্যাম্পে উহাদিগকে রাখা হইল। রিবেণট্রপ ইহাও বলিয়া দিলেন যে ভবিষ্যতে যে সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইবে তাহাদিগকেও এখানে আনিয়া দেওয়া হইবে।

এই প্রস্তুতি চলিতেছে এমনি সময়ে জার্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় প্যারাসুট বাহিনী প্রেরণের পরিকল্পনা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। জার্মানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করিবে। যদি তাহাই হয় তবে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং বার্লিনের দূরত্ব কমিয়া যাইবে, সেখানে যাওয়ায় রাশিয়ার বাধা থাকিবে না। সুভাষচন্দ্রও উৎসাহিত হইলেন এবং রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে জার্মাণীর জয়ের সুযোগ তিনি যাহাতে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে পারেন তার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন গঠন করিয়া জার্ম্মেণীর সাহায্যে উহা নিয়োগ করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—জার্মান সৈন্য যখন স্টালিনগ্রাড জয় করিয়া অগ্রসর হইবে তখন এই ভারতীয় বাহিনী সঙ্গে থাকিলে কাজ হইবে। উজবেকিস্থান ও

আফগানিস্থানে পৌঁছিলে ভারতীয় বাহিনী আরও অগ্রসর হইয়া যাইবে এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বৃটিশ ঘাঁটি বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে। এই ভারতীয় বাহিনীর পিছনে জার্মান ফৌজ পৌঁছিয়া গেলে বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সমগ্র ভারতে বৃটিশ ঘাঁটি অচল হইয়া উঠিবে। সুভাষচন্দ্রের ফৌজ ভারতে প্রবেশ করিলে ভারতেই এক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইবে, সরকারী কর্মচারীদের অনেককে তিনি দলে টানিয়া আনিবেন এবং ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

সেপ্টেম্বর মাসে আনাবুর্গ ক্যাম্পে ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উহাদের সকলে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা সমর্থন করিল না। ডিসেম্বরে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং আনাবুর্গ ক্যাম্পে গেলেন এবং সৈন্যদের নিকট বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় অনেকে বাধা দিল, অনেকে কোন কথাই শুনিতে চাহিল না। তারপর তিনি আলাদাভাবে উহাদের ডাকিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন ইহাদের মনের বাসনা কে কোন অফিসার হইবে, কার কিরূপ সিনিয়রিটি হইবে। দেশের স্বাধীনতা তার অনেক পরের কথা। যুদ্ধের মধ্যে ভারতীয় ব্যাটালিয়নের অফিসারদের পদ মর্য্যাদা জার্মান অফিসারদের তুলনায় কিরূপ হইবে, উভয় অফিসারের সম্পর্কই বা কি হইবে—এ সব প্রশ্নও তাহার মধ্যে ছিল। সুভাষচন্দ্র ইহাদের সঙ্গে দর কষাকষি করিতে অস্বীকার করিলেন। গোলমাল বাধাইয়াছিল অফিসারেরা। সাধারণ সৈনিকেরা সুভাষচন্দ্রকে নেতারূপে মানিয়া নিয়া তাঁর আদেশে বিনা সর্ত্তে চলিতে রাজী হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র ইহাদের নিকট হইতে অফিসারদের সরাইয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে সুফল হইল। জানুয়ারী মাসে দুইটি ভারতীয় বাহিনী গঠিত হইল।

সুভাষচন্দ্রের এই সমস্ত কঠিন কাজে একটি সহকর্মী তাঁহাকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাঁর নাম কুমারী শেঙ্কল। ১৯৩৩-এ ভিয়েনা অবস্থান-কালে এই বিপ্লবী নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। 'ভারতীয় সংগ্রাম' গ্রন্থ রচনায় ইনি তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন। এই মহিয়সী বিপ্লবী নারী ভারতবর্ষকে ভাল বাসিয়াছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে সুভাষচন্দ্রকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছেন। ১৯৪১-এর মার্চ হইতে ১৯৪২-এর জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের কঠোর কাজে সর্ব সময়ে সাহায্য করিয়াছেন কুমারী এমিলি শেঙ্কল। এই সময়ে তিনি বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্য হইতে ২৫ জন সহকারী বাছিয়া নেন। জার্মান বৈদেশিক দপ্তর ইহাদিগকে বাছাই করিয়া

দের। সুতরাং সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ভরযোগ্য মানুষ এখনও একটি রহিলেন—কুমারী শেঙ্কল।

সুভাষচন্দ্র এবার বার্লিনে একটি 'ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ' বা 'স্বাধীন ভারত কেন্দ্র' স্থাপন করিলেন। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর হইতে আজাদ হিন্দ রেডিও প্রচার আরম্ভ করিল। এই বিপদের মধ্যে বসিয়াও সুভাষচন্দ্র ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা ভোলেন নাই। স্বাধীন ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য এই সময়েই তিনি বার্লিনে একটি প্লানিং কমিটি গঠন করেন।

বার্লিনে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। সিগনর অর্লান্ডো মাসোটা নাম নিয়া তিনি কাজ করিতেছিলেন। জার্মানরা তাঁহাকে হিজ এক্সেলেন্সি মাসোটা বলিয়া জানিত। সুভাষচন্দ্র বার্লিন আসিয়াছেন এই সংবাদ জার্মান গভর্ণমেণ্ট তখনও সরকারীভাবে স্বীকার করেন নাই। ১৯৪২-এর জানুয়ারী হইতে প্রকৃত পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন।

ওদিকে জাপান পূর্ব এশিয়ায় দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। জাপানের অগ্রগতির নিকট জার্মাণীর রাশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় জয়লাভের গৌরবও ম্লান হইয়া আসিতেছে। এশিয়ায় তিনটি ঘাঁটির উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে—সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এবং কলিকাতা। এই তিনটি সহর জাপানী হাতে পড়িলে ইংরেজের পক্ষে ভারত রক্ষা সম্ভব হইবে না।

নেতাজী সুভাষ তাঁর গুপ্ত বেতার ষ্টেশন হইতে ঘোষণা করিলেন—

"আমি এতদিন নীরবে ধৈর্য্যের সঙ্গে ঘটনা পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। এইবার আঘাত করিবার সময় আসিয়াছে, আমি এখন সকলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।" ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখে নেতাজী সুভাষ তাঁর বেতার ষ্টেশন হইতে বলিলেন—"আমাদের সকলের সাধারণ শত্রুকে ধ্বংস করিতে যাহারা আমাদের সাহায্য করিবে, এই সংগ্রামে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে আমরা তাহাদের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিব।" এই বক্তৃতা পরদিন জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইহার পর আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গোয়েবলস্ ইহাতে খুশী হন নাই। গোয়েবলস্ তাঁর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—

"ভারতের জনসাধারণকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার মত অবস্থা এখনও আমাদের আসে নাই।" তবে জাপানীরা নেতাজীর যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ শুনিয়া খুশী হইয়াছিল।

নেতাজী জার্মাণী হইতে ক্রিপস মিশনের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইলেন। ওদিকে টোকিও হইতে রাসবিহারী বসুও ক্রিপস মিশন বয়কট করিতে বলিলেন। নেতাজী বলিলেন—ভারতবর্ষ ভারতবাসীর; ইংরেজকে ভারত হইতে বিদায় লইতেই হইবে। ইহার আগে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো দুইবার ঐ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

জাপান প্রস্তাব করিল—জার্মাণী, ইতালী এবং জাপান তিনজনে মিলিয়া ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি ঘোষণা করিবে। সেই সঙ্গে তাহারা নেতাজীকে জাপানে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইল। নেতাজী জাপানের প্রস্তাব আন্তরিকতার সহিত মানিয়া নিলেন এবং হিটলার মুসোলিনীও যাহাতে উহা গ্রহণ করেন তার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ২৯শে এপ্রিল হিটলার এবং মুসোলিনী ওবেরসালজ্‌বুর্গ বৈঠকে জাপানী প্রস্তাবটি আলোচনা করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন—এইরূপ ঘোষণার সময় এখনও আসে নাই।

নেতাজী তখন রোমে। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া মুসোলিনীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। ৫ই মে চানো তাঁহাকে মুসোলিনীর কাছে নিয়া গেলেন। ইহার আগে মুসোলিনী চানোকে বলিয়াছেন—এইরূপ ঘোষণায় রাজি হইলে জাপানের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে, ভারতকে স্বাধীনতা দানের কৃতিত্ব একা জাপান গ্রহণ করিবে।

মুসোলিনীর সঙ্গে নেতাজীর কথাবার্ত্তার এই বিবরণ কাউন্ট চানো তাঁর ডায়েরীতে দিয়াছেন:

"বসুর যুক্তি তর্কে অবশেষে মুসোলিনী ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ত্রিদলীয় ঘোষণায় রাজী হইলেন। সালজবুর্গ সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া তিনি জার্ম্মেনীকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন যে ঐ ঘোষণার জন্য জার্ম্মেনী যেন অবিলম্বে প্রস্তুত হয়।"

মুসোলিনী নেতাজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন বলিয়া এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হিটলারকে জানাইলেন যে "বসুকে তিনি পাল্টা গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে এবং আরও প্রকাশ্যে কাজে নামিতে বলিয়াছেন।"

মুসোলিনীর ধমক খাইয়া ১১ই মে তারিখে গোয়েবেলস লিখিতেছেন:

"আমরা এই প্রস্তাবটি বিশেষ পছন্দ করিতেছি না, কারণ আমাদের মনে হয় এইরূপ রাজনৈতিক চাল দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। তবে একথা বোঝা যাইতেছে এইরকম একটা কাজে হাত দিবার জন্য জাপানীরা অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়াছে। যাই হোক প্রবাসী

গভর্ণমেন্টের বেশীদিন ক্ষমতাহীন হইয়া থাকা ভালো নয়। যতক্ষণ তাহারা কিছু বাস্তব ক্ষমতা খাটাইতে না পারে; ততক্ষণ তাহাদের অস্তিত্ব কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়।"

হিটলারেরও এই মত ছিল। নেতাজী মুসোলিনীর মত পরিবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু হিটলারের মত বদলাইতে পারিলেন না।

২৯শে নেতাজী হিটলারকে তাঁর সামরিক হেড কোয়ার্টারে গিয়া ধরিলেন। তিনি হিটলারকে বলিলেন—ভারতে তাঁর যে জনপ্রিয়তা এবং যোগাযোগ আছে তার সাহায্যে তিনি বাহির হইতে প্রচারকার্যের দ্বারাই সমগ্র ভারতকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারিবেন। ভারতে আর কখনও বিদ্রোহের বারুদ এত স্তূপীকৃত হয় নাই। সামান্য একটু চকমকি ঠুকিলেই ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। হিটলার বলিলেন—

"সুশৃঙ্খল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েক হাজার সৈন্যের বাহিনী নিরস্ত্র কয়েক লক্ষ বিপ্লবীকে সায়েস্তা করিতে পারিবে; বাহিরের কোন শক্তি দুয়ারে আঘাত না করিলে ভারতে কোনরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তন আসিবে না। জাপান তার ক্ষমতার শেষ সীমায় পেঁছাইয়া যাইতেছে।"

হিটলার নেতাজীকে দেয়ালে টাঙ্গানো একটি ম্যাপের কাছে নিয়া গেলেন। রাশিয়ায় জার্মানরা কোথায় আছে এবং ভারত হইতে তাহারা কতদূরে তাহা দেখাইলেন। তিনি বলিলেন—

"ভারত সম্বন্ধে কোন ঘোষণা এখনই করিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা হইবে। রোমেল শীঘ্রই মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন, সেই ঘোষণা তিনি কার্যে পরিণত করিতে পারিবেন কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা এখনও বহু দূর।"

নেতাজী প্রায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন—ইউরোপে আর কোন আশা নাই। ত্রিদলীয় ঘোষণা ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হইতে পারিবে না। ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং তার আশা না দেখিয়া নেতাজী খুব দমিয়া গেলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন—রোম এবং প্যারিসে স্বাধীন ভারত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া লাভ হইবে না, ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের মধ্য হইতে পূর্ণ তিন হাজারের ফৌজ গঠন করিয়াও কোন কাজ হইবে না, জার্মেনী জয়ী হইলে তাহার শক্তির নিকট ঐ ফৌজ সমুদ্রে বিন্দুবৎ হইয়া যাইবে। জার্মেনী যদি ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি এখনই না দেয় তবে পরে কি করিবে কে জানে?

নেতাজী এইবার প্রাচ্যের দিকে ঝুঁকিলেন। হিসাব করিয়া দেখিলেন এশিয়ায় গেলে তবু আশা আছে, পূর্ব এশিয়ায় ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের সাহায্য

তিনি পাইবেন। রাসবিহারীও ইতিমধ্যে তাহাদিগকে অনেকটা সংগঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে সেখানে যাওয়ার ডাক দিয়াছে। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে নেতাজীর নাম যখন সকলের মুখে সেই সন্ধিক্ষণে তিনি সেখানে সংবাদ পাঠাইলেন—"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক অখণ্ড সংগ্রাম। একটি মাত্র সংগঠনের অধীনে বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীনতাকামী ভারতীয়কে টানিয়া আনিতে হইবে।"

নেতাজীর এই বাণী জুন মাসে ব্যাঙ্কক টাইমসে প্রকাশিত হইল।

নেতাজী বলিলেন—শুধু পরের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসীকেই আনিতে হইবে।

এইভাবে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। নেতাজী সুভাষ ইউরোপ হইতে তাঁর তীব্র প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। ভারতে সুরু হইল আগষ্ট আন্দোলন।

এই সময়ে নেতাজীর ব্যক্তিগত জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। গোয়েবলস কোন সময়েই তাঁর উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন না। ইংরেজ পরাজিত হইলে ভারত জার্মেনীর অধিকারে আসিবে ইহা যাহারা বিশ্বাস করিতেন তাহাদের মধ্যে গোয়েবলস প্রধান। যুদ্ধ শেষে ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতিতে জার্মেনী ইতালী জাপান তিনজনকেই বাঁধিয়া নেওয়ার জন্য নেতাজী যে চেষ্টা করিয়াছিলেন গোয়েবলস তাহাও ভাল চোখে দেখেন নাই। মুসোলিনী নেতাজীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি রীতিমত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নেতাজীর প্রতি হিটলারেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। উহা নষ্ট করিবার মতলবে গোয়েবলস নেতাজীর নামে কুৎসা রটনা সুরু করিয়া দেন। নেতাজী যে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার এমন একজন বিশ্বস্ত সহচর প্রয়োজন হইয়াছিল যার সহিত তিনি পরামর্শ করিতে পারেন। কুমারী শেঙ্কল এই কাজ করিতে থাকেন। তিনি নারী বলিয়া গোয়েবেলসের পক্ষে নেতাজীকে ছোট করিবার চেষ্টা সহজ হয়। উভয়ে তখন বিবাহ করেন। দশ বৎসরের ঘনিষ্ট পরিচয়েও তাঁহাদের মনে বিবাহের ইচ্ছা উদিত হয় নাই। দুজনে এক প্রাণ হইয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াও তাঁহারা বিপ্লবী আদর্শ হইতে অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ইউরোপে তাঁহাদের কর্মতৎপরতা কিছুমাত্র কমিল না। এশিয়া যাত্রায় ডাক যখন আসিল তখন এক বৎসরের শিশু কন্যাকে ফেলিয়া সাবমেরিনে উঠিতে নেতাজীর হৃদয় একটুও কাঁপিল না,

তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণীও তাঁহাকে পিছনে টানিলেন না। রাজপুত রমণীর মতই তাঁহাকে বিদায় দিলেন। একজন আমেরিকানের নিকট এই ঘটনা শুনিয়াছিলাম। তিনি অস্ট্রিয়ায় ইহা শুনিয়াছেন। ঘটনা পরম্পরার সহিত সামঞ্জস্য দেখিলে ইহা অবিশ্বাস করা কঠিন।

ইকবাল শেদাই নামে এক ভারতীয় মুসলমান ইতালিতে বন্দী ভারতীয় সৈন্য নিয়া একটি ভারতীয় ফৌজ গঠন করে। ১৯৪১-এ এই ব্যক্তি বহুবার নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করে কিন্তু তিনি তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। শুধু তাই নয়, নেতাজীর সঙ্গে ইতালি এবং জার্মেনীর চুক্তি হইয়াছিল যে সমস্ত বন্দী ভারতীয় সৈন্যকে জার্মেনী পাঠানো হইবে এবং সেখানে তাহারা নেতাজীর নেতৃত্বে চালিবেন। ইকবাল এই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ইতালিতে ভারতীয় ফৌজ গঠনের চেষ্টা করে এবং আলাদাভাবে রোম হইতে গুপ্ত বেতারে প্রচার চালাইতে আরম্ভ করে। এল আলামাইনের পথে পলাতক কয়েকশত ভারতীয় সৈন্যকে ইকবাল ইতালিতে নিয়া আসে। ১৯৪২-এর এপ্রিল হইতে নভেম্বরের মধ্যে ইকবাল এই কাজ চালাইতে পারে। তারপর উহার ফৌজে বিদ্রোহ ঘটে এবং ফৌজ ভাঙ্গিয়া যায়।

ইকবালের কার্যকলাপ দেখিয়া ইহার পরিণতি নেতাজী আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই কারণে উহাকে কোনরূপ সমর্থন দেন নাই। তাঁহার নিজের হাতের তৈরী আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, এমনকি জার্মান সেনাধ্যক্ষেরাও উহাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১৯৪১-এ নেতাজী দুজন সিভিলিয়নকে সৈন্য সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন—এন. জি. স্বামী এবং আবিদ হাসান। ইহারা আনাবুর্গ ক্যাম্পে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্য হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন সৈন্য সংগ্রহের কাজে তাঁহারা বল প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং নেতাজীর বিরুদ্ধে কথা বলিলে ফৌজের স্বেচ্ছাসেবকরাই তার প্রতিবাদ করে এরূপ ঘটনা বহু ঘটিয়াছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বেতার যন্ত্র পরিচালনা, ঘোড়ায় চড়া, বাড়ী ঘর ভাঙিয়া ফেলা, পাহাড়ে যুদ্ধ এবং প্যারাশুট সাহায্যে অবতরণ শিক্ষা দেওয়া হইত। নেতাজী স্বয়ং উহা তদারক করিতেন।

যোকেন যখন মিশরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন তখন প্রস্তাব হইল

রেঙ্গুন বিমান বন্দরে সর্বাধিনায়ক নেতাজী

আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু সৈন্য সেখানে ভারতীয় বাহিনীর নিকট বৃটিশ বিরোধী প্রচারের জন্য পাঠানো হইবে। মুসোলিনী ও হিটলার একসঙ্গে ব'সয়া মিশরের ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কাউন্টচানো মিশরের স্বাধীনতার ঘোষনার পত্র রচনা শেষ করিয়াছেন। নেতাজীও এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিলেন কিন্তু রোমেল জানাইলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রচার কার্য্যের কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না।

স্টালিনগ্রাড এবং এল আলামিনে জার্মান অগ্রগতি বাধা পাইল। আজাদ হিন্দ ফৌজে তখন পূর্ণবেগে সৈন্য সংগ্রহ চলিতেছে। জার্মানরা উহা আরও বাড়াইবার জন্য চাপ দিতেছে। ১৯৪৩-এর জানুয়ারীর মধ্যে দুইটি ব্যাটেলিয়ান গঠন সম্পূর্ণ হইল। ফেব্রুয়ারীতে তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান তৈরী শুরু হইল। সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের বেতন দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিল। জার্মান বৈদেশিক দপ্তর হইতে বৃটিশ বিরোধী কাজের জন্য নেতাজী যে টাকা পাইতেন এতদিন উহা হইতেই সৈন্যদের বেতন দিয়েছেন। সৈন্য সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে ঐ টাকায় আর কুলাইত না। জার্মানরা প্রস্তাব করিল যে সৈন্যদের বেতন উহারাই দিবে তবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে হিটলারের নিকট আনুগত্যের শপথ নিতে হইবে। নেতাজী বাধ্য হইয়া রাজী হইলেন। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম শপথ অনুষ্ঠান হইল।

১৯৪২-এর জানুয়ারীতে ইউরোপ প্রবাসী বামপন্থী সাংবাদিক এ, সি. এন. নাম্বিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি প্রায় ১৮ বৎসর ইউরোপ ছিলেন। নাম্বিয়ার প্রচার কার্য্যের দিকটা ভালভাবে সংগঠন করিলেন।

নেতাজীর স্বাধীন ভারত কেন্দ্রকে (Free India Centre) জার্মানরা কার্য্যতঃ স্বাধীন দেশের গভর্নমেন্টরূপে মানিয়া নিয়াছিল। প্রচার কার্য্য পরিচালনার জন্য টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিল। নেতাজীকে তাহারা একটি বাড়ি, একটি গাড়ী এবং ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ৮০০ টাকা দিত। স্বাধীন ভারত কেন্দ্রের জন্য তাহারা ১৯৪১-এ দেয় ১২০০ টাকা। ১৯৪৪-এ উহা বাড়াইয়া ৩২০০ পর্য্যন্ত করে। নেতাজী টাকাটা ঋণ হিসাবে নিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ভারত স্বাধীন হইলেই তিনি উহা শোধ করিবেন। স্বাধীন ভারত কেন্দ্রের প্রাণ ছিলেন এমিলি শেঙ্কল।

আট মাস ধরিয়া নেতাজীর জাপান যাত্রার প্রস্তুতি চলিল। স্থলপথে যাওয়া অসম্ভব, বিমান পথও নাই। একমাত্র উপায় জলপথ। খোলা জাহাজে

যাওয়া নিরাপদ নহে, সুতরাং সাবমেরিণ ছাড়া পথ নাই। যাত্রার ব্যবস্থা করিতে কর্নেল যামামাতো তুরস্ক ও রাশিয়া হইয়া ১৯৪২-এর নভেম্বরে জাপান চলিয়া গেলেন।

নাম্বিয়ার ডেপুটি লীডার হইলেন। নেতাজী তাঁহাকে ইউরোপের কাজ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজকে যেন যথা সম্ভব কাজে লাগানো হয়, যত শীঘ্র সম্ভব যেন জার্মান কমাণ্ডারদের স্থলে ভারতীয় কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয় এবং সাম্প্রদায়িকতার কোনরূপ প্রশ্রয় না দেওয়া হয়।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩ তারিখে বার্লিনে স্বাধীনতা দিবস পালিত হইল। ছয়শত অতিথি উপস্থিত রহিলেন। জাপান যাত্রার সংবাদ তিনি গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর দুইটি বক্তৃতা রেকর্ড করিয়া রাখা হইল, তিনি চলিয়া যওয়ার পর উহা বেতারে প্রচারিত হইবে।

১৯৪৩-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানীর কিয়েল বন্দর হইতে সাবমেরিন সমুদ্রে ডুব দিল। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া মাদাগাস্কারের ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাবমেরিণ ভাসিয়া উঠিল। সেখানে একটি জাপানী সাবমেরিণ নেতাজীকে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ২৮শে এপ্রিল একটি রবারের ডিঙ্গির সাহায্যে নেতাজী এবং আবিদ হাসান জাপানী সাবমেরিণে উঠিলেন। জাপানী সাবমেরিণ ভারত মহাসাগরের তলা দিয়া গিয়া সুমাত্রার উত্তরে সাবাং-এ গিয়া ভিড়িল। নেতাজী সেখানে অবতরণ করিলেন।:

১৬ই জুন নেতাজী টোকিও পৌছিলেন। ১৮ সপ্তাহের চঞ্চল্যকর এবং বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথ শেষ হইল। সাবমেরিণের ভিতরে ছোট্ট একটুখানি জায়গায় এই দীর্ঘ সময় তাঁহাকে কাটাইতে হইয়াছে। নড়িবার স্থান নাই, করিবার মত কোন কাজ নাই। ইহারই মধ্যে নেতাজী তাঁর 'ভারতের সংগ্রাম' গ্রন্থের নূতন সংস্করণ তৈরী করিতে লাগিলেন। ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসে বইটির পুরাতন সংস্করণ পুণর্মুদ্রিত হইয়া মার্কেয় প্রকাশিত হয়।

শারদীয়া "যুগবাণী" ১৩৬৬তে প্রকাশিত 'নেতাজী সুভাষ' হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত সংকলিত।

॥ 'আই. এন. এ-র শেষ অঙ্ক ও ভারতের স্বাধীনতা' ॥

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র

১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। জার্মানীরা বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আই. এন. এ-র অনেককেই বাধ্য হয়ে য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে জার্মানীতে ফিরে আসতে হ'ল। ফেরার পথে প্রায় দুশো অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেল অকালে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের শেষে দক্ষিণ জার্মানীতে কয়েকজন ধরা পড়লেন। সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে লেক কনস্টানসে একদলের একশ' পঞ্চাশ জনকে একটা সিনেমা হলে অনাহারে সারারাত্রি আটক রেখে পরের দিন তাদের ফরাসী সৈন্য দিয়ে গুলি করে মারা হ'ল। বাকী সৈন্যদলের বন্দী অবস্থায় অনেকেই মৃত্যু বরণ করলেন। ইতিহাসে সে কাহিনী আজও অজ্ঞাত। দূর প্রাচ্যে ১৯৪৫ সনের ১৩ই মে অই. এন. এর সৈন্যরা পেগু সহরে আত্মসমর্পণ করবার পর ১৯৪৬ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের মিলিটারী সেক্রেটারী জানালেন "আই. এন. এর ২৭ জন বন্দী অবস্থায় মারা গেছে। ক্যাপ্টেন মাধব সিং ও লেঃ আজমীর সিং আত্মহত্যা করেছেন আর ৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।" সঠিক তথ্য নির্ণয়ও শক্ত। আই. এন. এ-র এই বিশ্বাস অখণ্ড আত্মত্যাগ পরায়ণ প্রেমের দীক্ষা ও শক্তিপূর্ণ গৌরবে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও শেষ অধ্যায়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৪২ সনের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। তার আগে বিপ্লব আন্দোলনও ব্যর্থ হয়ে যায়। কংগ্রেস তখন দলাদলি, ঈর্ষা ও ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ, কর্মে মুমূর্ষু। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে সারা যুদ্ধে ভারতবর্ষের ১৬,৪০০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১২৭৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং পাউণ্ড ব্যয় হয়েছে।

কিন্তু ভারতবাসীর মনে আই. এন. এ-র প্রভাব তাদের সাধনা, তাদের শৌর্য ও ত্যাগ তখন সিংহাসন পেতে বসেছে। তাদের সেদিন প্রত্যক্ষ ধারণা হয়েছে যে দেশপ্রেমের জন্ত দুঃখ যথার্থ ঐশ্বর্য। তাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্ধে মহীয়ান করে তোলে।...... যুদ্ধ জিতলেও ইংরেজের শক্তি তখন অবনমিত সূর্য্যাস্তের মত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার সম্মান তখন দ্বিতীয় স্তরে নেমে এসেছে। একদিকে আমেরিকা অন্তদিকে রাশিয়া তখন শক্তিমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মুখে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পতনের সভাপতিত্ব করতে না চাইলেও ১৯৪৫ সনের ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেখা গেল তাঁর মন্ত্রীত্বে আর লোকের আস্থা নেই। হ'ল শ্রমিক দলের নিরঙ্কুশ জয়লাভ। মিঃ ক্লিমেণ্ট এটেলী প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড পেথিক লরেন্স ভারত সচিব হয়ে বসলেন।

এ সময় ব্রিটিশ সৈন্যেরা দেশে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। বর্মা, সিঙ্গাপুর, ও মালয়ের যুদ্ধে ইংরেজের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করার সাধ্য ইংলণ্ডের আর ছিল না।......আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকপ্রিয়তা ও আদর্শ ভারতীয় সৈন্যদের মনে রেখাপাত করেছে। কাজেই ইংরেজ বুঝল যে ভবিষ্যতে কোন বিদ্রোহ দমনে সেই সব সৈন্য নিয়োগের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা আছে। ইংরেজের কর্তারা বুঝেছিলেন যে অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতবাসীর মনে যে দেশাত্মবোধ জেগেছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তারা চায় ইংরেজ শাসনের অবসান। জাপানের আক্রমণে দূর প্রাচ্যে ইংরেজের নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস প্রায়। কাজেই আমেরিকার চাপে চীন ও রাশিয়ার ইচ্ছেয় আর ভারতবাসীর মনোভাবের পরিবর্তনে ও সৈন্যবাহিনীর উপর আই. এন. এ-র প্রভাবের ফলে ইংরেজ শেষ পর্যন্ত ভারতকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হ'ল। কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করেছে এ কথা বললে শুধু সত্যের অপলাপ নয় ইতিহাসকেও অস্বীকার করা হবে।

কিন্তু স্বাধীনতা দেবে কার হাতে? ১৯৪৫ সালের ২১শে আগষ্ট ইংলণ্ডের সম্রাট ঘোষণা করলেন যে ভারতকে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়া হবে এবং তার জন্যে ভোট নির্বাচন শীতকালের মধ্যে শেষ করতে হবে।...

ভোট নির্বাচনের আগে হিন্দু ও মুসলমান দুই দলই সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল।...

তখন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়। ১৯৪২ সনের পর তাদের সংগঠনের কাঠামো গেছে ভেঙ্গে। এ শোচনীয় দুর্দিনে ইংরেজের অবিমৃষ্যকারিতার সুযোগ পেয়ে গেল কংগ্রেস। ১৯৪৪ সনের মে মাস থেকে অক্টোবরের মধ্যে রেঙ্গুন থেকে দশ হাজারের বেশী বন্দী সৈন্যকে ভারতে আনা হ'ল। আই. এন. এ-র যে সমস্ত সৈন্য ধরা পড়েছিল ও যারা আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের সঙ্গে বিচারের জন্যে সেপ্টেম্বর মাসে মালয় ও ব্যাংকক থেকে আরও প্রায় ৭০০ সৈন্য আনবার কথা উঠল। এদের সকলকে এনে বিচারের বন্দোবস্ত করতে ১৯৪৬ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লেগে গেল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সব

সৈন্সরা ধরে পড়েনি, কিছু আত্মগোপন করে রয়ে গেল। যুদ্ধে অসীম দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কথা ভারতের মাটিতে ব্যাপক-ভাবে আসবার ফলে তাদের কেন্দ্র করে শুধু গণদাবিই দেখা দিল না, ভারতীয় সৈন্সবাহিনীও হয়ে উঠলো তাদের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল।

আই. এন. এ র বিরুদ্ধে রাজার প্রতি বিদ্রোহ ও নির্দয়তার অভিযোগ এনে সরকার বলল যে যে সমস্ত সৈন্স চাপে পড়ে, বিপথে চালিত হয়ে শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হবে। যারা দলের নেতা ও যাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আছে তাদেরই সামরিক আদালতে সোপর্দ করা হবে। কংগ্রেস প্রথমে এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি কিন্তু আসন্ন ভোট যুদ্ধের অনিশ্চয় ফলাফলের আশঙ্কায় ও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সারা ভারতের অগণিত জনগনের মনোভাবের অবস্থা দেখে নেতাদের হল চৈতন্সোদয়। তাঁরা বুঝলেন যে কংগ্রেস এই জনমতকে উপেক্ষা করলে আর কোনোদিনই তার সংহতি রক্ষে করতে পারবে না। তাই যে পণ্ডিত নেহরু অহিংস নীতির পাণ্ডা হয়ে বলেছিলেন যে 'সুভাষ এলে আমি তাঁকে গুলি করে মারব' তিনিও দায়ে পড়ে এদের সমর্থন করে বললেন যে "এই সমস্ত সৈনিক দেশের স্বাধীনতার জন্স সংগ্রাম করেছে।" অহিফেনসেবীদের তন্দ্রা তখন গেছে ভেঙ্গে। তাদের বাস্তবের সঙ্গে সেদিন মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। তাই ইংরেজ শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রধান সেনাপতির অনুরোধে পরীক্ষামূলক-ভাবে তিনজন অফিসার—একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন শিখের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত করল।

কংগ্রেস এ সুযোগে এবং আসন্ন নির্বাচনের সাফল্য কামনায় ভারতের তদানীন্তন একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবি শ্রীবুলাভাই দেশাইয়ের(১) নেতৃত্বে একটি ডিফেন্স কমিটি গড়ে তুলল। প্রাক্তন সেনানায়ক শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলন হলেন এ মামলার আসামী। আসামী পক্ষে ছিলেন সতেরোজন কৌসুলী(২)। আজও মনে পড়ে ১৯৪২ সনের ১৩ই এপ্রিল পণ্ডিত নেহরু কলকাতায় বলেছিলেন যে 'সুভাষ আমার পুরানো বন্ধু কিন্তু তাঁর পথ ভ্রান্ত, আমি তার বিরোধিতা না করে পারি না।' কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁকে বলেছিলেন 'পঞ্চম বাহিনীর লোক'। সর্দার প্যাটেল আদেশ দিয়েছিলেন 'সৈন্স ব্যারাক থেকে সুভাষের ছবি সরাতে হবে।' পণ্ডিত নেহরু গোপনে এঁদের কার্যকলাপের ও বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেও (mosley P-137) রাইফেল হাতে নিয়ে গুলি করার পরিবর্তে লোক দেখানো গাউন গায়ে ডিফেন্স কমিটির মধ্যে

বসলেন। ৫ই নভেম্বর দিল্লীর লালকেল্লায় বিচার আরম্ভ হয়ে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুনানি চলল। আসামী পক্ষ থেকে বিচারের এক্তিয়ার সম্পর্কে সরাসরি তোলা হ'ল আইনের প্রশ্ন। শ্রীবুলাভাই দেশাই ওজস্বিনী ভাষায় আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে বললেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ যথাযথভাবে গঠিত ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত সরকারের সামরিক বাহিনী। আর প্রাণদণ্ড অপরাধের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। আসামী পক্ষের জেরায় সরকার পক্ষের একজন সাক্ষী (৩) স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বলে বলল যে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনা হয়েছে।

...শ্রীবুলাভাই দেশাই বললেন, "এ বিচারশালায় আমরা প্রমাণ করছি আজাদ হিন্দ ফৌজের মান, মর্য্যাদা, বিধি বিধান ও পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার(৪)। এমন কি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচারের কথা মনে পড়িয়ে দেওয়া হল। সেদিন সত্যই ছিল ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে ভারতের শাসক মণ্ডলীর ইচ্ছাশক্তির লড়াই।

বিচারে তিনজনেরই বরখাস্তের হুকুম হল। আর হ'ল যাবজ্জীবন কারাগারের দণ্ড। কিন্তু ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড্ অকিনলেক ১৯৪৫ সনের ২৬শে নভেম্বর বড়লাটকে লিখলেন—

"...I am not in doubt myself that a great number of them (I. N. A.) especially the leaders, believed that Subhas Chandra Bose was genuine patriot and that they themselves were right to follow his lead. There is no doubt at all from the mass of evidence we have that Subhas Chandra Bose acquired a tremendous influence over them and that his personality must have been an exceedingly strong one.

এ লিখেও তিনি থামেন নি। ১৯৪৬ সনের ২২শে জানুয়ারী বললেন

"...I know from my long experience of Indian troops how hard it is even for the best and most sympathetic British Officer to gauge the inner feelings of the Indian soilders and history supports me in the view. I do not think any senior British officer to day knows what is the real feeling among Indian rank regarding the I.N.A. I myself feel from my own instinct largely

but also from the information I have had from various sources and there is a growing feeling of symathy for the I.N.A.···It is impossible to apply our standard of ethics to this problem or to shape our policy as we would, had the I.N.A. been men of our own race." (Jayasree, Chaitra, 1371 B.S.) তিনি বললেন সুভাষচন্দ্র বসুর অসাধারণ নেতৃত্বে আই. এন. এ পরিচালিত হয়েছে, দেশপ্রীতি তাদের অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তিনি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মুকুব করে দিলেন।

আজও মনে পড়ে এ বিচার আরম্ভ হবার আগে নভেম্বর মাসে কলকাতায় এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন—১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আব্দুল রসিদের মুক্তি প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন।······এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষে 'ইংরেজ শাসনের অবসান ঘনিয়ে তুলল যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য বিড়ম্বনার ভেতর দিয়ে নয়, বজ্রনির্ঘোষে ভেঙ্গে যাওয়ার ভেতর দিয়ে।' শ্রীদীলিপ কুমার রায়ের ভাষায় "দিল্লীর রাজপথে গান গেয়ে বীর বিক্রমে চলেছে ভারতীয় ফৌজ তার বিস্ময়কর চমকের সঙ্গে সুভাষের অকস্মাৎ মহামহিমান্বিত মূর্তি মিলে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে যেন ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল। এতদিন নিজের চারিদিকে ভারতীয় ফৌজ যে প্রাচীর তুলে রেখেছিল, অচিরে স্বাধীনতা লাভের দাবীতে জনসাধারণের উৎসাহের জোয়ারে সে প্রাচীর বহুলাংশে ধ্বসে পড়ল।"

(দুই)

এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ সরকার করল নতুন প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত। ৪ঠা ডিসেম্বর হাউস অফ্ লর্ডসে ভারতসচিব ঘোষণা করলেন যে একটি পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন শীঘ্রই ভারতে পাঠানো হবে। তাঁরা দেশের নেতা ও বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মনোভাব বুঝবেন এবং যাতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হিসেবে ভারত তার পূর্ণ অধিকার পায় তার ব্যবস্থা করবেন।

১৯৪৬ সনের ৫ই জানুয়ারী প্রফেসর রবার্ট রিচার্ডের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের দশজন সদস্য ভারতে এসে পৌঁছুলেন।

১৯৪৬ সনের ২৮শে জানুয়ারী বড়লাট ঘোষণা করলেন যে তিনি কর্মসংসদ স্থির করবেন আর খুব শীঘ্র গড়ে তুলবেন একটি সংবিধান রচনাকারী পরিষদ। কিন্তু, ক'দিনের মধ্যেই একজন ব্রিটিশ অফিসার জনৈক ভারতীয় বৈমানিককে অপমান করার ফলে বিমান বাহিনীর সৈন্যদের এক অংশ ধর্মঘট করে বসলেন বোম্বাইয়ে;......প্রায় ১৫০০ জনের বেশী যুগ-সচেতন বৈমানিক যোগ দিলেন এ ধর্মঘটে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর সৈন্যদের ও ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সভ্যদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য থাকায় দিন দিন ঘনিয়ে উঠছিল নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্যের অসন্তোষ।......

প্রথম বন্দী হ'লেন রেডিও অপারেটর শ্রীদত্ত, তাঁকে কম্যুনিস্ট সন্দেহে বন্দী করা হ'ল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সমস্ত ব্যারাকের সৈন্যরা করে বসল ধর্মঘট। রাজকীয় নৌবহরের একটি অংশ বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সহরে বেঁধে গেল গোলমাল। অ্যাডমিরেল গডফ্রে বললেন তাঁদের আত্মসমর্পন করতে কিন্তু কোন ফল হল না। ব্রিটিশ অফিসার মিঃ রথরয় এলেন তাঁদের কি দাবী জানবার জন্যে। তাঁরা উত্তর দিলেন বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ, ব্রিটিশ অফিসারের পরিবর্তে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ, ভাল আহার্য, ব্রিটিশ সৈন্যদের সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা, রাজবন্দীদের মুক্তি, আই. এন. এ-র বন্দীদের মুক্তি আর ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা। তিনি আখ্যা দিলেন কতকটা 'দেউলে হওয়া বর্তমানে সাবেক কালের চেকের মত'। সেইদিনই 'ক্যামিলা' জাহাজ থেকে বন্দী করা হ'ল ৩০০ জনকে। ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ করলেন ব্যারাক অবরোধ। ২১শে ফেব্রুয়ারী একজন নৌ-সৈন্যকে ব্যারাক থেকে বেরুবার সময় গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ......'সিন্ধ' জাহাজে চারজন নৌ-সৈন্য প্রাণ দেবার ফলে মীমাংসা না হয়ে সংগ্রাম রইল অব্যাহত।

অন্য অন্য বন্দরেও এ সংবাদ পড়ল ছড়িয়ে। থানার কাছে 'আকবর' জাহাজে ও ক্রমে ক্রমে করাচি, কলকাতা, বিশাখাপত্তম ও অন্যান্য বন্দরেও আরম্ভ হয়ে গেল ধর্মঘট। ২১শে ফেব্রুয়ারী রাজকীয় নৌবহরের সমস্ত সৈন্য যোগ দিলেন আন্দোলনে। ২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের কল-কারখানার শ্রমিকেরা সহানুভূতি দেখিয়ে করল ধর্মঘট। ......পুলিশ শান্ত ধর্মঘটীদের উপর গুলি চালিয়ে দিল।......ফলে দুপক্ষেরই বেঁধে গেল সংগ্রাম। এ বিদ্রোহ দমন করতে সৈন্যরা অস্বীকার করে বসল দুর্লঙ্ঘনীয় আত্মপ্রত্যয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনিং কোরে ভবিষ্যতের নেতাজী ১৯১৭

……শেষ পর্যন্ত বল্লভভাই প্যাটেলের কথায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলেন কিন্তু সর্দার প্যাটেল তাঁদের অসঙ্গত বিচার ও অহেতুক দণ্ড বন্ধ করতে পারলেন না। ইংরেজ বুঝল তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হয়েছিল নৌ-বিদ্রোহ ১৯শে ফেব্রুয়ারী হাউস অফ লর্ডসে লর্ড পেথিক লরেন্স ও হাউস অফ কমন্সে প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটেলী বললেন যে দেশের একান্ত প্রয়োজনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবেন; তাতে থাকবেন তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী। তাঁরা ভারতের বড়লাট ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত করবেন সে অনুসারে কাজ হবে। এ মিশনে ছিলেন ভারত সচিব স্যার পেথিক লরেন্স, বোর্ড অফ ট্রেডের সভাপতি স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্ আর. ফার্ষ্ট লর্ড অফ এডমিরেলটি মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার।

১৯৪৬ সনের ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন নিউ দিল্লী পৌঁছুলেন।… …১৯৪৬ সনের ১৬ই মে ক্যাবিনেটে মিশন নিজেদের প্রস্তাব ও প্ল্যান দিলেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেরও তাতে সম্মতি ছিল। তাঁরা বললেন অবিলম্বে একটি মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠন করে তাদের উপর দেশের শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত হবে এবং তাঁরাই ভবিষ্যত সংবিধান রচনা করবেন। সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালীন সরকার দেশের শাসন পরিচালনা করবেন।……১৯৪৬ সনের ২৯শে জুন ক্যাবিনেট মিশন ভারত ছাড়লেন।… ১৯৪৬ সনের ৬ই জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণযোগ্য বলে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কেবল কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দল বিরোধিতা করল।……৭ই জুলাই দিল্লীর লাল কেল্লায় নেতাজীর বিশ্বস্ত অনুচর শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র গুহ অত্যাচারের ফলে রোগে প্রাণ দিলেন।

…মধ্যবর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের ২রা সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। (লর্ড ওয়াভেল এই সরকারে চোদ্দজনের সদস্য মনোনয়ন দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন মিঃ নেহরু ও মিঃ জিন্না)।

……১৯৪৬ সনের ২১শে নভেম্বর কলকাতায় আজাদ-হিন্দ-বন্দী প্রতিবাদ দিবসে পুলিশের বুলেটে প্রাণ দিলেন শ্রীরামেশ্বর ব্যানার্জি।

সর্দার প্যাটেলই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের পক্ষে দেশ বিভাগে স্বীকৃতি

জানালেন। (বুদ্ধির খেলায় মিঃ লিয়াকত আলী খাঁর কাছে পর্যুদস্ত হওয়াই এর গূঢ় কারণ।)

১৯৪৭ সনের ২৭শে মার্চ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন (লর্ড ওয়াভেলের স্থলে) বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

সর্দার প্যাটেল দেশ বিভাগে রাজী হয়েছেন এবং বড়লাটের কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন জানতে পেরে মৌলানা আজাদ অসুস্থ অবস্থাতেই গেলেন পণ্ডিত নেহরুর কাছে। পণ্ডিত নেহরু প্রথম থেকেই দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন—তিনি এই নিয়ে মিঃ জিন্নাকে বার বার বিদ্রূপ করেছেন—(তবুও) সর্দার প্যাটেলের অনুরোধে পণ্ডিত নেহরু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করে দেশ বিভাগে সম্মতি দিয়েছিলেন।

সেদিনের নেতারা গোপনে ভারত বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফুর খাঁ সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক সেই সীমান্ত গান্ধী পর্যন্ত এ ব্যাপার জানতেন না।······ঠিক এমনি করেই কংগ্রেস মিঃ জিন্না, শ্রীনরীম্যান, শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু, শ্রীবুলাভাই দেশাই ও শেষ পর্যন্ত খান আবদুল গফুর খাঁয়ের সঙ্গে একই ব্যবহার করল।

*　　　　*　　　　*

ভারতের দুর্ভাগ্য সেদিনের কংগ্রেসকে ঠিক পথে চালিত করবার জন্যে চিন্তাশীল কোন নেতার আগ্রহ দেখা গেল না। তাঁরা নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষার দিকেই সচেতন হয়ে রইলেন। দেশ বিভাগের আসন্ন ফল যে কি হতে পারে তা বোঝবার দূরদৃষ্টি তাঁদের খুবই ছিল। তবুও তাঁরা আপাত বক্তব্যের অন্তরালে নীরবে ইংরেজের কূটনীতিকে মেনে নিলেন। সেদিনের কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করেনি—যখন স্বাধীনতা এল তখন তাকে অখণ্ডভাবে রক্ষা করবার উপায়ও তাদের ছিল না। ইংরেজ জোর করে দেশ ভাগ করে তাদের দায়িত্ব আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে। যদি সেদিনের কংগ্রেস নিজ শক্তিতে নিজেদের সংগ্রামের পরাক্রমে স্বাধীনতা আনত, তা হলে ভারত চিরদিনই অখণ্ড থেকে যেত। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যাঁরা বীর তাঁরা বাহুবলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে সম্মানের সঙ্গে স্বাধীনতা ভোগ করেন। ভিক্ষুকের দাবি করবার কোন অধিকার নেই—সে দাবি সব সময় অগ্রাহ্য—যেমন সেদিনের কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের দাবি ইংরেজ অগ্রাহ্য করে

দিয়েছিল। ভারতের এ স্বাধীনতা ভিক্ষার দান, এ স্বাধীনতা বীর্যশুল্কা স্বাধীনতা নয়।

(১) বুলাভাই দেশাই ছিলেন অন্যতম কংগ্রেস নেতা। মহাত্মা গান্ধীর সমর্থনে তিনি বর্ণ-হিন্দু ও মুসলমানের সমতা-সাপেক্ষে লিয়াকত্ আলীর সঙ্গে পরিকল্পনা করার ফলে কংগ্রেসের অপরাপর নেতৃত্বের বিরাগভাজন হন এবং কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

(২) আসামী পক্ষের কৌঁসুলী বুলাভাই দেশাই-এর সাহায্যকারী ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, ডঃ কে. এন. কাটজু, রায় বাহাদুর বদরী দাস, মিঃ আসফ আলী, কানোয়ার স্যার দালীপ সিং, বক্সী স্যার তেকচাঁদ এবং মিঃ পি. কে. সেন। অপরদিকে, সামরিক আদালতের সদস্য ছিলেন সাতজন—মেজর জেনারেল এ. ডি. ব্ল্যাক্সল্যাণ্ড (সভাপতি), ব্রিগেডিয়ার এ. জে. এইচ্. বোর্ক, ভারতীয় বাহিনী; লেফ্‌ট্-কর্ণাল জি. পি. স্কট, এম. সি. ইণ্ডিয়ান রেগুলার রিসার্ভ অফিসারস্; লেফট্-কর্ণেল টি. আই. স্টীভেনশন, সি. আই. ই, এম. বি. ই., রয়েল গাড়োয়াল রাইফেলস্, লেফট-কর্ণেল নাসির আলী খাঁ, রাজপুত রেজিমেণ্ট; মেজর প্রীতম সিং, আই. এস. ই; মেজর বানোয়ারী লাল, ১৫শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট। অভিযোগ পরিচালনা করেন ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এন. পি. এঞ্জিনীয়ার।

(৩) ২/৯ জাঠ রেজিমেণ্টে সিপাই সরিফুল্লা খাঁ।

(৪) "You are not politicians." Mr. Desai told the court. "There is a de facto political organization sufficient in character and resources to declare war. Your verdict must be in favour of these men no less than it will be in your own favour for killing men in war, for killing men of which you are justly proud".

।। সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র ।।

—গোপাল লাল সান্যাল

সকল পার্থিব বস্তুতে অনাশক্তি, সর্বজীবে দয়া, ভগবানের নির্দেশ ভেবে নিত্যকার কর্তব্য পালন, নানারূপের মাঝে আরাধ্যের অস্তিত্ব অনুভব—এই যদি সন্ন্যাসের মূল কথা হয়—তবে সুভাষচন্দ্র আজীবন সন্ন্যাসী। ...

কৈশোরে একদিন তিনি গুরুর সন্ধানে ঘর ছেড়ে ছিলেন।

হিমালয়ের গুহা গহ্বরে, নানা পাহাড় পর্বতে অনেক সাধুর সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু গুরুলাভ হয়নি।

বস্তুতঃ বাল্যকাল থেকেই নানা সেবাব্রতী কাজের মাধ্যমে তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন, কে তাঁর পথ নির্দেশক।

পরিণত বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এক সন্ন্যাসীকে তিনি পত্রযোগে জানিয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে সুভাষচন্দ্র তাঁরই চরণে লুটিয়ে পরতেন।

সাধু-সন্ন্যাসী, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের যুবক সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ স্নেহ ও আকর্ষণ।

* * *

২৪-পরগণা জেলার সরিষায় অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সুবৃহৎ শিক্ষা-শিক্ষণ-স্বাস্থ্যচর্চা-পাঠভবন-প্রার্থনা মন্দির-ভ্রাম্যমান পাঠাগার-ছাত্র-ছাত্রীনিবাস ইত্যাদি শোভিত বিরাট কর্মচঞ্চল নব-জীবন কেন্দ্রটির কথা প্রথমেই মনে হয়।

এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিশনের অন্যতম স্বর্গীয় স্বামী গণেশানন্দজী। সংসারাশ্রমে তাঁর কি নাম ছিল, তিনি সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন কিনা, তা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয় নি। প্রয়োজন ও ছিল না। তবে দুজনে যে খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন তা কলকাতা থাকাকালে স্বামীজির প্রায়ই প্রত্যুষে সুভাষচন্দ্রের কাছে আগমন ও দীর্ঘকাল যাপনেই বোঝা যেত।

অবশ্য, স্বামীজির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সরিষার আশ্রম-কেন্দ্রটিকে সুগঠিত করতে সুভাষচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ।

এবং তা তিনি পেয়েও ছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি জানিয়েছিলেন সংস্থাটি পরিচালনে প্রতিমাসে যে ব্যয় হয়, তার প্রায় সমস্তটাই মাসিক নির্দিষ্ট চাঁদা হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। নিজে উনি সন্ন্যাসী, অতি পরিচিতের সংখ্যাই বা কোথায়? সুভাষচন্দ্র নানা ব্যক্তির কাছে চিঠি দিয়ে বা মৌখিক আবেদন জানিয়ে স্বামীজিকে পাঠাতেন। তাঁরাই ঐ মাসিক ব্যয়ের ভার বহন করতেন। প্রতিমাসে বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করাও কম সময়, অর্থব্যয় বা শ্রমসাধ্য ছিল না। এসবই করতে হত স্বামীজিকে।

* * *

১৯২৩ সালের কথা। ধর্মতলা স্ট্রীটে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার কার্য্যালয় সবে সুরু হয়েছে। একদিকে স্বরাজ্যদল গঠন, সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন পরিচালন। তার উপরে আছে নতুন দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশের সব কিছু ব্যবস্থা সাধন।

সর্বত্র, সব সময় কর্মব্যস্ততা। পার্টির কাজ, স্বরাজ্য দলের প্রার্থী নির্ধারণ, বিভিন্ন ওয়ার্ডে নির্বাচনের ব্যবস্থা সাধন, অর্থ সংগ্রহ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ইত্যাদি।

এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যায়, সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি ঐ ফরওয়ার্ড কার্য্যালয়ে।

আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, "আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। একটা কাজ করতে হবে।"

—বলেই জামার বুক-পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, "সাংখ্য-দর্শনের শংকর ভাষ্য। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলায় অনুবাদ, অন্বয় ও ব্যাখ্যা সমেত। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত। বোধ হয় পাঁচসিকে, কি দেড় টাকা দাম হবে।

"আপনি এখুনি বসুমতী আপিসে গিয়ে বই খানা এনে দেবেন? পাঁচটার পর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

আমি ত' কথা শুনে বোকার মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। উনি বলেন কি? কোথায় দলাদলি, নির্বাচন, পত্রিকা-পরিচালন, তা নয় সাংখ্য-দর্শন! ঐ সব রাজনীতির সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের সম্পর্ক কোথায়?

উনিও কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে, বোধ হয় বুঝতে পারলেন আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। বললেন,

"আমার মা'র জন্ম দরকার। ওঁর কাছে মূল সংস্কৃত বই আছে। তবে বাঙলা অন্বয় ও ব্যাখ্যা পেলে ওঁর সুবিধে হয়?

সত্যিই কি মা'র জন্ম প্রয়োজন ছিল?

*　　　　*　　　　*

কেম্‌ব্রিজে পাঠকালে তিনি যে 'হল' বা ছাত্রাবাসে থাকতেন, সেখানে ওঁর সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন আর একজন ভারতীয় ছাত্র, নাম তাঁর শ্রী আয়েঙ্গার।

সুভাষচন্দ্রের ন্যায় তিনিও ছিলেন একদিকে আই-সি-এস পরীক্ষার্থী, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ঐ 'হলেই' আর এক ঘরে থাকতেন দিলীপ কুমার রায়। তিনিও তখন কেম্‌ব্রিজের ছাত্র।

আয়েঙ্গার প্রায় প্রত্যহই সকাল হতে-না-হতে চলে যেতেন দিলীপ কুমারের ঘরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওখানে থেকে ফিরে আসতেন নিজের আবাসে।

একদিন দিলীপ কুমার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আয়েঙ্গার, তুমি কি এবার পরীক্ষা দেবে না ঠিক করেছো?

"কেন বলত? একথা উঠ্‌ছে কিসে? বোস কি তোমায় কিছু বলেছে নাকি?"

"না, সে কিছু বলে নি। তবে তুমি যেভাবে রোজ সকালটা আমার কাছে কাটিয়ে দিচ্ছ, তাতে মনে হয় পড়াশুনোয় তোমার তেমন মন নেই। তাই জিজ্ঞাসা করলাম।"

"আসল কথা কি জানো"—বললেন আয়েঙ্গার, "বোস আমাকে সকালে ঘরে থাকতেই দেয় না। বলে এখন আমি আহ্নিক করব। তুমি এক ঘণ্টা বাদে এসো। বলেই সে দরজা বন্ধ করে দেয়।"

"তাই নাকি? তুমি ওকে বলনা কেন?" এতে তোমার পড়া-শুনোর ক্ষতি হচ্ছে। 'তুমি ত' পড়াশুনো করতেই এখানে এসেছো?"

"ওরে বাবা। ওর কথার ওপর কথা বল্‌ব আমি? তুমি বলতে পারবে?"

পরবর্তী কালে সিভিলিয়ান হয়ে আয়েঙ্গার বাঙলা দেশেই কাজ করেছেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

*　　　　*　　　　*

বার বার কারাবাস কালে সন্ন্যাসী জীবন যাপনের খুব সুবিধা হয় সুভাষচন্দ্রের।

প্রথমবার কারাগারের ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে তাঁকে রাখা হয়। তেমনি প্রত্যেক আবাসীর জন্ম ছিল পৃথক্ ঘর বা "সেল"। তাতে থাক্‌তো লোহার খাট, গদি, তোষক, চাদর, বালিশ ও মশারী। এ ছাড়া চেয়ার টেবিল আর চারখানা কম্বল। আর ছিল সাহেবী পোষাক, তবে সেটা বিনাশ্রমে দণ্ডিত বা রাজনৈতিক বন্দীদের ইচ্ছাধীন।

সুভাষচন্দ্র ওসব সুখ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করেন। সাহেবদের প্রাপ্য আরাম তাঁর কিছুই চাই না। চারখানা কম্বলও নয়। দুখানা—যা সাধারণ কয়েদী পায়, তাই যথেষ্ট।

অন্যান্য সাধারণ কয়েদী ও হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী যা পাচ্ছেন, যে ভাবে তাঁরা আছেন তিনিও তাই চান এবং সেভাবেই থাকবেন।

তখনকার বৃটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রের ও ইচ্ছা পূরণ করেন নি। হাজার হোক্ সুভাষচন্দ্র বিলেত ফেরৎ তায় সিভিলিয়ান। তাকে যদি সাহেবদের সগোত্র গণ্য করা না হয়, তবে ত' বৃটিশ রাজতন্ত্রেরই অপমান।

এ সব সত্বেও সুভাষচন্দ্র ঐ দুখানা কুট্‌কুটে কালো কম্বলকেই সম্বল করেছিলেন জেল খানায়। আর ছিল তাঁর নিজের খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী।

ভাগ্যক্রমে জেল খানায় অসুস্থ দেশবন্ধুর সুশ্রূষা ও দেখা শোনার ভার তাঁর একান্ত আগ্রহে, সুভাষচন্দ্রের উপরই অর্পণ করা হয়। এজন্ম তিনি দেশবন্ধুর 'সেল'-এ কম্বল বিছিয়ে শুতেন, আর দেশবন্ধুর জন্ম নির্দিষ্ট পৃথক রান্নার ব্যবস্থায় সুভাষচন্দ্রই হলেন রাধুনী।

ষ্টোভ জেলে তিনি নিত্য যা রান্না করতেন তাতে দুজনেরই চলে যেত। দিনে খিচুড়ি এবং রাত্রে পাউরুটী ও মাংস—এই ছিল উভয়েরই নিত্যকার খাদ্য। এছাড়া অবশ্য সকালে বিকেলে ছিল ডিম রুটী, মাখন, চা বা দুধ।

জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র কিন্তু আর কম্বল পরিত্যাগ করেন নি।

কি বাড়ীতে। কি অন্য নানা স্থানে ভ্রমণে বা থাকা কালো, ঐ কালো কুট্‌-কুটে জেলের কম্বল ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী এবং আদরের সহচর।

প্রথম বার কারামুক্তির কিছুদিন পরই উত্তরবঙ্গে যে প্রবল বিধ্বংসী বন্যা হয়, তার ত্রাণকার্যের সুব্যবস্থা সাধনের জন্ম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে সুভাষচন্দ্র বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে চলে যান। সেখানে প্রধান রেল-ষ্টেসন সান্তাহার সংলগ্ন খোলা জমিতে বিরাট তাঁবু খাটিয়ে ত্রাণ-কার্যের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

একদিকে সুভাষ চন্দ্র ও অন্যান্য সহকর্মীদের কাজের টেবিল চেয়ার খাতা

পত্র রাখার ব্যবস্থা, অন্যদিকে দুখানা তক্তাপোস। একখানি সুভাষচন্দ্রের নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু কার্য্যত সেটি নিদ্রা নয় শেষ রাত্রের সামান্য সময়-টুকু বিশ্রাম যাপনেই ব্যবহৃত হ'ত। রাত্রের কোন্ প্রহরে যে তাঁর টেবিলের লণ্ঠনটি নেবানো হত, কত ভোরেই বা তিনি উঠে আবার টেবিলের কাজে মন দিতেন তা কে দেখেছে? তাঁর পাশের তক্তাপোসে শুয়েও তা জানবার সৌভাগ্য অনেকের হয়নি। দু' একরাত্রে দীর্ঘকাল কাজ করবার ছুতোয় জেগে থেকেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। রাত এগারোটা বাজতেই সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "রাত অনেক হল, এবার শুয়ে পড়ুন।"

অথচ, তিনি নিজে তখনো কাজে ব্যস্ত। এই সন্তাহারের তক্তাপোসেও সুভাষচন্দ্রের সদা সঙ্গী ছিল দুখানা কালো কম্বল। উনি একখানা ভাঁজকরে পেতে, আর একখানায় মুখ থেকে পা পর্য্যন্ত ঢেকে শুতেন।

ওখানে ত একটু ভাল বিছানায় শুতে আপত্তি থাকবার কথা নয়।

কিন্তু সন্ন্যাসীর আবার বিছানার চিন্তা।

* * *

একরাত্রে দেখা গেল টেবিলের কাজে তিনি একান্ত ভাবেই নিবিষ্ট।

রান্না বাড়ী থেকে খেতে এবার ডাক এল।

সুভাষচন্দ্রের তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। সাধারণত তিনি সকলের শেষে খেতে যেতেন একাকী। সে জন্য কারও এদিনেও কোনও সন্দেহ হয়নি।

কিন্তু অন্যান্যরা খাওয়া শেষে ফিরে এসে দেখলেন, সুভাষচন্দ্রের আসন খালি, টেবিলে বাতি নেই। তাঁর নির্দিষ্ট তক্তাপোসে আপাদমস্তক কালো কম্বল ঢেকে তিনি শুয়ে আছেন।

বয়স্ক 'দাদা'দের খবর দেওয়া হল। এক দাদা এলেন। সুভাষবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে।

"ও কিছু নয়, একটু জ্বর জ্বর মনে হচ্চে। এক রাত্তির উপোস দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনাদের খাওয়া হয়েছে ত'? এবারে সবাই শুয়ে পড়ুন।"

* * *

এর পর বহুদিন চলে গেল। মেয়র সুভাষচন্দ্র প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে সেণ্ট্রাল জেলে উপস্থিত হলেন।

জেলখানার সাধারণ কয়েদিদের রাজকীয় অভ্যর্থনার পর, যে সেলে তাঁকে

রাখা হল, সেখানেও ওর প্রিয় সহায় ও সহচর সেই পুরাতন কালো কম্বল।

পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল, তাঁর সেল্‌-এর একাংশ এক-খানি কম্বল দিয়ে পৃথক করা হয়েছে।

ওটিকে ওঁর প্রাত্যহিক সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঘরে পরিণত করা হয়েছে।

সেল-এর দ্বারা খোলার আগেই তিনি নিত্যকার জপ-পূজা ধ্যান ইত্যাদি সমাপনান্তে বাইরে বসেন। এই তাঁর প্রভাতের কর্তব্য সম্পাদন।

* * *

হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের পর সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। তাঁর এক অনুগত সহকর্মীকে খবর দিলেন, সকালে ছটার মধ্যেই যেন তাঁর কাছে যাওয়া হয়।

ইদানিং ওঁর সঙ্গে দেখা করা ছিল খুবই মুস্কিল। সব সময়েই নানা জনের ভীড়, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-বাসীর। এজন্য পূর্ব নির্দিষ্ট সময়েও অনেকের সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়না।

যাহোক সকালে ছটার কিছু পূর্বেই ওঁর বাড়ীতে হাজির হলেন ভদ্রলোক।

দ্বিতলে উঠেই দেখেন সুভাষচন্দ্র সামনেই, ছাদের সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। বগলে কালো কম্বল কাঁধে একখানা রঙ্গীন চাদর। না বালিশ, না অন্য কিছু।

উনি নেমে আসতেই পিছন পিছন এলেন ওঁর পিস্‌তুত ভাই। জানালেন, দুজনেই ছাদে শুয়েছিলেন। রোজই এমনি শুয়ে থাকেন।

আর কম্বল? ও নাহলে ওঁর কিছুতেই চলেনা।

যেখানে যাবেন, কম্বল দুখানা ওঁর চাইই চাই।

———

॥ তারুণ্যের অভিযান ॥

—বিজয়রত্ন মজুমদার

একদা সমস্যা ছিল, পরাধীন জাতির লোক রাজনীতির চর্চা করিবে কিম্বা করিবে না।

নানা মুনির নানা মত শুনা গিয়াছিল।

পরাধীন জাতির লোকের পক্ষে রাজনীতি ব্যতিরেকে অন্য নীতি নাই। আজ এই মতই স্বীকৃত হইয়াছে।

একদিন আরও এক সমস্যার উদ্ভব হইল, ছেলে-মেয়েরা রাজনীতিচর্চা করিবে কি না।

ইহাতেও দেখা গেল বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ী। অধিকাংশের মতে ছেলে-মেয়েরা রাজনীতি হইতে দূরে থাকিলেই মঙ্গল। ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকগণ তাহাই চাহেন। কিন্তু বাস্তবে তাহা সম্ভব হয় নাই। শুধু আজ বলিয়া নহে, স্মরণাতীতকাল হইতে কিম্বা যে দূর অতীতে আমাদের দুর্বল স্মরণশক্তি পৌঁছিতে পারে, সেখানেও দেখিতেছি, রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্তে ছেলেদের রেহাই দেওয়া হয় নাই। মেয়ের সংখ্যা সেকালে নগন্য ছিল।

১৯০৫ হইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত। ইহার পূর্বেও কয়েকটি আন্দোলন আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেও পরিচালিত হইয়াছিল বটে; কতকগুলির সাফল্যমণ্ডিত পরিণতির ইতিবৃত্তও আমরা অবগত আছি কিন্তু সেগুলির সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে পারিব না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রয়োজনীয় ইতিহাসটুকুও অতি কষ্টে স্মরণ করিতে পারা যায়। স্মরণ শক্তির অপরাধ নাই। কারণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে পদাতিক বাহিনী ও পতাকাবাহিদিগের মধ্যেই বর্তমান লেখকের স্থান ছিল। সেকালে এই পদাতিকবাহিনী মূলতঃ বালক লইয়াই গঠিত হইত; দেখিতেছি আজও তাহাই হইয়া থাকে। ইহারা পতাকা বহন করে এবং গলার শির ফুলাইয়া শ্লোগান ধ্বনিত করিতে থাকে।

সেকালেও এই ব্যবস্থা, একালেও তাহাই। সুতরাং ছেলেরা রাজনীতি করিবে কিনা এই অনাবশ্যক প্রশ্ন প্রশ্নহিসাবে দেশের সম্মুখে বহুকাল ধরিয়া আছে বটে: ইহার সদুত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের

কালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মনস্বীগণ বালক-বাহিনীর উপরে যে কতটা নির্ভর করিতেন তাহা বলিবার নহে। ছেলেরাও যে সর্বকর্ম পরিহরি নেতৃবৃন্দের খিদমত খাটিয়াই দিন এবং রাত কাটাইয়া দিত তাহাতেও সন্দেহ নাই।......

পরবর্তীকালে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন ও তাহার ক্রোড়াঙ্ক হিসাবে দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি পরিচালিত কাউন্সিল এসেম্বলী প্রবেশ সম্পর্কিত আন্দোলনে ছেলেরা যখন আগের মত সমান তেজে, সমান নিষ্ঠার সহিত হয়ত বা অধিকতর সংখ্যায় কাজ করিতেছে, তখন পূর্ববর্তী যুগের নেতৃবৃন্দ —যাঁহাদের গাড়ী আমরা টানিয়াছি, যাঁহাদের মস্তকে ছত্র আমরাই ধরিয়াছি, গলায় যাঁহাদের মালা আমরাই দিয়াছি একটি মুহূর্তের জন্যও অসন্তুষ্ট হন নাই, আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এক তিল আড়ষ্ট হন নাই, তাঁহারাই এক্ষনে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ছেলেগুলো গোল্লায় গেল।

এই অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছিল।

যুগে যুগে রাজনীতি যে ছেলেদের উপরে অনেকখানি নির্ভর করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এককাল ছিল যখন নেতারা ছেলেদের সহায়তা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন আবার সময় বিশেষে ছেলেদের মাথা খাওয়া হইতেছে ভাবিয়া খেদ প্রকাশও করিতেন। অসহযোগ ও তৎপরবর্তী আন্দোলনকালে পরস্পর বিরোধী ভাবের সংঘর্ষের অবসান হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কার্যসূচীর মধ্যে একটি বোধ করি এই ছিল, ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির অবসান ঘটাইতে হইবে; গোলামখানা বন্ধ করিতে হইবে; সমগ্র ভারতবর্ষে গোলামখানা ভাঙ্গিবার সে কি ধুম পড়িয়া গেল। দেশে তখন পদ্মা নদীর বান আসিয়াছে—নগর গ্রাম প্রান্তর সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে; ঘর বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় গান্ধীজীর সৈন্যাধ্যক্ষ। গোলামখানা টলমল করিতেছে। স্কুল কলেজের অস্তিত্ব লইয়া টানা হেঁচড়া পড়িয়া গিয়াছে, ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর দুই বিরাট, দুই শক্তিধর; দুই অমিতপ্রভাব কর্মবীর বর্ষাপ্লাবিত নদীর দুই কূলে দাঁড়াইয়াছেন।.........

চিত্তরঞ্জন দাশ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গলার এই দুই সুসন্তান নদীর দুই তীরে দণ্ডায়মান। অসহযোগ অন্দোলন আবর্তিত নদী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া মধ্যস্থলে প্রবাহিত হইতেছে।

গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য চিত্তরঞ্জন মহারুদ্রের সংহারমূর্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টি রসাতলে পাঠাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। আর আশুতোষ, স্বয়ং রুদ্র হইয়াও বিষ্ণুর মত সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে যত্নবান।...এই আলোড়ন যে আনিয়াছিল, তাহার সম্যক পরিচয় দিবার শক্তি সামর্থ্য আমার নাই।...

চিত্তরঞ্জন এবং আশুতোষ বঙ্গমাতার দুই সুসন্তান তুল্য শক্তিধর ছিলেন বলিয়াই বোধ করি একে অপরকে শক্তিযুদ্ধে পরাভূত করিতে পারেন নাই। একে যদি অপরের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গালীর শিক্ষার ধারা পরিবর্তিত হইয়া যাইত; হয়ত বা শিক্ষার ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের ও দেশের গতি প্রকৃতিও ভিন্ন পথাবলম্বী হইত। বাঙ্গলার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বলিতে পারিব না—সংহার কার্যও চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই—আশুতোষের পক্ষে রক্ষাকার্যও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।...

'ন্যাশনাল এডুকেশন' প্রবর্তিত ও পরিচালিত করিবার চেষ্টা এই সময়েই পরিলক্ষিত হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুভাষচন্দ্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই সুখানুভব করিয়াছিলেন। ছাত্র সমাজের সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ সম্ভবতঃ এখনই হইল। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে উচ্চ হইতে উচ্চতর, সর্বশেষে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেও ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট সুভাষচন্দ্র একটি দিনের তরেও দূরে চলিয়া যাইতে চাহেন নাই—দূরে যাইতে পারেন নাই। ছাত্র ও যুবসমাজের সেই রাজ্যের তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ। অনেক সময়ে অনেকবার ছাত্র সমাজে ভাঙন আসিয়াছে ছাত্র-সমাজ ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে. বহু দাস বহু নেতা দেখা দিয়াছে কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রভাব একদিনের জন্য এতটুকু ক্ষুন্ন হইতে দেখা যায় নাই।

১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে (বাঙলা ২৩শে মাঘ ১৩৫২) শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা হইয়াছিল। সরস্বতী পূজার সমারোহ তরুণ

সমাজেই সমধিক। ইংরাজী ১৯৪৬ বাংলা ১৩৫২ সালের বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবীর পূজামণ্ডপ সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে ভরিয়া গিয়াছিল; জয় হিন্দ ও নেতাজীর জয় ধ্বনিতে পূজার মন্ত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার তর্ক উত্থাপন করিতে আমি চাহি না। ইহাতে বিস্ময় বোধ করিবার কারণও দেখি না। সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ যে ভারতের ভাবস্রোতে ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহাতে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশও আছে বলিয়া আমি মনে করি না। ভারতের এই ভাব মন্দাকিনীতে তরুণই অবগাহন স্নান করিয়াছে; স্বাভাবিক নিয়মে তাহারা ভাব-মন্দাকিনীর ভাবপ্রবাহে—অনুকূল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে আবার প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে তাহারাই যুদ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছে। নেতাজীর সৌম্য মূর্তি, নেতাজীর শৌর্য বীর্য্য, নেতাজীর ফৌজ তাহাদিগকে নূতন মন্ত্রে, নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে।

একদিন একটি সরস্বতী পূজার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে কিভাবে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল, তাহাও এইখানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে।

কলিকাতার সিটি কলেজটি ব্রাহ্ম সমাজের সমাজপতিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। একবার সিটি কলেজের ছাত্রাবাসেব ছাত্রগণ সরস্বতী পূজার উদ্যোগ আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিলিল না। কর্তৃপক্ষ পুতুল পূজার বিরোধী, অনুমতি পাওয়া যাইবে না জানিয়াও ছাত্রগণ নিরস্ত হইল না।...সিটি কলেজের ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষের মতের বিরুদ্ধে প্রতিমা পূজায় দৃঢ় সঙ্কল্প। সুভাষচন্দ্রের সমর্থন ও সহানুভূতি ছাত্রবর্গের পানে প্রধাবিত। সঙ্ঘর্ষ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিল।

ব্রাহ্ম সমাজপতিগণ বলেন, অপরের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হানা হইতেছে।

সুভাষচন্দ্র বলেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। পুলিশে ও বিদ্যায়তন পরিচালকে পার্থক্য নাই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও এই আবর্তে নামিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ কবি সম্প্রদায়গত ধর্ম বা বিশ্বাসের বিতর্কে অবতীর্ণ হইতেন না এবং ভেদবুদ্ধির বিকাশ যেখানে হইত. সেখান হইতে সযত্নে দূরে অবস্থান করাই ছিল তাঁহার অভ্যাস। কিন্তু এই বিরোধে তাঁহাকে অংশগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হয়ত ব্রাহ্ম সমাজের শিরোমনিদের আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিবার মতদৃঢ় তা

তাঁহার ছিল না। হয়ত বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রভাব অতিক্রম করাও সাধ্যতীত হইয়া পড়িয়াছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেড়ম্ব চন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ কবির বন্ধুগণ মধ্যে পরিগণিত ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সুভাষচন্দ্রকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বিশ্ব বিজয়িনী প্রতিভার অত্যুজ্জল প্রভাবও ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্কোচের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে সুভাষচন্দ্রকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

সিটি কলেজ তদবধি সুভাষচন্দ্রকে বর্জন করিয়াছিল। কলেজের ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছাত্রগণের চেষ্টাতেই হোক অথবা কর্তৃপক্ষের প্ররোচনাতেই হোক, ঠিক মনে নাই, তবে মনে আছে, সুভাষ বর্জনের প্রস্তাব কলেজে অথবা ছাত্র সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

এই ঘটনাটি একটি বিশেষ কারণে আমার মনে আছে। তাহাই বলিব।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, এবং সমগ্র ভারতের ছাত্র সমাজ আনন্দে—সমুদ্র মন্থনকালে, সমুদ্রের মতো—উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সুভাষের নির্বাচন তরুণের জয় সূচিত করিতেছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের তরুণের দল তরুণের রাজাধিরাজ সুভাষকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল সমারোহে সুভাষের অরুচিও নাই। আলস্যও নাই। যে যেখানে আহ্বান করে, সেখানেই যান। মাল্যের স্তূপ জমে, অভিনন্দন পত্রের পর্বত রচিত হয়! আমাদের এই কলকাতা সহরে এমন স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, ব্যায়াম সমিতি, খেলার মাঠ ছিল না যেখানে না তাঁহার সাদর আহ্বান আসিয়াছিল; যেখানে না সেই উচ্চাসনটিতে তাঁহাকে বসিতে হইয়াছিল। যেখানে না মাল্য ধারণ করিতে হইয়াছিল, অভিনন্দন কুড়াইতে না হইয়াছিল; বক্তৃতা দিতে না হইয়াছিল। হয়ত কর্পোরেশনের সভায় যোগ দিতে পারেন নাই, হয়ত রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু তরুণের আহ্বান কদাচ উপেক্ষিত হয় নাই। এক কথায় সুভাষ ছিলেন চির-তরুণ এবং দেশের তরুণ ছিল তাঁহার চিরদিনের সহচর।

কলিকাতা সহরে, আমার যতদূর মনে আছে, একমাত্র সিটি কলেজই রাষ্ট্রপতির প্রাপ্য, সুভাষচন্দ্রের ন্যায্য সম্মান দানে বিরত ছিল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ সুভাষের উপর সন্তুষ্ট না থাকিলেও ছাত্র সম্প্রদায়কে তাঁহারা নিরস্ত করিতে পারেন নাই, সেণ্ট জেভিয়ার্সও রাষ্ট্রপতির সম্বর্ধনা করিয়াছিল। সিটি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, বলিয়া মনে হইতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে এলগিন রোডে গিয়াছি, একতলের বসিবার ঘরটি জনাকীর্ণ। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে চিনিতেন। কাজেই ওয়েটিং রুমে লোকারণ্যের মধ্যে বসিয়া দর্শন প্রত্যাশার অপেক্ষা করিতে হইল না দ্বিতলে প্রেরিত হইলাম। আহারান্তে সুভাষচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন। কথা আরম্ভ করিয়াছি, ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজ আসিল।

টেবিলের উপর ঐরূপ কাগজখণ্ড অনেকগুলি জমিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র একবার মাত্র দেখিয়া কাগজগুলি কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই টুকরাটুকু দেখিবামাত্র বলিলেন, নিয়ে এসো। বলিয়া কাগজ টুকরাটিকে গাদায় না রাখিয়া আলাদা করিয়া রাখিলেন। যেহেতু আমি অন্ধ নহি এবং কাগজখণ্ডটুকু তিনি গোপন করেন নাই আমার দৃষ্টি না পড়িয়া পারে না। নামটি মনে নাই, তবে পদাধিকার স্মরণ আছে।

''সেক্রেটারী সিটি কলেজ ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন।''

একটু পরে একটি সুকুমার সুদর্শন যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে সুভাষচন্দ্র নিকটস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

যুবাপুরুষটি মুখস্থ পড়া বলার মত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন, সিটি কলেজে আপনার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি সাধারণ সভা ডাকিয়া আমি বিপুল ভোটাধিক্যে সেই ব্যান অপসারিত করিয়াছি এবং আপনাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাবও পাশ করাইয়াছি। এখন আপনাকে একদিন আসিতে হইবে। কবে আপনার সুবিধা হইবে বলুন ?—

দিনক্ষণ বিচারেও অবসর ছিল না। সুভাষচন্দ্র আগ্রহে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। যুবক একটা দিন ও সময় ধার্য্য করিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। পরে এই যুবকের পরিচয় পাইয়াছিলাম, যুধাজিৎ চক্রবর্তী। আরও পরে আরও জানিয়াছিলাম যুধাজিৎ সুপণ্ডিত অজিতকুমার চক্রবর্তীর আত্মজ। অজিত বাবুরা ব্রাহ্ম এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম। তাহা সত্বেও যুধাজিৎ যাহা করিয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজ ও সমাজের সুহৃদবর্গের মনঃক্ষুন্ন হইবার কারণ থাকিলেও, তরুণের অন্তরের অনুভূতির এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ অভিনন্দিত হইবার যোগ্য।

এই ঘটনায় তারুণ্যের অভিযানে সুভাষচন্দ্রের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হইল।

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া খণ্ডে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বাল-সেনা যে সুভাষচন্দ্রের নামেই সম্মোহিত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি !

রচনাটি লেখকের অধুনা দুষ্প্রাপ্য
"আজাদ হিন্দের অঙ্কুর" হইতে সংকলিত।

॥ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাংবাদিকতার প্রতি আকর্ষণ ॥

—ধীরেন ভৌমিক

মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল সর্বাত্মক। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিভা দিগন্ত বিস্তৃত। তাঁকে কয়েকটি বিশেষণে বিশেষিত করিলেই তাঁর জীবনগাথা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। অনন্ত বিস্তৃত তাঁর জীবন দর্শন। বস্তুতঃ রূপকথার গল্পের মত নেতাজীর জীবন কাহিনী। তাঁকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জননায়ক, সমাজতন্ত্রীনেতা, আপোষবিরোধী সংগ্রামী নেতা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রদূত, ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের তথা মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা মহানায়ক বলেই দেশবাসী জানে। এত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকতার প্রতিও ছিল তাঁর বড় আকর্ষণ। পিতা দক্ষ আইনজীবি জানকীনাথ বসুকে, পুন্যবতী মাতা প্রভাবতী বসুকে ও অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা তিনি নিজেও বলেছেন। স্নেহপরায়ণা বৌদি বিভাবতী বসুকে লিখিত চিঠিতেও তাঁর সাংবাদিকতার প্রতি অনুরাগের কথা লিখেছিলেন।

নেতাজীর বিরাট কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল জীবনে তাঁর সাংবাদিকতার প্রতি আকর্ষণের ঘটনা বা তাঁর হাতে-কলমে সাংবাদিকতা করার ব্যাপার খুব বড় ঘটনা নয়।

১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই সুভাষচন্দ্র বিলাত থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। ইংরেজের দেশে গিয়ে আই-সি-এস পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথমস্থান দখল করেন এবং সামগ্রিকভাবে পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান দখল করেন। কিন্তু এই বিদেশী তকমা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ ক'রে সুভাষচন্দ্র জীবন প্রভাবেই ত্যাগের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। দেশবন্ধুর আশীর্বাদ নিয়েই রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে নেমে গেলেন। প্রথমে দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। ঐ বছরেই ১০ই ডিসেম্বর মৌলানা আজাদ সহ, সুভাষচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার হলেন। ছয় মাসের কারাদণ্ড হল।

১৯২৩ সালে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত "বাংলার কথা' দৈনিক' সংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের প্রচার কার্যের হাতিয়ার হিসাবে এই পত্রিকার বহুল প্রচার ঘটে। এই সময়ে-ই দেশবন্ধুর পরিচালিত "ফরওয়ার্ড" পত্রিকারও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল সুভাষচন্দ্রকে। প্রখ্যাত অধ্যাপক নেতাজীর বন্ধু বিনয় সরকারকে দায়িত্ব দিলেন বিদেশী সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করতে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সুযোগ্য সাংবাদিক শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী সম্পাদক হন। ১৯২৯ সাল অবধি পত্রিকা চলে। সত্যরঞ্জন বক্সীর গ্রেফ্তারের পর "ফরওয়ার্ড" বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার 'লিবার্টি' পত্রিকা বের হয়। সত্যরঞ্জন বক্সী আবার সম্পাদক হন। সত্যরঞ্জন বক্সীর গ্রেফ্তারের পর প্রথম উপেন নিয়োগী পরে মোহিত মৈত্র সম্পাদক হন। অধ্যাপক ডঃ বিনয় সরকার লিখেছিলেন ১৯৩৩ সাল অবধি 'লিবার্টি' চলে। "তখন সুইট্সারল্যাণ্ডে ছিলাম। লুগানো শহরে বা পল্লীতে। হঠাৎ সুভাষ বসুর টেলিগ্রাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি। চিত্তরঞ্জনের "ফরোয়ার্ড" তখন সবে বেরিয়েছে। ১৯২৩ সন……

'ফরোয়ার্ডের' জন্য এই অধমকে বিদেশী সংবাদদাতা বহাল করা হয়েছিল। আমার উপর ভার ছিল ফরাসী, ইতালিয়ান, আর জার্মান ভাষায় বিশ্বসংবাদ টেলিগ্রামে "ফরোয়ার্ডে" পাঠাবার। চিঠিতে লেখা ছিল "রয়টারকে হারাতে হবে।"—এ কথায় খুব খুশী হয়েছিলাম।…

বুঝলাম বাঙ্গালীর বাচ্চারা এতদিনে স্বজ্ঞানে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারে ঝুঁকছে। কম-সে-কম সংবাদপত্র সেবায় বাংলার যুগান্তর এসেছে বা আসছে। চিঠি পেতেই লুগানোর তার অফিসে খবর নিলাম—আমার দেওয়া খবর সাংবাদিকদের সস্তা দরে "ফরোয়ার্ডে" পাঠাবে কিনা।

তখনি তারা লণ্ডনের সঙ্গে কথা কয়ে রাজি হলো। বললে কুছ পরোয়া নেই। "ফরোয়ার্ডের" জন্য খবর তোমার বিনা পয়সায় পাঠিয়ে দেবো। পয়সা আদায় করে নেবো কলকাতা থেকে লণ্ডনের মারফৎ।

প্রথম সংবাদটা ছিল তুর্কী সম্বন্ধে। সেই সময় সুলতানকে খেদিয়ে দেয় কামাল পাশা। ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মানে নানা মন্তব্য প্রচারিত হলো। সেই খবর চুম্বক তারে ছেড়ে দিলাম। মাত্র কয়েক লাইনেই দেখি লাগলো পঁচিশ টাকা।

চক্ষুস্থির!……

বুঝলাম এত টাকা খরচের ক্ষমতা বাঙ্গালীর মুরোদে জুটবেনা। তাহে'

জানালাম সুভাষকে. ভাগ্য, এসব এলাহি কারখানা পোষাবে না, সন্দেহ হচ্ছে। হপ্তায় হপ্তায় চিঠি ছাড়া যাবে ডাকে। তাতেই যথেষ্ট। কচিৎ-কখনো তারাঘাতও চলতে পারে। কিন্তু তার বিলাস বর্জনীয়,—নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে।

সুভাষ তখন জেলে। ফরোয়ার্ডের দপ্তর থেকে তার মামা ধীরেন দত্তের জবাব এল—"তাই সই।" তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি ছেড়েছি যতদিন বিদেশে ছিলাম। ১৯২৩ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর হতে ১৯২৫ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাইশ-তেইশ মাস এই অধমের চিঠি নিয়মিত বেরিয়েছে 'ফরোয়ার্ডে'। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী 'ফরোয়ার্ডে'র সম্পাদক হন—পত্রিকার বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। সেইসব কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরের কাগজে উদ্ধৃতও হতো। সুতরাং বলতে বাধা যে প্রায় বছর দুয়েক আমি পারিভাষিক হিসাবেও সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী ছিলাম।

'ফরোয়ার্ড'ই বোধ হয় বাঙ্গালী দৈনিকের ভেতর বাঙ্গালীকে সর্বপ্রথম "বিদেশী সংবাদদাতা" বহাল করেছে।... ..এই অধমই বোধ হয় বাঙ্গালী সাংবাদিকের ভেতর কাল হিসাবে সর্বপ্রথম বিদেশী সংবাদদাতা।"

প্রখ্যাত অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ্ ডঃ বিনয় সরকারের লেখায় বুঝতে পারা যায়—সুভাষচন্দ্র স্বল্পকাল 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েও পত্রিকাকে আধুনিকীকরণের কত চেষ্টা করেছেন। শুধু স্বদেশের সংবাদই নয় বিদেশের সংবাদ সংগ্রহেও তাঁর কত প্রচেষ্টা ছিল।

১৯২৪ সালে স্বরাজ্যদল কলিকাতা কর্পোরেশন দখল করার পর দেশবন্ধু প্রথম মেয়র হলেন—সুভাষচন্দ্র চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হলেন। সরকার এই পদের জন্য মাসিক ৩০০০ টাকা অনুমোদন করলেন। সুভাষচন্দ্র ১৫০০ টাকা গ্রহণ করলেন। তখন সুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায় মিউনিসিপাল গেজেট প্রকাশিত হল। সুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায় মিউনিসিপাল গেজেটও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। প্রধান কর্মকর্তা থাকাকালীন—সুভাষচন্দ্র—কর্মচারী ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, চিপ ক্যান্টিন, ওয়ার্কার্স ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক গঠনমূলক কাজ শুরু করলেন। ইংরেজ সরকার সময় না দিয়ে ২৫শে অক্টোবর ছয় মাসের মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করলো।

আলিপুর, বহরমপুর জেলে রেখে সুভাষচন্দ্রকে মান্দালয় জেলে পাঠানো হলো। ১৯২৭ সালের ১৬ই মে অসুস্থতার কারণে সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন।

এর পরে আবার বহুবার জেল ও নির্বাসন। এরই মধ্যে ১৯৩৪ সালে তাঁর পুস্তক 'ভারত সংগ্রাম' রচিত হলো। এই পুস্তকে গান্ধীজি খুসী হন নি।

সাংবাদিকতার প্রতি যেমন তাঁর আকর্ষণ ছিল—তেমনি সাংবাদিকদের উপর তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তদানীন্তন আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেতাজীকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করত। দৈনিক বসুমতীও নেতাজীকে সমর্থন জানিয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক ৺সুরেশচন্দ্র মজুমদার নেতাজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। নেতাজীর সঙ্গে বহু জনসভায় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ৺হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ভাষণ দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এক সময় সারা উত্তর ভারত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সফর করেছিলেন। যুগান্তর পত্রিকা গোড়াতে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছে পরে সমর্থন জ্ঞাপন করে। রামগড়ের আপোষবিরোধী সম্মেলনকে ঐ পত্রিকার সম্পাদক রাবণগড় সম্মেলন আখ্যা দেন। গোড়াতে যুগান্তর পত্রিকার পরিচালক-মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন বেঙ্গল ইমিউনিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা. কুমিল্লার ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন—ক্যাপ্টেন দত্ত আমাদের আত্মীয় ছিলেন। আমি তখন ছাত্র—ক্যাপ্টেন আমাকে যুগান্তর পত্রিকায় আংশিকভাবে কাজ করতে বলেন—আমি বলি, আপনার পত্রিকা সুভাষ-বিরোধী। কাজেই আপনার পত্রিকায় আমি কাজ কবব কি করে? ক্যাপ্টেন বলেন—আনন্দবাজার পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের সবকিছু নিয়ে লিখেছে, কাজেই পত্রিকার প্রচারের স্বার্থে আমরা সুভাষ বিরোধী। আমি পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলাম। ক্যাপ্টেন দত্ত দক্ষিণারঞ্জন বসুকে বলে দেন তিনি যেন আমাদের সংবাদাদি ভাল করে ছাপেন। ঐ সময় যুগান্তরের পরিচালকমণ্ডলীতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনী-রঞ্জন সরকার ও তুষার কান্তি ঘোষ ছিলেন। ক্যাপ্টেন দত্ত, ডাঃ রায় এবং নলিনীরঞ্জন সরকার অবিবাহিত ছিলেন—কাজেই যুগান্তর পত্রিকা ক্রমে ঘোষদের হাতেই পরিপূর্ণভাবে চলে আসে। ক্যাপ্টেন দত্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমাদের বন্ধুবান্ধব ছয় জনকে যুগান্তর পত্রিকায় যোগদান করতে বলেন।

আমি, কৃষ্ণ ধর, অমর চক্রবর্তী, জিতেন ঘোষ, দ্বারকেশ মিত্র, সৌমেন বসু ক্যাপ্টেন দত্তের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু তিনি অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন—ক্যাপ্টেনের ইচ্ছাও ফলবতী হল না। কবি কৃষ্ণ ধর এখন যুগান্তরের সহকারী

সম্পাদক, জিতেন ঘোষ ও ডাঃ সোমেন বসু অধ্যাপনা করছেন, অমরবাবু আমি ও কৃষ্ণ ধর-ই সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত আছি। ক্যাপ্টেন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺অজিত দত্ত অবিভক্ত বাংলার প্রথম সারির আইনজীবি ছিলেন—তিনি নেতাজীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন—যুগান্তরের সুভাষ বিরোধিতায় তিনি নিজের কাকার কোন সংগঠনে যোগদান করেন নি। পরে অবশ্য যুগান্তর নেতাজীর প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আসছে। একটি ইংরেজী পত্রিকাও সুভাষচন্দ্রের তীব্র বিরোধিতা করে। ঐ পত্রিকার মালিক ছিল তখন ইংরেজ। সুভাষচন্দ্র বললেন—ঐ পত্রিকা যখন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে—তখন তিনি মনে করতেন হয়তো ভুল করেছেন। এখন ঐ পত্রিকাও নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। স্টেটস্‌ম্যানের (বর্তমান চীফ রিপোর্টার) সুজয় সেনগুপ্ত ও অমৃতবাজার পত্রিকার চীফ রিপোর্টার অপূর্ব সেনগুপ্ত আমাদের সমসাময়িক ছাত্রনেতা ছিলেন এবং নেতাজীর অনুগামী ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার তদানীন্তন চীফ রিপোর্টার শিবদাস ভট্টাচার্য্য এবং বর্তমান চীফ রিপোর্টার সুনীল বসুও নেতাজীর অনুগামী ছিলেন। যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। তিনিও নেতাজীর অনুগামী। রবীন্দ্রনাথ নেতাজীকে শান্তিনিকেতনে অভিনন্দিত করেন—পরবর্তীকালে মহাজাতি সদনের উদ্বোধনে দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ এবং নেতাজীকে 'দেশগৌরব' আখ্যায় ভূষিত করে রবীন্দ্রনাথ নেতাজীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানী মিউনিকে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লাভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। মিউনিক চুক্তির পরই সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হল—"ইউরোপে যুদ্ধ অনিবার্য।" সুভাষচন্দ্র বললেন, "মিউনিক চুক্তি অদূর ভবিষ্যতে শুধু চেকোশ্লাভাকিয়ারই বিনাশের কারণ হবেনা—যে মহাসমরকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এরূপ করা হল—তা অতি শীঘ্র আরম্ভ হয়ে যাবে।"

সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হ'ল—এক বৎসর পরেই ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হয়ে গেল।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে এবং ১৯৩৯ সালে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র যেসব বক্তব্য পেশ করেছিলেন পরবর্তীকালে তা অক্ষরে

অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের চেষ্টা না করে, বৃটিশকে চরমপত্র দিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করলে দেশ ভাগই হত না—নেতাজীর-ও বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না।

বহু নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখকও সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কার সম্পর্কে ইংরেজ লেখক হিউ. টয় লিখলেন "কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্র কোথায় ?"

অপর একজন ইংরেজ লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডস বলেন, "গান্ধীজি এবার অসহযোগ শুরু করলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়—কংগ্রেসের নির্ধারিত সভাপতির বিরুদ্ধে।"

দেশের বামপন্থী দলগুলির সংহতির জন্য সুভাষচন্দ্র চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে "ফরওয়ার্ড ব্লক" গঠন করলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের উদ্দেশ্য গণসংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজকে বিতাড়িত করে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনোত্তর যুগে "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের" পত্তন। সুভাষচন্দ্র বললেন—"The F, B. came into existence to fulfil a historical necessity."

ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে সমস্ত বামপন্থী দলকে সামিল করতে ব্যর্থ হয়ে নেতাজী বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা লালা শঙ্করলালকে জাপানে প্রেরণ করেন—এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার পর তিনি বেশী সময় পান নি। ইংরেজী সপ্তাহিক ফরওয়ার্ড ব্লক অল্প সময়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

"ফরওয়ার্ড ব্লকের" মুখপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র নিজেই গ্রহণ করলেন। তবে সত্যরঞ্জন বক্সী এবং বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ও পত্রিকার পরিচালনায় সহযোগী হলেন।

১৯৪০ সালের ২৯শে জুনের "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় নাম স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুভাষচন্দ্র লিখলেন—

"আমাদের এ সংখ্যা বের করতে অপরিহার্য কারণে দেরি হয়ে গেল। একটা সপ্তাহ নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছি—এটা ঘটেছে আমাদের সদাশয় বঙ্গীয় সরকারের বদান্যতায়। অফিসে খানাতল্লাসি চালানো হয়েছিল। আমাদের জামিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যা বের করার পূর্বে নতুন করে আরও দুহাজার টাকার জামিন দিতে হয়েছে।

ভালোই হয়েছে এতে আমাদের সঙ্কল্প হয়ে উঠবে আরও দৃঢ়তর—আমাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে আমরা আরও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠব। প্রাণে বইবে আমাদের উদ্দীপনা আর প্রেরণার বন্যা।

ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলন হলওয়েল মনুমেণ্ট উৎখাত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব আমাদের। ৩রা জুলাই (১৯৪০) সমগ্র বাংলায় সিরাজদ্দৌলা দিবস প্রতিপালিত হবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি আমরা ঐদিন পূজা করব। হলওয়েল শুধু নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতিকেই অকারণে মসীলিপ্ত করেনি—বিগত দেড়শত বৎসর ধরে সমগ্র জাতির দাসত্ব ও অবমাননার সাক্ষ্য হয়ে কলকাতার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে। আগামী ৩রা জুলাই থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।"

৩রা জুলাইয়ের (১৯৪০) প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রধান খবর—"সুভাষচন্দ্র বন্দী।"

পরবর্তীকালে আর একটি ঐতিহাসিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ "হিসাব নিকাশের দিন"—"Day of Reconing" এর জন্য ও পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা চলে।

সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির এবং উচ্চাঙ্গের মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাময়িক ব্যর্থতায় তিনি হতাশ হতেন না কখনো। বলতেন—আশায় বুক বাঁধো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

নেতাজীর ঐ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের দায়ে ইংরেজ সরকার মহাজাতি সদন ক্রোক করে। ইতিহাস পুরুষ নেতাজী সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও গভীর মনন-শীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ সূর্যসনাথ সুভাষচন্দ্র ॥

—রণজিৎ চক্রবর্তী

পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের ইতিহাসে, নিপীড়িত অবজ্ঞেয়-অবহেলিত মানুষের জীবন-সংগ্রামে একটি নাম একটি সামগ্রিক বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন পুরুষের কথা বর্তমান শতকে সংযোজিত হয়েছে তার স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ে—তিনি মুক্তিযোদ্ধা সুভাষচন্দ্র।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা কালে স্বাধীনতা সংগ্রামী অনেক মুক্তিযোদ্ধারই আবির্ভাব ঘটেছে, যারা আপামর গণমানসের মণিকোঠায় স্মরণীয় বরণীয়; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মত এমন ব্যাপক লোককান্ত সংগ্রামী, এমনতর বিপ্লবীর নজির বোধ হয় আর নেই।

মানুষের ব্যথায় ব্যথী হয়েই শৈশব থেকে তিনি যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যেন এই পৃথিবীতে মুক্তিকামী নিপীড়িত মানুষের নেতৃত্ব দেবার জন্যই তাঁর মহতী আবির্ভাব।

সুভাষচন্দ্রের সামগ্রিক চেতনা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির ব্রতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ যদি হয়, তা'হলে এই সত্যই আজ প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযোদ্ধার সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। তাঁর ইপ্সিত বাসনা এখনও ফলবতী হয়নি, হয়নি তাঁর স্বপ্ন সার্থক। সুভাষচন্দ্রের মত এমন একটি হৃদয়বান সংগ্রামী পুরুষের পবিত্রময় জীবন কথা, পরিপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করা-ও সহজ সাধ্য নয়। একদিকে সুগভীর ধর্মবোধ—ঈশ্বর, বিশ্বাসী হৃদয়, অন্যদিকে ক্ষাত্রতেজের অপূর্ব মণিকাঞ্চন সংযোগে এক অসাধারণ চরিত্রবত্তা ও সংবেদনশীল মানসিকতা তাঁর মধ্যে রূপলাভ করেছে।

সুভাষচন্দ্রের এই ধর্মপ্রাণতার মূলে ছিলেন তাঁর জননী প্রভাবতী দেবী। এই সুগভীর ধর্মভাবের কারণেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর মায়ের একান্ত প্রিয়তম সন্তান। শৈশবকালে তিনি মায়ের কাছে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ করতেন। কৈশোর থেকেই তিনি 'ব্রহ্মচর্য' পালন করেছেন। নানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ, রোগী এবং দুঃস্থজনের সেবার মধ্য দিয়েই তাঁর অভীষ্ট ব্রত উদ্‌যাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

কৈশোরকালেই ঈশ্বর সন্ধানী সুভাষচন্দ্রকে আমরা গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করতে দেখি। প্রকৃত সন্ন্যাস না নিলেও তিনি সন্ন্যাসী জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার একান্ত প্রয়াসী হয়ে 'সারদানন্দ' নাম গ্রহণও করেছিলেন। সারদা ছিলেন সুভাষচন্দ্রের ধাত্রী মাতা। শৈশবে সারদাই তাঁকে লালন-পালন করেন।

যাই হোক, সংসারাশ্রম ত্যাগ করে তখন বৈরাগ্যের মধ্যে মুক্তি তিনি কিন্তু পেলেন না। এক সাধকের নির্দেশেই তাঁকে বৃহত্তর কর্মসমুদ্রে অবগাহন করতে সংসারে আবার ফিরে আসতে হল। তবু সন্ন্যাস জীবনের আদর্শের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ পায়নি। এই কর্মব্রতের প্রতি তিনি চিরকালই শ্রদ্ধাশীল।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে যে তপঃব্রতের সন্ধান আমরা পাই, যে চরিত্র এবং সংবেদনশীল মনের ঔদার্যে তিনি ভারত তথা পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের কাছে বরণীয় পূজনীয়, যে উত্তরণের বাণীতে তিনি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন; সেই বাণীরই ধারক এবং বাহক, স্বামীজীর সেই স্বপ্নেরই দিশারী হচ্ছেন সূর্যসনাথ সুভাষচন্দ্র।

যুগাচার্যের পুণ্যব্রতকে সার্থক করার মানসেই যেন এই যুগনায়কের মহতী আবির্ভাব। এই দু'টি মন, দু'টি হৃদয়ের সম্পর্ক অতি সুগভীর।

একবার এলগিন রোডে নেতাজী জন্ম-জয়ন্তী সভায় সাধক শিল্পী দিলীপ কুমার রায় বহুজন সমক্ষে সশ্রদ্ধ চিত্তে সুভাষচন্দ্রকেই স্বামী বিবেকানন্দের মানস পুত্র রূপে সার্থক অভিহিত করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন, তাঁর বৈপ্লবিক কর্মময় জীবনধারা সে কথাই প্রমাণ করে। স্বামীজির প্রতি সুভাষচন্দ্রেরও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কৈশোরকাল থেকেই স্বামীজিই ছিলেন তাঁর আদর্শ পুরুষ—আরাধ্য দেবতা। তিনি বলছেন: "ত্যাগে অকুণ্ঠ, কর্মে অতন্দ্র, প্রেমে অজ্ঞাত, প্রজ্ঞায় অসীম, হৃদয়াবেগে অগম্য অথচ অন্যায়কে আক্রমণে অবিচল, নিষ্করুণ। ধূলি-মলিন এই পৃথিবীতে এই ছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিস্ময়কর স্বরূপ। স্বামীজী জীবিত থাকলে অনুগত সেবকের মত তাঁর পদ-প্রান্তেই আমি স্থান করে নিতাম, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পুণ্য প্রভাতেই আমার জীবনের উন্মেষ।" বীরেশ্বর বিবেকানন্দের মত বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র তাঁর আদর্শ প্রীতি প্রসঙ্গে বলছেন ১৯১৪ সালে, তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লেখা একটি পত্রে: "আমার নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং হৃদয়ে অনন্ত শক্তি দরকার হয় আমি এক বাড়ীতে

সকলের সঙ্গে লড়িতে পারি। আর আমার শক্তি এই জন্য যে কাহাকেও তিলমাত্র care করিনা। So long I was a Sanaysi in disguise, now I am going to be full-fleged Sanaysi এই বলিয়া যদি গৃহত্যাগ করিতে হয় তাহাই করিব আনন্দের সহিত'।

কৈশোরে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণের ব্যাপারে বাড়ীর প্রতিবন্ধকতা তাঁকে বিচলিত করলেও তাঁর জীবনের লক্ষ্য থেকে তিনি ভ্রষ্ট হননি। পরবর্তী কালে তাঁর জীবনের গতি প্রকৃতিতে সে কথাই প্রতীয়মান হয়।

সুভাষচন্দ্রের ভগবৎ উপলব্ধির বাসনা কৈশোরকাল থেকেই কত গভীর ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল, তা বোঝা যায় সেই সময় কটক থেকে তাঁর মাকে লেখা একটি পত্রে। তিনি লিখছেন: 'ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহাব দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না।...ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানব জন্ম সফল।' আর একটি পত্রে লিখছেন: 'দয়াময় ভগবান আমাদিগকে মানব জন্ম, সুস্থ দেহবুদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ দিয়েছেন কেন? তাঁহার পূজার এবং তাঁহার সেবার জন্য অবশ্য তিনি এত দিয়াছেন—কিন্তু মা আমরা কার্য্য করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি না।... আমরা সংসারের ছার বস্তু লইয়া কত অশ্রু ত্যাগ করি, কিন্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশ্যে একবিন্দু অশ্রু ফেলি না—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিন হৃদয়। ধিক সেই শিক্ষা যাহাতে ঈশ্বরের নাম নেই, নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম, যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না।'

স্বামীজির মতই বাঙালীর ক্লীবত্ব কিশোর সুভাষচন্দ্রকে ব্যথাতুর করেছিল। তাই সরোষে নিজের বেদনার্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রে আবেগ ভরে মাকে তিনি লিখছেন: 'ভগবান কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোন যুগে ছিল না, সেই নূতন "বাবু" সৃষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বর দত্ত পদযান আছে, কিন্তু আমরা ২০।২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারিনা—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুন্ঠিত হই, আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করি না—কারণ আমরা "বাবু"। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে, কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে ছোটলোকের কাজ

বলিয়া ঘৃণা করি, কারণ আমরা "বাবু" লোক। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে "বাবু"। ...আমরা সর্বত্র "বাবু" বলিয়া পরিচয় দিই কারণ আমরা "বাবু"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যরূপধারী পশু'। এই ভাবে স্বাদেশিকতাবোধ এবং স্বদেশ-প্রেমের ভাব-বন্যায় তিনি সেই শৈশবকাল থেকেই পূর্ণ অবগাহন করেছেন. তারই কারণে স্বদেশবাসীর মুক্তির পরম অভীপ্সায় তিনি নিদারুণ কর্মব্রতের জীবন সংগ্রামে ব্রতী হন।

তাই দেখা যায়, কৈশোর কালের পত্র লেখার মধ্যে সেই জাগ্রত স্বদেশ-প্রেম অবলীলাক্রমে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় অন্তর থেকে এমন ভাবে উৎসারিত হয়েছে। কটক থেকে মাতৃদেবীকে লেখা একটি পত্রে বলছেন: "আমি ভাবি বাঙালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে, কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙালীদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্মী হইয়া যায়—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়।...বাঙালীরা আজ-কাল হইয়াছে বিলাসিতাপ্রিয়—পরচর্চাকারী, কুটিল হৃদয়, পরসুখ-দ্বেষী এবং মনুষ্যত্বহীন—ভাবিলে কষ্ট হয়। ...মা আমরা এবং আমাদের দেশ দিন দিন অধঃপতনে যাইতেছে। কে উদ্ধার করিবে? একমাত্র উদ্ধারকর্তা বঙ্গ জননী—বঙ্গমাতা যদি বঙ্গ সন্তানকে নূতনভাবে প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলে পুনরায় বাঙালী মানুষ হইবে।"

মহান দেশপ্রেমের এমন উচ্ছল প্রকাশ সেই কৈশোর কালেই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যেমন রূপলাভ করেছে; তেমনি আর কোন দেশনেতার জীবনে বোধ করি করেনি। জাগ্রত দেশপ্রেমের অত্যুজ্জল মহিমায় সুভাষচন্দ্র প্রকৃতই অনন্য। কৈশোর কালের অপর একটি পত্রে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের দরদী হৃদয়ের ভক্তির মর্মগাথা অপরূপ ভাব ব্যঞ্জনায় মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। জননী প্রভাবতী দেবীকে লেখা পত্রে তিনি বলছেন: "মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান। এই মহাদেশের লোক-শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে

অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এতবার তিনি কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের আদরের দেশ।" অনুরূপ আর একটি পত্রে ভগবৎ সাধনার ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রে আক্ষেপে বলছেন: "যদি মানুষ-জন্ম লাভ করিয়া মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পৌছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে তবে মানুষ জন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামী।" করুণাময় ঈশ্বরের কথা যেমন প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা করেছেন তিনি, তেমনি দেশ জননীর কথা, ভারতবর্ষের মুক্তির স্বপ্ন কিশোর সুভাষচন্দ্রের মন প্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

কৈশোরকালেই অগ্রজকে লেখা একটি পত্রে সুভাষচন্দ্র বলছেন: "ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে? কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন। কোথায় সেই মহর্ষি মহাজ্ঞানী দার্শনিকবৃন্দ আমাদের পূর্বপুরুষগণ, যাঁহারা জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌছিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহাদের অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্ব? তাঁহাদের অনমনীয় ব্রহ্মচর্য? তাঁহাদের ভগবৎ উপলব্ধি? তাঁহাদের পরমাত্মার সহিত একাত্মবোধ?—আমরা শুধু যাহা মুখে উচ্চারণ করি। সবই গিয়াছে, বেদ মন্ত্র স্তব্ধ। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে তীরে আর সামবেদের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠে না, কিন্তু তবু আমার মনে হয় আশা আছে, এখনো আশা আছে, আশার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্বান শিখা জ্বালাইতে। তিনি ঋষি বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার দিব্যকান্তি বিশাল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সন্ধ্যা তারা উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয় নিশ্চয়ই হইবে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত অবশ্যম্ভাবী।"

কৈশোরের এ স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই ছিল না, ভবিষ্যতে বাস্তবে তাকে রূপায়িত করার প্রাথমিক সোপান মাত্র। কৈশোরেই তা বাস্তবায়িত হয়েছিল যথাযথ মানসিক প্রস্তুতিতে ও আদর্শের দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে।

পরবর্তীকালে নগ্ন-বুভুক্ষু কোটি কোটি ভারতবাসীর সেবাকেই তিনি তাঁর

ধ্যান জ্ঞান করে নিলেন। অত্যাচারিত শোষিত অসহায় ভারতবাসীর মুক্তির স্বপ্নই তাঁর ঈশ্বর সাধনায় আবর্তিত হয়ে, রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ, তিনিও বিশ্বাস করতেন 'যত্র জীব তত্র শিব।' জীব সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর সেবা তথা ঈশ্বরত্ব লাভের কামনা করেন তিনি। আর তাই তো তিনি বলেছেন: 'আকাশের দিকে যার লক্ষ্য সম্মুখে পর্বত আসছে কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission এর দিকে, আদর্শের দিকে—তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই।'

ভারতবর্ষ জগজ্জননীরই প্রতিরূপ। চিন্ময়ী জগৎ মাতারই স্থূল দেহ। মানব-সমাজ, জীবজগৎ তথা প্রকৃতির দৃষ্টিগোচর সবকিছু পার্থিব সত্তার অন্তরালে সবকিছুই ধারণ এবং পালন করছেন সেই আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী জননী। সাধারণ দৃষ্টিতে বা স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই সর্বব্যাপীতা অনুভব করা যায় না। একমাত্র সাধক ভিন্ন, তৃতীয় নয়নের উন্মীলন ছাড়া অপ্রাকৃত মহিমাময়ীর দিব্য অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ গোচর হয় না।

ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং দেশপ্রেমিকের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই অনন্য পুরুষ, যার শৈশবকাল থেকেই এই শিবদৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। জীবনের উষালগ্ন থেকেই করুণাময় ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং ভক্তির অর্ঘ নিয়ে এমনতর মহৎ আদর্শের কাছে নিজের মন-প্রাণকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন বলেই বোধকরি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যাত্রা নেতার পদে 'অধিনায়ক'রূপে অভিষিক্ত করে বলেছিলেন: 'গীতায় বলেন সুকৃ-তের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক......এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই—এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন......হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপর চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রা নেতার পদে আহ্বান করি। ......দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টি কর্তৃত্ব গ্রহণ কর তুমি।"

মহাকবির কামনাকে শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে আজো অনেক ভারতবাসী, সংখ্যাতীত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর-সাধক পরম যোগী সৈনিক-শ্রেষ্ঠ যুগনায়ক সেই বিপ্লবী বীরের আগমন প্রতীক্ষায় ব্যাকুল।

আজকের অসহায় কোটি কোটি মানুষ নীরন্ধ্র অন্ধকারে, চারপাশের তমসাবৃত নৈরাশ্যের মধ্যে এখনও সেই সূর্যনাথের আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেন। আশা ভরে এখনও সেই দিনটির দিকে তাঁরা চেয়ে আছেন যেদিন পূর্বাচলে নতুন যুগ-সূর্যের উদয় হবে।

॥ সুভাষবাদ কি এবং কেন ? ॥

—শরৎচন্দ্র বসু

আমাদের দেশে গত আঠাশ মাসের তথাকথিত "জাতীয় সরকার" যে দুর্দশার ফসল আহরণ করেছেন, যারা নিজেদের বামপন্থী অথবা সমাজবাদী (সোশ্যালিষ্ট) বলে মনে করেন, আজ তাদের কাছে সময় সমাগত, নিজেদের কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে নেবার। সত্য কথা বলার এই হোল উপযুক্ত কাল—নির্ভেজাল সত্য মুক্তকণ্ঠে, স্বাধীনভাবে এবং সাহসের সঙ্গে। মান নেমে গেছে একেবারে নীচুতলায়; আমাদের শ্রমিক, চাষী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন; কাঁচামালের অভাবে বহুল পরিমাণ কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্থ; বৃহৎ পরিমাণ জমি পতিত পড়ে রয়েছে; করভার বর্ধমান; দেবার ক্ষমতার অভাব; রোজগারের মুখে সাধারণ-মানুষ আজ অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন; বিনিময়ের মাধ্যম আংশিকভাবে জমে বরফ হয়ে গেছে। কৃষি এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির শুকনো ঝরাপাতা ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে।—আমি আবার বলি, সত্য কথা বলার এই উপযুক্ত সময়। আপনারা আপনাদের সুভাষবাদী ছাত্র যখন বলছেন তখন আমি মনে করি আপনারা নেতাজীর আদর্শে বিশ্বাসী। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই—সেই আদর্শের সারবস্তু হোল দাসত্ব, শোষণ, এবং স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটানো; সে দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক—এবং ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সরকার গঠন। নেতাজীর বাণীতে—"a socialist system in which the initiative will not be lett to private individuals, but the state will take over the responsibility of solving economic question." নেতাজীর এই মতবাদকে আদর্শ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণের এবং আপনাদের দেশে সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তব্য পালনের সময় এসেছে। এক মুহূর্তের জন্যও মনে করবেন না, আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। নেতাজীর দূরদর্শনে যে আপোষহীন সংগ্রাম ছিল এবং যার সূচনা তিনি করে গেছেন, তাকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং সুসম্পূর্ণ করতে হবে। বহুল প্রচারিত "স্বাধীনতা" যা আমরা পেয়েছি

তা হোল ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথের অভ্যন্তরে থেকে এক ধরনের "ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস্" এবং আমাদের মনে, হাতে, পায়ে এখনও থেকে গেছে দাসত্বের বন্ধন। আমাদের বৈদেশিক নীতি কর্তৃত্বাধীন না হলেও, হোয়াইট্ হল দ্বারা প্রভাবিত। এবং এই হোয়াইট্ হলের সম্মতি ব্যতিরেকে—তা প্রত্যক্ষই হোক, আর পরোক্ষেই হোক, চীনের প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন জানাবার সাহস নেই; যার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই তিন মাস আগে। আমাদের তথাকথিত নিরপেক্ষতা নয়াদিল্লীর কতিপয় মন্ত্রীর মুখের কথামাত্র; আগেভাগে তাকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ ও তার মিত্রের কাছে বন্ধক রাখতে হবে। এই হোল আমাদের স্বাধীনতার নমুনা, যা আমরা লাভ করেছি। ১৯৪৭ এর আগষ্ট এবং তার পরেও, আমি যখন দিল্লী এবং অন্যত্রের কতিপয় উচ্চপদস্থ আই. এন. এ. অফিসারের বক্তব্যের প্রতিবেদন—যা হোল—নেতাজীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে—এই কথা যখন পড়ি, তখন আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না। বিশেষ করে যাঁরা নেতাজীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়, তাঁর নেতৃত্বাধীনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন—ভারত এক এবং অবিভাজ্য—তাঁদের মুখ থেকে যখন এই ধরনের কথা শুনি, তখন তা আমার কানে এক অপবিত্র ভাষার মত শোনায়। আমি আশা করি গত আঠাশ মাসের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে নেতাজীর স্বপ্ন এখনও সার্থক হয়নি; সেই পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম আজও অব্যাহত রাখতেই হবে যতক্ষণ না লক্ষ্য লাভ হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি—সেই রাষ্ট্র, যা নেতাজীর নিজের কথায় "will function as the servant of the people." সেই তখনই, তার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত নয়, দেশের ছাত্র সমাজের, যারা নেতাজীর শপথ বাক্যে দীক্ষিত, বিশ্রাম নাই।

এই প্রসঙ্গে আমি দেশবিভাগের সেই মর্মন্তুদ ইতিহাস-কাহিনী পুনরুল্লেখ না করে পারি না, কেমন করে অস্বচ্ছদৃষ্টি দুর্বল কূটনীতি অস্বৈবিক হতাশা আকণ্ঠ পান করে, দেশের রোগ-মুক্তির জন্য অনিষ্টকর দেশবিভাগের মধ্যে সর্বরোগ-নিবারক ঔষধের সন্ধান পেয়েছিলেন। মার্চ ১৯৪৭ থেকে আগষ্ট ১৯৪৭ ছিল জাতীয় আত্মহত্যার এক দানবীয় সময়। এই সময় কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার অভ্যন্তরস্থ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি, মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শের পালে বাতাস জুগিয়ে চলেছিল, এই আত্মঘাতী মৃত্যুর জন্য তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। যেহেতু তারা হতাশার মদ আকণ্ঠ পান করেছিল, কোন সাবধান বাণীই তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো না। তাদের প্রচার যন্ত্র এতই সক্রিয়

হয়ে উঠেছিল যে তারা সমগ্র দেশকে অভিভূত করে ফেলেছিল শল্য চিকিৎসকের টেবিলে অস্ত্রোপচারের জন্য শুয়ে পড়তে। তার পরিণতি তো সেদিনের কথা—রক্তস্নান ও ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে সারিবদ্ধ গৃহহারা, বাস্তুত্যাগীর আগমন। যাই হোক দেশবিভাগ এখন ভাগ্য নির্ধারিত সত্য এবং আমাদের তা স্বীকার করে নিতে হবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মপন্থাও নির্ধারণ করতে হবে।

আপনারা কি অনুধাবন করতে পারেন, দু বৎসরের কংগ্রেস রাজত্ব আমাদের দেশের কতখানি ক্ষতি করেছে? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ছিল পৃথিবীর অন্যতম সক্ষম দেশ। এখন সে তার অমিতব্যয়ী সন্তানদের প্রথ াত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চিন্তাহীন, অর্বাচীন ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে দারিদ্রের নিম্নসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ষ্টার্লিং ব্যালান্স্‌ নিঃস্ব, তার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী স্তব্ধপ্রায়, ভারত চলেছে পশ্চিমের দ্বারে ভিক্ষার পাত্র হাতে। দেশের অভ্যন্তরের ছবি আরও পরিস্কার। দুর্নীতি, স্বজন-পোষন, পক্ষপাতিত্ব চলেছে অবাধ গতিতে, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, দুর্নীতি পরায়নতায় বিপর্যস্ত জনজীবন অসহায়, বলতে গেলে করুণভাবে তাকিয়ে আছে সরকারের দিকে। কমিশন আর কমিটির ছড়াছড়ি। কাগজী পরিকল্পনা আর আশ্বাসবাণীর নিষ্ফল প্রাচুর্য্য। আমাদের বর্তমান রাজত্বের একমাত্র অভিজ্ঞা হোল "পরিকল্পনাকারের" রাজত্ব। জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তার স্তর থেকেও বর্তমানে সাধারণ মানুষ দেউলিয়া হতে বসেছে। কিন্তু যে কোন রাজধানীতেই যান না কেন, সে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক, যাই হোক. দেখবেন, সুবিধাবাদী, সুযোগ-সন্ধানীরা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পদচারনা করছে—নিয়ন্ত্রন করছে পারমিট্‌ আর লাইসেন্স্‌ এবং বেশীর ভাগ মন্ত্রী এবং অফিসারেরা জনজীবনের এই দুর্দশার দিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করেন না। মন্ত্রীবর্গ এবং অফিসারেরা. অবশ্য তাঁদের মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রম আছে, ভেবে নিয়েছেন ভবিষ্যতের জন্য আশ্বাসদানের মধ্যেই তাদের কর্তব্যের শুরু এবং শেষ। সরকারী দপ্তরে এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের অযোগ্যতা যেমন, রেল, ডাক ও তার, টেলিফোন, যানবাহন ইত্যাদি এমনই এক স্তরে উন্নীত হয়েছে যা আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ভোগ করে চলেছি, তা কল্পনাও করা যায় না। একটা ছোট্ট উদাহরণ স্বরূপ শুধু উল্লেখ করি রেল বগির নূতন শ্রেণীবিন্যাস, আবার কয়েক মাস পরেই তা বাতিল করে আর এক ধরনের শ্রেণী বিন্যাস, যা প্রায় সেই পুরাতনেরই নবতম সংস্করণ।—শ্রেণী বিন্যাসের

খুঁটিনাটি নিয়ে একজন মন্ত্রীর খেয়াল চরিতার্থ করতে ব্যয়িত হোলো লক্ষ লক্ষ জাতীয় অর্থ। বর্হিভারতে ভারতের সম্মান, বলতে গেলে চলেই গেছে, যদিও আমাদের শাসকবর্গ সেক্রেটারিয়েটের উচুতলা থেকে ক্রমবর্ধমান সম্মানের আভাস দিয়ে চলেছেন। এর জন্য অংশতঃ দায়ী হোলো বর্তমান বৎসরে লণ্ডনে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষিত সিদ্ধান্ত যে ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবে এবং অংশতঃ দায়ী আমাদের কতিপয় অযোগ্য, অর্বাচীন এবং উদ্ভট কল্পনাবিলাসী রাজদূত। পররাষ্ট্র দফ্‌তরের 'ফুসফুস' নীতি কখনও কখনও ছিটে বেড়ার আড়াল থেকে প্রকৃত সত্যকে বের করে আনে, আর তখনই আমরা দেখতে পাই আসল রহস্য—রাজদূতরা কী পরিমাণ মুনাফাবাজী, দুর্নীতি এবং অশোভন কর্মে লিপ্ত রয়েছেন।

এই বিপজ্জনক ভারসাম্য, ধনিক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস পার্টি; যে সমস্ত অস্ত্রের বলে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তার মধ্যে অন্যতম হোলো নির্দয় ভাবে নাগরিক স্বাধীনতার দমন এবং সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ। আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যদি কোনো সংবাদপত্র সাহসিকতার সঙ্গে প্রশাসনের অভ্যন্তরস্থ দুর্নীতি এবং অন্যায় আচরণের কথা ফাঁস করে দেয় পুরস্কার স্বরূপ সরকার তাদের প্রেস কার্ড বাতিল করে দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটায়। একমাত্র পশ্চিম-বঙ্গেই এই ধরনের বাতিল আদেশ জারী হয়েছে প্রায় তিরিশটি পত্র পত্রিকার উপর। যদি কোনো সংবাদপত্র যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে রেলওয়ে টেণ্ডার গ্রহণের অনুসৃত দুর্নীতি গ্রহণের রহস্য ফাঁস করে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই জাতীয় কর্তব্যের জন্য সে অভিনন্দন পায় না; পরিবর্তে সুউচ্চ মহল থেকে আদেশ আসে, অবশ্য গোপনে,—যেন রেল প্রশাসন ঐ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠন ১৯১১ সাল থেকে কংগ্রেসের কর্মসূচী এবং নীতি। এখন তো সেই কংগ্রেসই ক্ষমতাসীন। কিন্তু এই নীতির জন্য কী মূল্য তারা দিয়েছে? অন্ধ্র অবশ্য অংশতঃ সফল হয়েছে, তার জন্য তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের দাবী কংগ্রেস অগ্রাহ্য করে গেছে। সংযুক্ত মহারাষ্ট্র, সংযুক্ত কর্ণাটক, আইক্য কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং আসামের ভাষা ভিত্তিক পুনর্মানচিত্রের দাবী, বারবার কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি সত্বেও 'জে-ভি-পি' নেতৃত্বে প্রতারিত হয়ে চলেছে। দেশ বিভাগের চারদিন পর ১৯শে আগষ্ট ১৯৪৭-এ আমি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিহারের বাংলা-ভাষী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলাম এবং তারপর থেকে আজও সেই দাবী

জানিয়ে চলেছি জনসভার মধ্য দিয়ে, বিবৃতি, টেলিগ্রাম প্রভৃতির মাধ্যমে। গত এপ্রিল মাসে, আমি দাবি রেখেছিলাম, কুচবিহার বাঙালী রাষ্ট্র মনে প্রাণে বাঙালী, পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রতিটি প্রদেশের জনসাধারণ এমনকি কুচবিহারের জনগণও সেই দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল,—"দি নেশন" পত্রিকার স্তম্ভ তার সাক্ষ্য। আমি ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির ও দাবী জানিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হয়, কোথাও রয়েছে, সুগভীর ষড়যন্ত্র—পশ্চিমবঙ্গের এই দুইটি প্রদেশকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখার। যার জন্য আমার দাবী সুপরিকল্পিত ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। আবার অপর দিকে দেখুন, সেরাইকেল্লা আর খারসোয়ন—দুটো ছোট্ট রাষ্ট্র যেখানে হিন্দী ভাষাভাষী জনগণের সংখ্যা প্রায় নগণ্য। তারা কিন্তু বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল, অন্য কোন কারণে নয়, যে হেতু বিহারের উচ্চস্তরের কিছু কংগ্রেসী নেতা দাবি জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসী অভিধানে নিশ্চয়ই এটা প্রাদেশিকতা নয়। কিন্তু যখন আমি বা আপনি ইতিহাস, ভাষা এবং কৃষ্টির দ্বারা অনুমোদিত হয়ে দাবি জানাবো বা জানাবেন, যা ১৯১১ সন থেকে কংগ্রেসেরই অনুসৃত নীতি রূপে ঘোষিত, তখন আমরা হই "সাম্প্রদায়িক" এবং দেশের ঐক্য বিঘ্নকারী শত্রু।

এই হোল বর্তমান বাস্তব সত্য—একমাত্র যারা নির্বোধ আর অন্ধ-আশাবাদী তারাই এসব কথা অস্বীকার করবে। তাহলে এর এখন প্রতিকার কি এবং এই পরিস্থিতিতে আমাদের ছাত্রদেরই বা কর্তব্য কি? আমার যুবক কম্‌রেডরা, এখন আরামে শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত অনুধ্যানের সময় নয়। আমি বেশ ভালোভাবেই জানি, এই কিছুদিন আগেও স্কুল কলেজ বয়কট করে লেখা পড়া বন্ধ রেখে যারা আপনাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন, এখন তাঁরা পটভূমি পরিবর্তন করেছেন—বলছেন, ছাত্ররা যেন রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। এর একমাত্র কারণ তাঁরা অনুভব করছেন, এই যুব সম্প্রদায়, যারা জাতীয় বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্য, যেন শুদ্ধির মন্ত্রে ক্রীয়াহীন হয়ে থাকে, বিগত আঠাশ মাসে যা ঘটেছে তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে যেন নড়াচড়া না করে। তাহলে বর্তমান রাজত্ব, যা তাদের অপদার্থতার কারণে অযোগ্যতায় পর্যবসিত, অন্য কোন দেশে যা ইতিমধ্যে বর্জিত হতো, সেই রাজত্ব যেন নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে পারে সেই কারণেই তারা দেশের বিপ্লবী শক্তিকে পঙ্গু করে দিতে চাইছে, যার ভিতর দিয়ে প্রতি যুগে পৃথিবীর অন্ধকার বিদূরিত হয়ে, এসেছে আলোর বন্যা। আমি আপনাদের পড়াশুনা পরিত্যাগের কথা বলছি না, তা কখনোই করবেন না।

আমি যা বলতে চাই, তা হোল, ক্লাসরুমের বাইরে প্রতিটি ছাত্রকে আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তব সত্যকে জানতে হবে, রাজনৈতিক সচেতন হতে হবে দেহে-মনে এবং বুদ্ধিমত্তায় নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে যাতে সঠিক সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য যে কর্তব্য ভার রয়েছে, তার জন্য আঘাত হানতে পারেন। সেই চরম মুহূর্ত, সেই শুভ লগ্ন, আমার মনে হয় সমাগত। যারা চায় মুক্ত হতে তার মুক্ত হবেই, তাদের আপন হাতেই আঘাত হানতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ, আমার মতে হোল সমাজতন্ত্রবাদ। রাজনৈতিক সংগ্রাম তখনই সম্পূর্ণতা লাভ করবে, যখন শুধু রাজনৈতিক স্তরে নয়, অর্থ নৈতিক স্তরে এই "বাদ" প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৪৩ সালে নেতাজী বলেছিলেন—"the fight for political freedom will have to be conducted Simultaneously with the fight for socio-economic emanicipation. The party that will bring political freedom to India will be the party that will put into effect the entire programme of socio-economic reconstruction." যথার্থ অর্থে কংগ্রেস দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে অক্ষম হয়েছে। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য হোল দেশ অতি দ্রুত অর্থনৈতিক দাসত্বের পথে এগিয়ে চলেছে। আপনাদের এখন এই উভয় ক্ষেত্রেই সংগ্রাম করতে হবে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নেতাজী সুদূর প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যখন 'leftism will mean socialism and the task before the people will then be the reconstruction of national life on a socialist basis' সেই সময় আজ সমাগত। ভারতে ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট অর্গানাইজেশনের জন্ম সেই সময়কে সমকালবর্তী করে তুলেছে। সেই সংগঠন গড়ে উঠেছে, কয়েক বছর ধরে কিছু বামপন্থী এবং সমাজবাদী ও ব্যক্তিগত মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে। এর আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীও রয়েছে আপনাদের সামনে। আমি তাদের অনুকূলে আপনাদের সেগুলি জানতে অনুরোধ করি, তা'হলেই আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন আপনাদের সম্মুখে কী কাজ। আমি এ-বিষয়েও নিশ্চিত যে তারা আপনাদের সংযুক্ত ছাত্রসংস্থা (united students organisation) গঠনের আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয় অনুধাবন করাতে পারবেন—যার মধ্য দিয়ে নেতাজীর আদর্শ অনুযায়ী "সমাজতন্ত্রের উপর জাতীয় জীবনের পুণর্বিন্যাস"-এর জন্য কাজ

এবং সংগ্রাম করার সুযোগ দেবে। আশাকরি, আমার কথা এই কনফারেন্সের চার দেওয়ালে আবদ্ধ না থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে—এমন কি তাদের কাছেও পৌঁছাবে যারা বৎসরাধিক কাল ধরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কাজ করে আসছেন।

এবার আমি আপনাদের অন্য একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনাদের সকলে না হলেও, কেউ কেউ নিশ্চয়ই পড়েছেন, গত ১৯৪৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর "দি নেশনে" প্রকাশিত গত দিনের প্রস্তাব যা United socialist organisation-এর Provincial general council-এ গৃহীত হয়েছে—তাতে আহ্বান জানানো হয়েছে ১৯৫০ এর ২৩শে জানুয়ারী শুধু নেতাজীর জন্মদিবস রূপেই পালিত হবে না, 'কমনওয়েলথ বিরোধী দিবস' রূপেও পালিত হবে—Indian constituent assembly অনুমোদিত শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদ দিবস, যা অসম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক—জনসংখ্যার সামান্য অংশের প্রতিনিধিত্ব—তাও পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা। যারা এই খসড়া শাসনতন্ত্র দেখেছেন এবং Indian constituent assembly তে তার ওপর বাদানুবাদ লক্ষ্য করেছেন, তাদের নিশ্চয়ই একথা বোঝাতে হবে না যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর উদ্দেশ্য রেখেই এই শাসনতন্ত্র রচিত—যার মধ্যে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায় বিচার অনুপস্থিত। এছাড়া এর অন্য কিছু হবার নেই; প্রথমত: "কমনওয়েলথের ভিতরে প্রজাতন্ত্র" শাসনতন্ত্র বিধি বা ইতিহাসে অজ্ঞাত, এবং দ্বিতীয়ত: দেশসেবক এবং পরিষদ, প্রজাতন্ত্রী এবং রাজার বন্ধু, ধনতন্ত্রবাদী এবং অবাস্তব সমাজতন্ত্রবাদী, ধর্মযাজক এবং বিভ্রান্ত নরমপন্থী, এবং চরম স্বৈরতন্ত্রী চ্যাম্পিয়নদের সম্মিলিত জ্ঞান বা অজ্ঞান, এর চেয়ে ভালো কিছু দিতে পারে না। আপনাদের মধ্যে কারুর কারুর নিশ্চয়ই স্মরণ আছে ১৯৩৯ সালের কথা। রামগড়ের আপোষ বিরোধী সম্মেলনে নেতাজী সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় উদগ্রীব। তিনি তখন যা বলেছিলেন ১৯৪৭-এ তাই সত্য বলে প্রমাণিত হোলো। এখন ১৯৫০-এর ২৩শে জানুয়ারী সারা ভারতের ছাত্র-সমাজের সমস্বরে ঘোষণা করার দিন—২৬শে জানুয়ারী থেকে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছ, সেই শাসনতন্ত্র বাতিল কর, যাতে জনগণ অনুভব করতে পারে যে এ তাদের পায়ের ফাঁস—এবং যতক্ষণ তা বাতিল না হচ্ছে, ততক্ষণ বিশ্রাম নেই।

এবার আপনাদের কাছে বলব চরিত্র এবং নিয়মানুবর্তিতার মূল্য সম্বন্ধে;

সাধারণ অর্থে নয়, রাজনৈতিক জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি সেই ধরণের কোন নীতিবাক্য বলবো না, যা কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা বলে থাকেন নীতিশাস্ত্র আউড়িয়ে। আমি বাস্তব জীবন থেকে আপনাদের দৃষ্টান্ত দেব। আমি ১৯৩৫ সাল থেকে বলে আসছি এবং সেই একই কথা বলতে আমি এখনও ক্লান্ত নই—যে নীতিজ্ঞানহীন সে কখনও রাজনীতিতে নির্ভুল হতে পারে না। বেশীর ভাগ কংগ্রেস নেতা যারা সময়ে অসময়ে বলে থাকেন যে তাঁরা গান্ধীনীতির অনুগত, গান্ধীর নামটুকু পর্যন্ত মুখে আনার তাঁদের কোন অধিকার নেই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কতজন সভ্য গান্ধীনীতির সত্য, অহিংসা, উন্নত আচরণ এবং আদর্শ চরিত্রের পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবেন? আজ যারা মাদক বর্জনের স্বপক্ষে পরিশীলিত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে তাঁরা ধর্মতঃ নিজেরা মদ্যপান ত্যাগ করছেন? তাঁদের মধ্যে কতজন নিজেদের বুকে হাত রেখে বলতে পারেন যে চরিত্র এবং নিয়মানুবর্তিতায় যাঁরা ছাত্র সমাজকে উন্নত হবার জন্য আহ্বান জানান, তাঁরা নিজেরা তার কতটুকুর অধিকারী? সেইজন্য, আমি আপনাদের এই উপদেশ দেব যে আপনারা ওদের আদর্শ হিসাবে সামনে রাখবেন না। আদর্শ হিসাবে আপনাদের সামনে যোগ্য আদর্শ হলেন নেতাজী; যাঁর আদর্শে আপনারা আপনাদের জীবনকে গঠন করতে পারেন—এবং তা যদি করেন, তাহলে আপনারা কখনই ভুল করবেন না। তিনি যেমন তাঁর সহকর্মীর এবং অনুগামীর প্রিয়পাত্র ছিলেন, আপনারাও তেমনি আপনাদের কমরেডদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবেন। আপনারা সক্রিয় হবেন সেই সব বিপথগামী যুবকদের সংযত করতে যারা বোমা এবং অ্যাসিড বাল্ব নীতিতে বিশ্বাসী, এবং তাদের অনুধাবন করান যে মুক্তি—ও পথে নেই। সর্বোপরি আপনাদের কর্তব্য হবে সর্বশ্রেণীর ছাত্র এবং যুবসম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করা—সেই ঐক্য যা ছিল নেতাজীর মনঃশ্চক্ষে এবং যাকে তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন—"We have to distinguise between the unity of action and the unity of inaction—between the unity which make from progress and the unity which brings stagnation." কাজ চাই যাতে মাতৃভূমির উন্নতি সাধিত হয়; কষ্ট স্বীকার করতে হবে যাতে সে খুশী হয় (work that your motherland may prosper; suffer that she may rejoice.) জয় হিন্দ॥

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৯-এ নিখিল ভারত সুভাষবাদী ছাত্র কনফারেন্সে প্রদত্ত উদ্বোধনী অভিভাষণ থেকে সংগৃহীত।

॥ দেশভাগ নয়
জিন্নাহ্-ই স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হোন ॥

—কৃত্তিবাস ওঝা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন. মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ যদি পাকিস্তান দাবির প্রস্তাব শিথিল করে অবিভক্ত ভারতের মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব কার্যকর করবার সিদ্ধান্তে রাজী হতেন—তাহলে হয়তো ভারত বিভাগ হতো না, সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগেরও প্রয়োজন হতো না। মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্-ই অখণ্ড স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতেন। সুভাষচন্দ্র নিজে এই প্রস্তাব মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্র কাছে দিয়েছিলেন—দিয়েছিলেন শ্রীজহরলাল নেহরুর কাছেও। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্ ও শ্রীনেহরু সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাবে একমত হননি। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ঐক্য, নেহরু জিন্নাহ্র মিলন অসম্ভব বুঝতে পেরেই সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এ সিদ্ধান্ত ছিল অনন্যোপায় সিদ্ধান্ত। সুভাষচন্দ্র জিন্নাহ্র সঙ্গে বোম্বেতে শেষবার সাক্ষাৎ করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মঞ্চে সামিল হবার এবং জিন্নাহ্কে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূপে মেনে নেওয়ার যে প্রস্তাব করেছিলেন এবং জিন্নাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যখন ছুটে গিয়েছিলেন জহরলালের কাছে—এ কাহিনী হলো সেই সুভাষচন্দ্র-জিন্নাহ্র সাক্ষাৎকারের কাহিনী। ভারতবর্ষের ইতিহাস একটা বাঁকের মুখে এসে কিভাবে ভিন্ন পথ গ্রহন করেছিলো—এ হলো সেই পথ চলার কাহিনী।

সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনে একটি সত্য শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের ভাগ্য নির্ভর করে এ দেশের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রধান গ্যারান্টি। দেশবন্ধুর মানস-পুত্র হিসাবে সুভাষচন্দ্রের এই মানসিকতা লালিত ও পালিত হয়েছিল। দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' প্রণয়নের পরিবেশে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত

হিন্দু মুসলমান ঐক্য তাঁর রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। সুভাষচন্দ্র একটি নিষ্ঠুর এবং নির্মম সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন যা হলো ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশির ভাগই কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল হয়নি। ইংরেজের কূট-রাজনীতি হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ইন্ধন যুগিয়েছে সত্য, কিন্তু মুসলিম লীগই মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের মন জয়ে সমর্থ হয়েছে। এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়েই সুভাষচন্দ্র লীগের সঙ্গে একটা আপষ—একই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়েব মন জয়ের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই হরিপুরা কংগ্রেস শেষ হবার পর সুভাষচন্দ্র প্রথম যে কাজটা করেছিলেন তা হলো মিঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৯৩৮ সালের ১১ই মে এই সাক্ষাৎকার ঘটে এবং আলোচনা চলে এক নাগাড়ে চারদিন ধরে।

সেই সময় সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ২৬ নং মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাইয়ের একটি বাড়িতে আর মিঃ জিন্নাহ্‌ মালাবার হিলস্‌, লিটল গিবস রোডের একটি বাড়িতে। পর পর চারদিন আলোচনার পর ১৪ই মে জিন্নাহ্‌-বসু প্রস্তাব বিনিময় হলো। বসু প্রস্তাব প্রেরণ করেন ১৪ই মে, জিন্নাহ্‌ ৬ই জুন। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বসু-জিন্নাহ্‌র পত্রালাপ ও প্রস্তাব বিনিময় চলে। মিঃ জিন্নাহ্‌ মুসলিম লীগ একজিকিউটিভ কমিটির প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রকে জানালেন "মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানগণের প্রামাণিক ও প্রতিনিধি-স্থানীয় সংগঠন—একমাত্র এই ভিত্তি ছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম মীমাংসার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা বা কংগ্রেসের নিকট এই প্রস্তাব করা কখনই সম্ভবপর নয়।" [৬ই জুন '৩৮ সুভাষচন্দ্রকে লেখা জিন্নাহ্‌র পত্র]

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ২৫শে জুলাই '৩৮ জিন্নাহ্‌কে একটি পত্র প্রেরণ করলেন যার মর্মার্থ হলো—মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন একথা কংগ্রেসের পক্ষে মেনে নেওয়া কি করে সম্ভব? সুভাষচন্দ্র বললেন, "ওয়ার্কিং কমিটি আশা করে যে, লীগ কাউনসিল কংগ্রেসকে অসম্ভব কিছু করতে বলবে না। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, লীগের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করতে এবং হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মতো বহু বিতর্কিত প্রশ্নের একটি সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হতে কংগ্রেস কেবলমাত্র ইচ্ছুক নয় আগ্রহীও বটে। এই পর্যায়ে কংগ্রেসের দাবী কি তাও বলে রাখা ভালো। যদিও অগণিত কংগ্রেস সদস্যদের তালিকায় সর্বাধিক নাম যাদের তারা হিন্দু—ও কথা মেনে নিলেও বহু সংখ্যক মুসলিম এবং বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও

কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত।" "তবুও ওয়ার্কিং কমিটি আনন্দিত হবে যদি আপনার কাউনসিল কংগ্রেসের সঙ্গে এমন একটা বোঝাপড়ায় আসে যাতে আমরা জাতীয় অখণ্ডতা অর্জন করতে পারি এবং একই ভবিষ্যতের জন্য সর্বান্তকরণে কাজ করে যেতে পারি।"

সুভাষচন্দ্র মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যত তাড়াতাড়ি একটা সুরাহার পথে যেতে চান—তাঁর নিজের দলে দেখা যায় যে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের পায়ের তলা থেকে পাটাতক সরিয়ে নেবার চক্রান্ত তত দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলে। আর তারই ফলস্বরূপ একটা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়ে সুভাষচন্দ্র যেমন মিঃ জিন্নাহ্ বা মুসলিম লীগের সঙ্গে কখনও রাজনৈতিক মীমাংসার অবসান ঘটাতে পারলেন না, তেমনই চক্রান্তেরই শিকার হয়ে দেশে থেকে এই স্বাধীনতা যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, জেলে পচে মরা ছাড়া অন্য পথ নেই—এই চিন্তায় পাগল হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হলেন। তাই সেদিন যদি সুভাষচন্দ্র-জিন্নাহ্‌র মধ্যে রাজনৈতিক মীমাংসা সফল হতো, তাহলে ভারত বিভাগ হতো না, সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ করতেন না এবং জিন্নাহ্‌ই হতেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এই কাহিনীতে আসতে আমাদের একটু পিছনের কাহিনীতে যেতে হবে।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের আপষকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রস্তাবিত "যুক্তরাষ্ট্রকে" বিরোধিতা করতেই মূলতঃ বামপন্থী ও প্রগতিপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়। এরই সমর্থনে ১৮ই আগস্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রাদেশিক কিষাণসভা, লেবার পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, প্রগতি লেখক সংঘ "যুক্তরাষ্ট্র" পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। এই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনায় বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ-চন্দ্রকে ২য় বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন কেন্দ্র করেও বিরোধ দানা বেঁধে ওঠে এবং কংগ্রেসের মধ্যে ন্যাশনাল ফ্রন্টই সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায়। ১৯৩৮ সালের ১৭ই অক্টোবর সাজ্জাদ জাহির, জেড এ আমেদ, মোহন সিং যশ, ভগৎ সিং, রামমূর্তি, পি. সুন্দরাইয়া, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যরা এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন দাবি করেন। ঠিক একই ভাবে ২২শে অক্টোবর হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ হাসান আলী, মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, আবুল মনসুর আমেদ, এ রশিদ খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতারা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবী জানান।

বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি করতে চান—এই প্রচার দানা বাঁধতেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা প্রকাশ্য ভাবেই সুভাষচন্দ্রের বিরোধীতায় নামল। এক মিলিত বিবৃতিতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জানালেন যে, মৌলানা আজাদ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাক্রমেই পট্টভি সীতারামাইয়াকে এবার মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে: অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র মনোনয়ন পাবেন না। ২৫শে জানুয়ারী '৩৯ এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বললেন, "১৯৩৪ সাল থেকে একজন বামপন্থী কংগ্রেস-সভাপতি হয়ে আসছেন। এই বৎসর যে উক্ত প্রথার পরিবর্তন হচ্ছে ও দক্ষিণপন্থী প্রার্থীকে সভাপতি করার চেষ্টা হচ্ছে, তা নিরর্থক নয়।......বর্তমান অবস্থায় এমন একজন কংগ্রেস সভাপতির প্রয়োজন, যিনি মনে প্রাণে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী।" এইদিন বরদৌলি থেকে সর্দার প্যাটেল, জে বি কৃপালনি, ভুলাভাই দেশাই, জয়রাম দাস দৌলতরাম, শংকর রাও দেও, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ বিবৃতি দিয়ে বললেন, "আমরা মনে করি খুব গুরুতর কারণ না ঘটলে বিদায়ী সভাপতিকে পুনরায় নির্বাচন না করার নীতিই অক্ষুণ্ণ রাখা উচিৎ"।

নির্বাচন হলো এবং গান্ধীজীর সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হলেন কংগ্রেস সভাপতি। ১৯৩৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ বড় বড হরফে ছাপা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ সম্পর্কে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। গান্ধীজী বলেন, "গোড়া হতেই আমি তাঁর পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম। নির্বাচনের প্রচারপত্রে তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা আমি সমর্থন করিনা। মৌলানা সাহেব তাঁর নাম প্রত্যাহার করবার পর আমার চেষ্টাতেই পট্টভি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান নি। অতএব এই পরাজয় তাঁর অপেক্ষা আমার বেশী।......সুতরাং যারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করেন, তাঁরা বাইরে চলে যেতে পারেন।" নির্বাচনী যুদ্ধে সুভাষচন্দ্র ও সীতারামাইয়ার মাঝখানে গান্ধীজী এসে পড়লেন। জওহরলাল এই সময় শান্তিনিকেতনে। ২রা ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র জওহরলালের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র এলাহাবাদে আবার জওহরলালের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঐ দিনই গান্ধীজীর পরামর্শ ও নির্দেশ ভিক্ষা করেন। এই আলোচনায় অবশ্য কোন ফল হয়নি।

গান্ধীজী বললেন, "সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যরা একই কমিটিতে তাঁর

সঙ্গে কাজ করবেন না।" ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৭ই ফেব্রুয়ারী কোলকাতা ফিরে এলেন।

সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির সভা। ডাঃ নীলরতন ধর প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা তাকে কোন মতেই ওয়ার্ধায় যেতে দিলেন না। সুভাষচন্দ্র সমস্ত অবস্থা জানিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভা স্থগিত রাখার কথা বললেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না। নির্ধারিত সময়ে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সর্দার প্যাটেল প্রমুখ ১২ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলেন। ৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেস শুরু হবার কথা। সুভাষচন্দ্র তখনও অসুস্থ। ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অসুস্থ শরীরে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী যাত্রা করলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় জ্বরের কারণে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকতে পারলেন না। বিষয় নির্বাচনী সভায় স্ট্রেচারে করে সুভাষচন্দ্রকে আনা হলো; এই দিনই গোবিন্দ বল্লভ পন্থ গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও অনুসৃত নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব রাখেন। সুভাষচন্দ্র আপষ আলোচনার দ্বারা প্রস্তাবটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করার অনুরোধ জানান। কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। দুই দিন আলোচনায় পন্থ প্রস্তাব ২১৮-১৩৫ ভোটে গৃহীত হয়। অসুস্থ সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্য অধিবেশনেও থাকতে পারেন নি।

এই মুহূর্তে ইউরোপে মহাযুদ্ধের করাল ছায়া ঘনিয়ে এলো। ১৫ই মার্চ নাৎসীবাহিনী প্রাগ-নগরী অধিকার করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিপুরীতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে শেঠ গোবিন্দদাস গান্ধীজীকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেন ও পাঞ্জাবের একদল প্রতিনিধি ধ্বনি দেন, "মহাত্মাজী কী জয়" "হিন্দুস্থান কী হিটলার কী জয়।"

কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব রাখলেন যে, ছ মাসের সময় দিয়ে বৃটিশ সরকারকে চরমপত্র দেওয়া হোক। গান্ধীজী এবং নেহরু যুক্তভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফল হয় এই যে, কংগ্রেস সভাপতির নিজের প্রস্তাব নিজের দলেই অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, "সভাপতি হইল, দল তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল না। উপরন্তু দেখা গেল যে, সভাপতির পক্ষে যাহাতে কাজ করা অসম্ভব হয়, ঐ উদ্দেশ্যে গান্ধীদল প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁহার বিরোধিতা করিতেছে। তাঁহাকে কংগ্রেস পরিচালনার ক্ষমতা না দিতে গান্ধীদল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং সাক্ষী গোপাল সভাপতি রূপেই তাঁহাকে বরদাস্ত করিত।...কাজেই সভাপতিত্ব হইতে

পদত্যাগ করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বিকল্প ছিল না। ১৯৩৯ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে লেখক তাহাই করিলেন।" (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম': পৃঃ ৩৫১)

সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন তথা কংগ্রেস ত্যাগে বাধ্য করার যে চক্রান্ত উঠেছিল সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "১৯৩৯ সালের বহু পূর্বেই লেখক নিশ্চিত রূপে বুঝিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের আকারে আন্তর্জাতিক একটা সংকট দেখা দিবে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের উচিৎ ঐ সংকটের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করা। মিউনিক চুক্তির পর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে এ বিষয়ে ভারতবাসীদের মধ্যে চেতনা সঞ্চয়ের জন্য তিনি চেষ্টা চালাইয়া আসিয়াছেন এবং বৈদেশিক ঘটনা স্রোতের সহিত তাল রাখিয়া স্বীয় নীতি রূপায়ণে কংগ্রেসকে প্রবৃত্ত করিতে তৎপর হইয়াছেন। এই কাজে প্রতি পদক্ষেপে গান্ধীদল তাঁহাকে বাধা দিয়েছে। কারণ, আসন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার কোন বোধশক্তি ছিল না এবং জাতীয় সংগ্রাম এড়াইয়া বৃটেনের সহিত একটি আপষের জন্য সাগ্রহে তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল।" (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম: পৃঃ ৩৫২)।

"১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতেই মহাত্মা গান্ধী দৃঢ়তার সহিত বলিয়া আসিতেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের কোন প্রশ্ন উঠে না। অপরপক্ষে লেখকের ন্যায় অন্যান্যরা যাহাদের দেশপ্রেম তাহাদের অপেক্ষা কম ছিল না, সমান নিশ্চিত ছিল যে, ভিতরে ভিতরে দেশ বিপ্লবের জন্য এত প্রস্তুত পূর্বে কখনও হয় নাই এবং আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে ভারতের পক্ষে তাহার মুক্তি অর্জনের এমন সুযোগ আসিবে, মানবসমাজের ইতিহাসে যে সুযোগ কদাচিৎ আসে।" (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম: পৃঃ ৩৫৩)।

সেই সুযোগ এলো, কিন্তু সুভাষচন্দ্র সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলেন না। তিনি মনে প্রাণে বুঝেছিলেন আন্তর্জাতিক কোন সংকট দেখা দিলে বৃটিশ সরকারকে আক্রমণ করার কোন্ পথ গান্ধীজী এবং গান্ধীপন্থীরা গ্রহণ করবেন। বাস্তব ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের এই চিন্তা হুবহু মিলে গেল। ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটিশের সাথে জার্মানীর যুদ্ধ লাগল। ৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী লর্ড লিনলিথগো-র সঙ্গে দেখা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বললেন যে, "ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বৃটেনের বিপদের সময় ভারতের উচিত তাহার সহিত সহযোগিতা করা।" গান্ধীজী বললেন, "এই যুদ্ধে আমার সহানুভূতি বৃটিশ ও

ফ্রান্সের দিকে। ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট বা ওয়েস্ট মিনিস্টার ধ্বংস হবে এ দৃশ্য আমার সহ্য করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা আমি এখন মোটেই ভাবছি না।" আর ১৮ই জুন সুভাষচন্দ্র বললেন, "স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন গোঁজামিলের অবকাশ নেই। কোন ভুয়ো প্রতিশ্রুতি নয়, কোন গোঁজামিল নয়, কোন টালবাহানা নয়—একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা। সবাই প্রস্তুত হও, লগ্ন আসন্ন। ইওরোপের প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে ভারতের ওপর বৃটিশের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে আসবে। তাই এই গভীর সংকটে বৃটিশের জন্য চোখের জল না ফেলে ভারতবর্ষকে নিজের কথা ভাবতে হবে। ভারতবর্ষকে এক্ষুনি ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাতে হবে।"—অর্থাৎ বৃটেনের চরম সংকটে তার ওপর আঘাত হানো—এ ছিল সুভাষচন্দ্রের নীতি আর গান্ধীজীর নীতি হল বিপদে পড়া ইংরেজকে আরও সাহায্য করা। এক্ষেত্রে নেহরুর ভূমিকা ছিল আরও বিস্ময়কর। বাহ্যতঃ নেহরুজী সুভাষচন্দ্রের নীতি সমর্থন করেন—এমন একটা ধারণা সর্বত্র করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু কার্যত তিনি ছিলেন গান্ধীজীর মত ও চিন্তার এক নম্বর সমর্থক।

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালে অসুস্থ হয়ে রয়েছেন জামাডোবার জিয়ালগোরায়। এই অসুস্থ অবস্থায় ১৯৩৯ সালের ২৮শে মার্চ সুভাষচন্দ্র জহরলালকে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। যে পত্রখানি কংগ্রেসের ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিশেষ। দীর্ঘ পত্রের শেষে সুভাষচন্দ্র খুব দুঃখ বেদনায় জহরলালকে প্রশ্ন করছেন, "এবার তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি তোমার নীতি ও কার্যক্রম স্পষ্ট কথায় বুঝিয়ে বল। ধোঁয়াটে তত্ত্বকথায় নয় —বাস্তব কাজের কথায়। আমার আরও জানতে ইচ্ছে করে তুমি কী। সোস্যালিষ্ট? বামপন্থী? মধ্যপন্থী? দক্ষিণপন্থী? না গান্ধীবাদী—না অন্য কিছু? [কোন পথে!—সুভাষচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা ২২৭]

কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে; জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় কংগ্রেসের ভবিষ্যত কর্মসূচী থেকে সত্যাগ্রহ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া কংগ্রেস মন্ত্রীদের সমালোচনাও নিষিদ্ধ হয়। এর প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থী সমন্বয় কমিটি সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়। ২৫শে জুলাই বি পি সি সি'র রিকুইজিশন সভায় পুরাতন কার্যকরী সমিতির জায়গায় নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত করা হয়। ১৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জনকে বাদ দিয়ে নতুন বি পি

সি সি গঠিত হলো। সুভাষচন্দ্র এই সময় জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ পালনের ডাক দিলেন। ১২ই আগস্ট ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সুভাষ চন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হলো। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হলো, "গুরুতর নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্ম শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে বি পি সি সি র সভাপতি পদে অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস থেকে শ্রীবসু তিন বছরের জন্ম কোনও নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।"

ইতিহাস এগিয়ে গেল। এলো ১৯৪০। বিশ্ব সংকট আরও ঘনীভূত। সংকট কংগ্রেসের রাজনীতিতেও। গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘাতে নামতে দ্বিধাগ্রস্ত এবং উৎসাহহীন—এই বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের পাশে সুভাষচন্দ্র আপষ-বিরোধী সম্মেলন করলেন। আপষ-বিরোধী সম্মেলন থেকে সুভাষচন্দ্র জাতীয় সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্যে এক কর্মসূচী প্রচার করলেন। এ-সবেরই উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা। আর সেই সংগ্রামে কংগ্রেসকে যুক্ত করা।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যখন মরণ-পণ লড়াইয়ে প্রবৃত্ত, তখন কিন্তু চিহ্নিত বামপন্থীরা একে একে সুভাষচন্দ্রকে ত্যাগ করলেন। ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কম্যুনিষ্ট পার্টি—যার নেতা পি রামমূর্তি ও ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ—তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্রকে ত্যাগ করলেন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি—যার নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। সুভাষচন্দ্রকে ত্যাগ করলেন মানবেন্দ্র রায় ও তাঁর অনুগামীরা। সুভাষচন্দ্র তাঁর এই ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে ঝুঁকলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের দিকে। সুভাষচন্দ্র চাইলেন, অনগ্রসর মুসলমান শ্রেণীকে যদি মুসলীম লীগ রাজনীতির আওতার বাইরে এনে মুক্তি আন্দোলনে সামিল করা যায়, তাহলে—যেসব সুবিধাবাদী বামপন্থী অথবা আপোষকামী বামপন্থী তাঁকে ছেড়ে গেছে, সে ক্ষতি পূরণ হতে পারে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে যখন রামগড়ে কংগ্রেস এবং সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আপষ বিরোধী সম্মেলন হলো, সেই একই সময়ে লাহোরে মুসলীম লীগের অধিবেশনে গৃহীত হলো বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাব-ই পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। ১৯৪০-এর ২৩শে মার্চ মুসলীম লীগ সম্মেলনে এই প্রস্তাবটি পেশ করেন জনাব

একে ফজলুল হক। হক সাহেব রচিত প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' বলে কোনো শব্দের উল্লেখ ছিল না—। প্রস্তাবে ছিল পশ্চিম ভারতের কয়েকটি রাজ্য এবং পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যকে নিয়ে স্বাধীন সার্বভোম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সুভাষচন্দ্র যখন দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করবার ছক তৈরী করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, লাহোর প্রস্তাব অর্থাৎ মুসলিম লীগের সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব সে পরিকল্পনায় প্রচণ্ড আঘাত হানলো। সুভাষচন্দ্র তবু হাল ছাড়লেন না। মার্চ মাসের পরেই এপ্রিল মাসে কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচন। সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেললেন। সুভাষচন্দ্র এই চুক্তি সম্পর্কে ফরওয়ার্ড ব্লকে এক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়তে লিখলেন, "ভাগ্য যদি অনুকূল হয়, এই ধরনের বোঝাপড়ার ক্ষেত্র ও প্রয়োগ সম্ভাবনা একদিন এত ব্যাপক হবে যে, তার মধ্যে প্রদেশ ও দেশ সম্পর্কিত অনেক বড় বড় প্রশ্নও থাকবে। মুসলিম লীগের সঙ্গে বর্তমান চুক্তিকে আমরা বিরাট একটি কীর্তি বলে মনে করি, বাস্তবতার দিক থেকে নয়—সম্ভাবনার দিক থেকে। গত তিন বছর ধরে আমরা অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু সাফল্য লাভ করিনি। প্রতিবারই সাম্প্রদায়িক সংস্কার বিদ্বেষে অনড় এক দেওয়ালে আমরা প্রতিহত হয়েছি এবং আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। এই আমরা সেই দেওয়াল ভেদ করতে পেরেছি এবং তার ফাটল দিয়ে আশার আলোক-রশ্মি দেখা যাচ্ছে। এবারে কিছুটা আশা হচ্ছে যে, আমরা হয়তো এমন একটা সমস্যার শেষ পর্যন্ত সমাধান করতে পারব যা অনেকের কাছেই প্রায় সমাধানের অতীত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সামান্য সূত্রপাত থেকে অনেক সময় বিরাট বিরাট কীর্তির উদ্ভব হয়।" (কংগ্রেস ও সাম্প্রতিক সংগঠন, ফরওয়ার্ড ব্লকের স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়)।

সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ মৈত্রীতে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর জয়জয়কার হলো। "বস্তুতঃ এই সময়ে সুভাষবাবু বাংলার তরুণদের একরকম চোখের পুতুলী আর একদিকে কোলকাতা মুসলিম লীগ ও মুসলিম ভোটারদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই দুই পক্ষের মৈত্রী ভোটারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করলো। নির্বাচনে জয়জয়কার।" (পাকিস্তান আন্দোলন : ১৯৪ পৃষ্ঠা)।

সুভাষচন্দ্রের এই রাজনীতি নানা প্রকারে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। শুধু কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব নয়, জাতীয়তাবাদী অনেক মুসলমান নেতাও

সুভাষচন্দ্রের মুসলিম লীগের সঙ্গে আপষের চেষ্টা ভালচোখে দেখছিলেন না। 'কৃষক' পত্রিকার নানা লেখায় এবং ডাঃ আর আমেদ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, আবুল মনসুর আমেদ প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে সুভাষচন্দ্রের কাজের সমালোচনা করলেন। অমৃত বাজার পত্রিকা এবং হিন্দুমহাসভা, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। "হিন্দুমহাসভা এবং অমৃত বাজার পত্রিকার মত সংবাদপত্রের কৃতিত্ব এই যে, তাহারা হঠাৎ অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতার পোষকতা করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের এবং অন্যত্র হিন্দুদের মন বিষিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক বিষউদ্‌গার করে চলেছে।" (৪ঠা মে, ১৯৪০ : ফরওয়ার্ড ব্লকে স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়)।

সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। কৃষক পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আমেদ—যিনি সুভাষচন্দ্রের একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় মত প্রকাশ করে বললেন যে, ভারতবর্ষ থেকে যদি ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তাহলে কংগ্রেসকে ও মুসলিম লীগকে একটা আপষের মঞ্চে আনা দরকার। কংগ্রেস এবং মুসলমান লীগের রাজনীতি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চীনের প্রাচীর তৈরী করে ফেলেছে; এই প্রাচীর ভাঙতে চাই—তারই সূচনা হলো কোলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচন। আবুল মনসুর আমেদ ও সুভাষচন্দ্র বৈঠকে বসলেন। এই বৈঠকে যে কথা হলো, তার কিছু অংশ আবুল মনসুর আমেদের 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি : "সুভাষবাবু অন্তরের দরদ দিয়া যা বলিলেন, তার মর্ম এই : হিন্দু মুসলিম ঐক্য ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই। মুসলিম লীগ মুসলিম জনগণের মন জয় করিয়াছে। ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটা চীনা দেওয়াল উঠিয়া পড়িয়াছে। সে দেওয়ালের জানলা নাই। একটা সুরাখও নাই—যার মধ্য দিয়া মুসলমানদের সাথে কথা বলা যায়। এইখানে সুভাষবাবু আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিলেন, 'আমি মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাই, তাদের সাথে মিশতে চাই। বলুন মনসুর সাব, মুসলিম লীগ ছাড়া আর কার মারফত এটা করতে পারি? আর কোনও রাস্তা আছে কি?'

আমি তাঁর সাথে একমত হইলাম। সত্যই আর কোনও রাস্তা নাই। বলিলাম : 'কিন্তু আপনে যে সুরাখ বার করছেন, ওটা বড়ই ছোট। বড় সুরাখ করেন। জানালা—এমন কি দরজা বার করেন। সিদ্দিকী, ইস্পাহানারে

না ধরে স্বয়ং জিন্না সাহেবকে ধরেন। মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান—এটা মানলে জিন্না সাহেবের সাথে কথা বলাই আপনার উচিৎ।" (রাজনীতির পঞ্চাশ বছর : পৃষ্ঠা—১৯৬)।

সুভাষচন্দ্র বললেন, "তিনি জিন্নাহ্‌র সাথে কথা অনেকবার বলেছেন, এখনও কথা বলতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না; কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব। মুসলিম লীগ লাহোরে একটা ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাশ করিয়েছে। তার চেয়ে বড় বিপদ হলো, ওরা আমাদের হক সাহেবকেও দলে ভিড়িয়ে ফেলেছে।" আবুল মনসুর আমেদ সুভাষচন্দ্রকে বললেন, 'মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব ভিত্তি করেই আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায় কি না, দেখুন না।' সুভাষচন্দ্র আর আবুল মনসুর আমেদ মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব সামনে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। এই বৈঠকটা অনুষ্ঠিত হলো বর্তমান বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশনের হলের তিনতলার একটি ঘরে। সুভাষচন্দ্র অনেকগুলি দেশের শাসনতন্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন—সোভিয়েত রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কয়েকটি। সব দেশের শাসনতন্ত্র সামনে নিয়ে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করলেন। আবুল মনসুর আহ্‌মেদ আর সুভাষচন্দ্র অন্য দেশের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে তার কতটা মিল আছে তা দেখতে লাগলেন। আবুল মনসুর আহমেদ লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে বললেন, লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা (১) ভারতের বর্তমান ১১টি প্রদেশকে রেসিডুয়ারি পাওয়ার সহ পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে। (২) তিন চারটি কেন্দ্রীয় বিষয় ও ক্ষমতা নিয়ে একটি নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন কায়েম করতে হবে। ১১টির মধ্যে যে ৫টি মুশলিম প্রধান প্রদেশ আছে, তাদের মেজরিটি অর্থাৎ ৩টি প্রদেশ যদি দাবি করে তবে মুসলিম প্রধান ৫টি প্রদেশকে নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন থেকে স্বতন্ত্র ফেডারেশন করবার অধিকার দিতে হবে। আলোচনা করে দেখা গেল, সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রেও সিসিড করবার অধিকার অর্থাৎ স্বতন্ত্র ফেডারেশন করবার অধিকার স্বীকৃত। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে একটা প্রদেশ চাইলেও সিসিড করতে পারে। এক্ষেত্রে পাঁচটি মুসলিম প্রদেশের মেজরিটি অর্থাৎ পাঁচটির মধ্যে তিনটি প্রদেশ ঐক্যমতে সিসিড করতে চাইলে তবেই তা করা সম্ভব হবে। সুভাষচন্দ্র দেখলেন লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব। দীর্ঘ আলোচনায় ঠিক হলো সুভাষচন্দ্র মিঃ

জিন্নাহ্‌কে পত্র লিখে উভয়ের আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবে। সুভাষচন্দ্র পত্র লিখে তাকে পাঠাবার ঝুঁকি নিলেন না। কোলকাতার মেয়র আবদুল রহমান সিদ্দিকী সাহেবকে জিন্নাহ্‌র পত্র দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়ে দিলেন। খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হলো কোলকাতা করপোরেশনের মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দিকী বোম্বাই কর্পোরেশনের মেয়রের সাথে জরুরি আলোচনার উদ্দেশ্যে বোম্বাই রওয়ানা হয়েছেন। সিদ্দিকী সাহেব বোম্বাই গেলেন, ফিরেও এলেন কদিন পর। কেউ জানলো না কি উদ্দেশ্যে মিঃ সিদ্দিকী বোম্বাই গিয়েছিলেন এবং বোম্বাই থেকে কি বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছেন। সংবাদপত্রে শুধু দেখা গেল মিঃ জিন্নাহ্‌ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিম লীগদের ওপর নির্দেশ জারি করেছেন আর সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে মিঃ জিন্নাহ্‌কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এর পরের অধ্যায় পরিচালিত হলো আরও গোপনে। সুভাষচন্দ্র জিন্নাহ্‌র একখানি পত্র পেলেন আর সুভাষচন্দ্র বোম্বাইর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সকলেই জানতেন সুভাষচন্দ্র দলের কাজে বোম্বাই যাচ্ছেন। কিন্তু আসলে ঘটনাটা জানতেন মাত্র তিনজন—কোলকাতার মেয়র সিদ্দিকী সাহেব, 'কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহ্‌মেদ ও সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। এই যাত্রা-কালের বর্ণনা দিয়েছেন আবুল মনসুর আহ্‌মেদ তাঁর আত্মজীবনী 'রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' পুস্তকে :

"নির্ধারিত দিনে সুভাষবাবুকে সি অফ করিবার জন্য শত শত কর্মীর সাথে আমি হাওড়া স্টেশনে গেলাম। সুভাষবাবু বোম্বাই যাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্যের কথা আমি ছাড়া বোধহয় আর কেউ জানিত না। গাড়ি ছাড়িবার প্রাক্কালে আমি সুভাষবাবুর কাছ ঘেষিয়া কানে কানে বললাম, 'ওয়ার্ধায় নাইমা বুড়ার দোয়া নিয়া যাইবেন।'

সুভাষবাবু চমকিয়া উঠিলেন। মুখ বিষণ্ণ করিলেন। বোধহয় বিরক্ত হইলেন। বুড়া মানে মহাত্মাজী। তাঁর সাথে সুভাষবাবুর সম্পর্ক ভাল নয়। মাত্র সম্প্রতি তাঁর সমর্থক বলিয়া কথিত লোকেরা মহাত্মাজীকে হাওড়া ব্যাণ্ডেল ও লিলুয়া স্টেশনে অপমান করিয়াছে। আমি সুভাষবাবুর মনের কথা বুঝলাম। আমার শক্ত হাতে সুভাষবাবুর নরম হাতটি চাপিয়া ধরিলাম 'আমার অনুরোধ রাখবেন'। শুধু এই কথাটি বলিলাম। হাত ছাড়লাম না। গাড়ি ছাড়িয়া দেয় দেখিয়া তিনি শুধু বলিলেন : 'আচ্ছা ভেবে দেখব।'
[আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর—পৃঃ ১৯৯]

সুভাষচন্দ্র বোম্বাই যাওয়ার পথে ওয়ার্ধায় নেমে পড়লেন এবং গান্ধীজীর সাথেও আলোচনা করলেন। তাঁর সাথে আলোচনা সেরে তিনি বোম্বাই পৌঁছুলেন। সেখানে বসল সুভাষ-জিন্নাহ্ বৈঠক। সকলে জানে সুভাষচন্দ্র বোম্বাই এসেছেন, মেরিন ড্রাইভে সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন কদিন। কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে সুভাষচন্দ্র চলে যান মালাবার হিলস জিন্নাহ্র আবাসে, আলোচনা চলে দিনের পর দিন। সুভাষচন্দ্র জিন্নাহ্র সাথে কথা বলেন আর মাঝে মাঝে কথা বলেন সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল ও ভোলাভাই দেশাইর সঙ্গে।

বোম্বাইয়ে কদিন অবস্থানকালে খবরের কাগজে একদিন মাত্র খবর বেরুল —মিঃ জিন্নাহ্ সুভাষচন্দ্রকে ডিনার দিয়েছেন। তার পরের খবর—সুভাষচন্দ্র বোম্বাই ত্যাগ করে সোজা চলে এসেছেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদে সুভাষচন্দ্র বৈঠকে বসলেন জহরলাল নেহরুর সঙ্গে। এলাহাবাদেও আনন্দ ভবনে সুভাষচন্দ্র অবস্থান করলেন কদিন। জহরলালের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কি আলাপ আলোচনা হয়েছিল সে তথ্য অজ্ঞাত। এই সম্পর্কে আবুল মনসুর আহ্মেদ তাঁর আমার 'দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে সামান্য আলোকপাত করেছেন। সুভাষচন্দ্র আবুল মনসুর আহ্মেদকে বলছেন— "জহরলাল আমার মত গ্রহণ করবেন এ বিশ্বাস আমার আদৌ ছিল না। তবু জিন্নাহ্ সাহেবের অনুরোধ রক্ষার্থে আমি জহরলালের কাছে গেলাম। একদিন একরাত উভয়ে প্রায় এক নাগাড়ে মত-বিনিময় করলাম। জহরলাল লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা মেনে নিলেন। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপষ হতে পারে তাও স্বীকার করলেন। কিন্তু গান্ধীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে তিনি রাজী নন। তাই নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।" [আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর : ২০৩ পৃঃ]

নিখিল ভারত ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্ভব হলো না জেনেও সুভাষচন্দ্র হাল ছাড়লেন না। তখন বাংলা ভিত্তিতে কাজ শুরু করলেন তিনি। সে কাজ হলো হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন। নবাব সিরাজদৌল্লাকে জাতীয়তার প্রতীকরূপে জীবন্ত করে তোলা আর তার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তোলা—এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য। এই কারণেই ১৯৪০ সালের ২৫শে মে ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনের পরিকল্পনা রাখেন। এই পরিকল্পনা মত ২৯শে জুন কোলকাতার এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায়

সুভাষচন্দ্র বললেন—"হলওয়েল মনুমেণ্ট জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম চিহ্নস্বরূপ। পরাধীনতার চিহ্ন অপসারিত করতে চাই। ৩রা জুলাইয়ের মধ্যে সিরাজদৌল্লার স্মৃতি দিবসে মনুমেণ্ট সরিয়ে নেবার দাবি জানানো হয়েছে। আমরা চাই—জাতির মিথ্যা কলঙ্কস্বরূপ এই মনুমেণ্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে নেওয়া হোক।" সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন—"৩রা অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি, প্রথম দিনের বাহিনী আমি নিজেই পরিচালনা করব।" ২৯শে জুনের এই সভায় জনপ্রিয় তরুণ মুসলিম নেতা চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লালমিঞা) সভাপতিত্ব করলেন। মিঃ আবদুল ওয়াসেথ, মিঃ নুরুল হুদা, মিঃ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ তরুণ মুসলিম নেতাদের সুভাষচন্দ্র তাঁর পাশে পেলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকও আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন।

এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ৩রা জুলাই সিরাজ স্মৃতি দিবস পালনের একদিন আগে অর্থাৎ ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তারের আগে দেশপ্রিয় পার্কে সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন সেটিই ছিল বাংলার মাটিতে তাঁর শেষ বক্তৃতা। দেশপ্রিয় পার্কের সভার বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বললেন—"বন্ধুগণ! আর হয়তো আমি থাকবো না, তাই মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার মতো সুযোগ আমি আর কোনদিন পাবো না। তার আগেই হয়তো শত্রুরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবে দীর্ঘকালের মতো। তাই শেষবারের মতো আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি,—এ সুযোগ আপনারা হারাবেন না, সবাই এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন। জয় আমাদের হবেই।"

সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ করে চলে গেছেন, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়েছেন, স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই করেছেন। সেই ১৯৪৪ সালের কথা। সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করলেন ভারতকে অখণ্ড রেখে জিন্নাহ্‌কে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েও তিনি যে ফর্মুলা কার্যকর করতে পারেন নি, যে ফর্মুলা মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্নাহ্‌, জহরলাল নেহরু—কেউ মেনে নেয় নি; এখন দেশত্যাগের পরে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন মিঃ জিন্নাহ্‌ ও মহাত্মা গান্ধী।

১৯৪৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর বর্মা থেকে এক বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে সতর্ক করে বলছেন; "এটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, গান্ধীজী ও কংগ্রেস লীগের সঙ্গে একটা রফা করে বৃটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

......বন্ধুগণ! আমার সংযুক্ত স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চাই; কাজেই ভারতকে বিভক্ত করে টুকরো টুকরো করার সব চেষ্টাই আমাদের বাধা দিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতবর্ষের চাইতে অনেক বেশী জাতি আছে; কিন্তু তবু তারা ঐক্যবদ্ধ কেন? কারণ তারা বিদেশের কাছে নতি স্বীকার করে না।" কিন্তু দেখা গেলো দেশে স্বাধীনতা এলো দেশকে খণ্ডিত করে—ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে। সুভাষচন্দ্র ভারতকে অখণ্ড রেখে স্বাধীনতার যে পরিকল্পনা করে-ছিলেন, সে কথা জানতেন অনেকে। তার মধ্যে একজন হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, যাঁর রাজনীতির হাতে খড়ি সুভাষ ও সোহ্‌রাবর্দির হাতে। জাপানের রেনকোজি মন্দিরে একটি মন্তব্য লিখবার খাতায় ১৯৫৪ সালে মুজিব যে মন্তব্যটি লেখেন তা হোল—"নেতাজী হলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, যাঁর নেতৃত্বে কোন গলদ ছিল না। একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব হতো অখণ্ড ভারতের মুক্তি সাধনা। হে, নেতাজী লহো প্রণাম।"

সুভাষচন্দ্র তাঁর মি. জিন্নাহ্‌র সাথে রাজনৈতিক মীমাংসা প্রচেষ্টার কথা খুব কমই লিপিবদ্ধ করেছেন। সামান্য দু একটি কথার উল্লেখ আছে 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—তিনি রাজী করাতে পারেন নি গান্ধীজীকে, রাজী করাতে পারেন নি নেহরুজীকে আর ব্যর্থ হয়েছেন জিন্নাহ্‌ সাহেবের কাছে। সুভাষচন্দ্র মিঃ জিন্নাহ্‌র কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্র অনুকরণে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি স্বয়ংশাসিত হোক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের মতো যে কোন রাজ্যের সিসিড করবার অধিকার শাসনতন্ত্রে থাক। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদ জিন্নাহ্‌ গ্রহণ করুণ, এ প্রস্তাব জিন্নাহ্‌ শোনেন নি। সুভাষচন্দ্র 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেন—মিঃ জিন্নাহ্‌ তখন কি উপায়ে ইংরেজের সাহায্যে তাঁহার পাকিস্তান (ভারত বিভাগ) পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করা যায় তাহাই কেবল ভাবিতেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সহিত একযোগে সংগ্রাম প্রস্তাব আদৌ তাহার ভাল লাগে নাই। লেখক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এইরূপ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হইলে মিঃ জিন্নাহ্‌ই প্রথম প্রধানমন্ত্রী হইবেন।

সুভাষচন্দ্রের অখণ্ড ভারতের সাধনা ব্যর্থ হওয়ার এই হল কাহিনী। মিঃ জিন্নাহ্‌কে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী করে দেশ-বিভাগ রোধের শেষ চেষ্টা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

॥ যুব আন্দোলনের উদ্গাতা
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ॥

—সমর গুহ

স্বদেশ সেবাব্রতে নেতাজীর প্রথম অভ্যুদয় যুব আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে। বস্তুতঃ, এ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে নেতাজী ছিলেন ভারতের তারুণ্য ও যৌবনশক্তির ভাস্বর প্রতীক। নেতাজীর কর্ম ও বাণীতে ভারতের যুব আন্দোলন সে যুগে প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে; এক নতুন স্বপ্ন ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে ভারতের যুব-মানস। নেতাজী যত ছাত্র ও যুব সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন—ভারতের নব জাগ্রত তরুণ শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখেছেন—ভারতের আর কোন জাতীয় নেতার পক্ষেই যুবমানসের সঙ্গে তেমনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। নেতাজীর আগেও যুব আন্দোলন ছিল, কিন্তু সে আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুচ্ছেদ-রূপে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী যুগে বাংলাদেশে যে ছাত্র তথা যুব জাগৃতি দেখা দেয় কিছুকালের মধ্যেই তা' বৈপ্লবিক আন্দোলনের অপ্রকাশ্য পথে আত্ম-গোপন করে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে যুব আন্দোলন আবার কর্মমূর্ত হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনের সরকারী শিক্ষায়তন বয়কট করার কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুব আন্দোলনও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। শুধু খাদি ও গঠনমূলক কর্মপন্থা সেদিনের যুব মনের ক্ষুধা মেটাতে পারেনি। ভারতের যুব-মন নূতন বাণী ও নূতন প্রেরণায় ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যুবনেতা সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে। মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিলাভের পরে সেদিনের যুবনেতা সুভাষচন্দ্র যেন রুদ্র ঝঞ্ঝার মত ঘুরে বেড়ান ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। অগণিত ছাত্র ও যুব-সমাবেশে সম্মিলিত হয়ে গড়ে তোলেন যুব আন্দোলনের এক নূতন ভিত্তি। নেতাজীর কর্ম ও বাণীতে ভারতের যুব আন্দোলন সেদিন এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে। নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের পুচ্ছ হওয়ার পরিবর্তে এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনরূপে গড়ে ওঠে ভারতীয় যুব আন্দোলনের পটভূমিকা।

যুব-আন্দোলনের প্রকৃতি

যৌবন-শক্তি চির অশান্ত, চির অবুঝ। অকারণে ঔদ্ধত্য, অপ্রয়োজনে দুর্বার বিদ্রোহ, চির চাঞ্চল্যের উদ্দাম প্রাণধারায় উর্মিমুখর উচ্ছ্বাস—এই যৌবনের ধর্ম। যৌবনের এই ধর্মে যেন আগুনের আকৃতি। যৌবন ভাঙতে পারে, গড়তে ও পারে, আত্মবিলোপও করতে পারে, আবার আত্মবিকাশও ঘটাতে পারে। যৌবনের এই ধর্মকে স্মরণ রেখেই নেতাজী যুব-আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ণয় করে বলেন, "যুব-আন্দোলন হল স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের প্রতিমূর্তি। এই আন্দোলন অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং যুগযুগাগত বন্ধনের চির বিরোধী। এই আন্দোলন সমস্ত রকম বাধা বন্ধন দূর করে নূতন ও কল্যাণকামী বিশ্ব রচনার স্বপ্ন-প্রয়াসী। অস্থীরতা ও অসন্তোষ তাই যুব আন্দোলনের প্রধান লক্ষণ। বন্ধন থেকে মুক্তি, সংস্কার ও চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান—এই যুব আন্দোলনের মূল আহ্বান। অন্ধ আনুগত্য এবং যুক্তিহীন বশ্যতার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতীতি চলার দিকে এই আন্দোলনের প্রাবাল্য!" যৌবনের ধর্মকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা বা একে অবদমিত করে বশংবদ পথে পরিচালিত করার প্রয়াস ব্যর্থ হতেই শুধু বাধ্য নয়,—যে জাতি তার যৌবন শক্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, সে জাতির যৌবনশক্তি আত্মদহন ও স্বধর্ম বিচ্যুতির পথে বিনষ্ট হয়ে যায়, জাতীয় সৃজনশীলতার প্রগতি সম্ভাবনাও ক্ষুণ্ণ হয়ে জাতীয় বিকাশ ব্যাহত হয়। যে জাতির যৌবন শক্তির সামনে কোনো আশা নেই, আদর্শ নেই, যৌবনের আগুনকে সহস্র দীপাবলীর আলোক সজ্জায় জ্বালিয়ে তোলার রোমাঞ্চকর আহ্বান নেই, সে জাতির ভবিষ্যৎও নেই। নেতাজী তাই চেয়েছিলেন নূতন সমাজের এক নূতন স্বপ্নে ভারতের যুব-মানসকে প্রাণবন্ত করে তুলতে।

নূতন সমাজের স্বপ্ন

নেতাজী ভারতের যুব-আন্দোলনের সামনে এক নূতন জীবনায়নের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য রেখে বলেন, "যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল এক নতুন আদর্শের প্রেরণায় সমগ্র জীবনকে নূতন ভাবে গড়ে তোলা। এই আদর্শ আমাদের জীবনে এনে দেবে এক অনাগত জীবনের সংকেত। এই আদর্শ হল সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের আহ্বান……যা আমরা চাই না তা হল সার্বিক জাগৃতি—যার স্পর্শে আমাদের জীবনে আসবে আমূল রূপান্তর। খানিকটা সংস্কারে চলবে না, উপরে উপরে চুণকাম করেও কোন

লাভ নেই। প্রয়োজন আজ আমাদের সমগ্র জীবনের নব পরিগ্রহ তথা পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন।" নেতাজী অনুভব করেছিলেন ভারতের যুব শক্তিকে যদি নূতন সমাজের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করে না তোলা যায়, যদি সমাজ বিপ্লবের কর্ম-প্রেরণায় তাদের প্রাণধারাকে উদ্দাম করে দেওয়া না যায় তাহলে নূতন ভারত রচনা করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যুবশক্তির উপরে। সেই যুবশক্তির দৃষ্টি যদি ভবিষ্যতের কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে না ওঠে তাহ'লে সমগ্রভাবে জাতীয় বিপ্লব সাধনও সম্ভব নয়, ভারতের ন্যায় জরাজীর্ণ জাতিকে বলিষ্ঠ অভ্যুত্থানে পুনর্গঠিত করাও সম্ভব নয়। নেতাজী তাই সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে নব ভারত রচনার আহ্বানে ভারতের যুব-সমাজকে বিশেষ-ভাবে বেগবান করে তুলবার চেষ্টা করেন।

ত্রিমুখী বিভ্রান্তি

সে যুগে ভারতের যুব-জীবনের সামনে ছিল ত্রিমুখী বিভ্রান্তি। আজকের যুব-জীবনও সেই বিভ্রান্তির প্রকোপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পায় নি। বরং কোন ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে যে নব-জীবন রচনার আমন্ত্রণ এসেছে ভারতের জনজীবনে তার প্রগতি হবে কোন পথে? এক মতের আহ্বান প্রাচীন ভারতের দিকে এবং ঐকান্তিক অধ্যাত্ম সাধনার ব্যক্তিক প্রয়াসের পথে। দ্বিতীয় কণ্ঠের আমন্ত্রণ ভারতের সব কিছুকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণে এবং তৃতীয় মতের নির্দেশ রুশিয়া বা কম্যুনিজমের আদর্শবাদের অনুসরণে। নেতাজী ভারতের যুব-মানসকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এই তিনটি পথই আবে-গান্ধ আতিশয্যের বিভ্রান্তি সংকেত মাত্র। তিনি ভারতের যুব সমাজকে অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহনের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন কোন মত বা কোন পথের অন্ধ অনুসরণ নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বা যুক্তিবাদই হবে যুব জীবন-দর্শন রচনার মূল নিয়ামক। কোন্ পথে ভারতের কল্যাণ হবে, কোন্ পথে পদক্ষেপ করবে ভারতের যুবশক্তি, কোন্ পথে সম্ভব হবে যুগধর্মসাপেক্ষ নূতন সমাজ রচনা করা—তার গতি অনুধাবনের আগে স্মরণ রাখতে হবে যে, "একটি দেশের জাতীয় আদর্শ গড়ে ওঠে তার ইতিহাস, প্রয়োজন ও পরিবেশের প্রভাবের উপরে। যে মতবাদই আমরা গ্রহণ করিনা কেন, তাকে যদি সার্থক করে তুলতে হয় তাহলে সবার আগে মনে রাখতে হবে আমাদের অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জাতীয় প্রয়োজনের কথা।"

প্রাচীনের ভিত্তিতে আধুনিক ভারত

নেতাজী গভীরভাবে ভারত প্রেমিক এবং জীবনের অধ্যাত্মমূল্যে বিশ্বাসী। তিনি ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ভারতের যুবশক্তিকে বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "মিশরে বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায় নি। আমাদের পূর্ব-পুরুষের মত আজও আমাদের জীবনে মূলত একই চিন্তা একই জীবনের আদর্শ এবং একই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। অন্য কথায় অতীত কাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত রয়েছে। এরূপ ধারা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। অনেক সময় নূতন প্রভাবে, নূতন আদর্শ ও নূতন সংস্কৃতিকেও ভারতের জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে আপন করে নিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা অব্যাহত রয়েছে তথাপি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের পরিবর্তন হয়েছে, আমরা প্রগতিও করেছি।" তিনি আরও বলেছেন, "আমাকে অন্ধ-জাতীয়তাবাদী বলা হলেও আমি বলবো যে, ভারতের একটি বাণী আছে। আধুনিকতার অতি আগ্রহে আমাদের অতীত গৌরবকে ভুললে চলবে না। অতীতের ভিত্তিতে আমাদের একটি আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে হবে। ভারতের সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব ধারায় বর্ধিত করতে হবে। 'বেদের যুগে ফিরে চলো' —এই আহ্বানেও যেমন আমাদের সাড়া দিতে হবে তেমনি আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের রূপান্তরপ্রিয়তা ও বিলাসিতার অত্যুগ্র আমন্ত্রণকেও রোধ করতে হবে।"

নেতাজী গভীরভাবে অধ্যাত্মবাদের অনুসারী হয়েও ভারতের যুবশক্তিকে ব্যক্তিসর্বস্ব অধ্যাত্মবাদের আতিশয্য সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। অধ্যাত্ম-সাধনায় উচ্চশ্রেণীর মহামানব ভারতে কম আবির্ভূত হয়নি, কিন্তু আজ প্রয়োজন 'নিষ্কর্ম সাধনা' নয়—একটি কর্মবাদের 'জীবন-দর্শন' এবং 'সম্মিলিত কর্মযোগ' ও অধ্যাত্মমূল্যের সঙ্গে ঐহিক উদ্যমের সমন্বয়-সাধন। নেতাজী ভারতের যুবমনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "শত শত মহাপুরুষ এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন, অথচ তাঁদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জাতিকে আবার বাঁচতে হলে আমাদের সাধনার ধারা অন্যপথে পরিচালিত করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই। আজ আমাদের প্রয়োজন হল 'সম্মিলিত সাধনা'

('collective Sadhana')।" তিনি নবভারতকামী যুবমানসকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন, "অধ্যাত্ম জীবনের দিকে একান্ত দৃষ্টি দেওয়ায় বিজ্ঞানের প্রগতি উপেক্ষিত হয়েছে, দৈহিক ও পার্থিব জীবনে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। ভারতের ইতিহাসে সেইদিনই ছিল গৌরবময় যুগ, যেদিন জড ও চেতন, দেহ ও আত্মার দাবীর সুবর্ণ সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছিল। আজকের ভারতবর্ষ দেহের লাঞ্ছনায়ই ভুগছে না, আত্মার ক্ষীণতায়ও ভুগছে। আজ আমাদের আবার দুদিকেই এগিয়ে যেতে হবে।" সনাতনী ভারতের নামে পশ্চাদগামী হওয়া নয়, আবার আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে নিজেদেব হারিয়ে দেওয়াও নয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মূল্যমানেব সমন্বয় সাধন করে গডে তুলতে হবে নূতন দিনের নূতন ভারত—ভাবতের নবজাগ্রত যুবমানসের কাছে এই নেতাজীর আহ্বান।

ভারতীয় সমাজবাদ

নেতাজী ভারতের যুবমনকে সমাজ-বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার প্রয়োজনীযতা বোধ করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যারা সমাজ বিপ্লবের নামে রুশ বিপ্লবের অন্ধ অনুসারী বা ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার আগ্রহে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার প্রযাসী নেতাজী তাদের সতর্ক করে দিযে বলেছেন যে তিনি সমাজবিপ্লব সাধনের জন্য যে সমাজবাদী আদর্শের কথা বলেছেন, সেই "সমাজবাদ কার্ল মার্কসের পুঁথির পাতায জন্মগ্রহণ করেনি—তার জন্ম হযেছে ভারতের মনীষায়।" তিনি করাচীব নওজোযান সম্মেলনে ভারতের সমাজ-বিপ্লব প্রযাসী যুবমনকে লক্ষ্য করে বলেন, "বাইরে থেকে আলো ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার সময আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমরা অন্য কোন দেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে পারি না। অন্য দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে অনুধাবন করার পরে আমাদের জাতীয প্রযোজনের অনুপাতে তার প্রয়োগ কববো আমরা।" নেতাজী রাশিয়া বা কম্যুনিজম সম্বন্ধে অন্ধ জাতীযতার সঙ্কীর্ণ আবেগে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেননি। বরং রাশিযার শিল্পোন্নযন প্রচেষ্টা ও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের বহু প্রশংসা করেছেন তিনি এবং বহুক্ষেত্রে রাশিযার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতির মনোভাবও ব্যক্ত করেছেন। তবুও অতি সুস্পষ্ট কণ্ঠে নেতাজী বলেছেন, "ভারত কখনো রাশিয়ার নূতন সংস্করণে পরিণত হবে না।" আর্থিক দিক দিয়ে কম্যুনিজমের অনেক কিছু সমর্থন করেও কম্যুনিস্ট মতবাদের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির

সমালোচনা করে নেতাজী বলেছেন, "বিভিন্ন মতের মধ্যে অল্পবিস্তর সত্য আছে কিন্তু নিরন্তর প্রগতিশীল জগতে কোন মতবাদকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।" নেতাজীর মতে ভারত সব দেশের আদর্শবাদকেই পর্যালোচনা করবে, কিন্তু "ভারতকে নিজস্ব ধারায় সমাজবাদের নিজস্ব রূপ ও পদ্ধতি রচনা করতে হবে। আমার এতটুকু সন্দেহ নেই যে, ভারত তথা বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপরে। ভারতে যে সমাজবাদ গড়ে উঠবে, মৌলিকতা ও নূতনত্বে তা হবে অনেক দিক দিয়ে বিশিষ্ট—যাতে বিশ্বেরও কল্যাণ হবে"। নেতাজী ভারতের যুবমানসকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "সতের শতাব্দীতে ইংলণ্ড বিশ্বকে কনষ্টিট্যুশন্যাল বা গঠনতান্ত্রিক চিন্তাধারা উপহার দিয়েছে। ফ্রান্স দিয়েছে আঠার শতাব্দীতে সাম্য মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের বাণী। উনিশ শতাব্দীর জার্মানী বিশ্বকে দিয়েছে মার্ক্সীয় দর্শন এবং বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রোলেটারিয়েট সরকার গঠন করে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্বের সংস্কৃতি-জীবনে এর পরবর্তী অবদান তুলে ধরতে হবে ভারতকে। বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পথে ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।"

যুব-আন্দোলনের গোড়ার কথা

নেতাজী ভারতের যুবমানসের সামনে সমাজবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক আহ্বান তুলে ধরেছেন। যুবজীবনকে স্বপ্নচারী ত্যাগব্রতী এবং স্বদেশানুরাগী করে তোলার জন্য দুর্বার কর্মের আগ্রহে প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টির জন্য—একটি জীবন্ত আদর্শবাদের প্রয়োজন। কিন্তু এই আদর্শবাদ হল আকাশচুম্বী সৌধের মত—যদি সৌধের গোড়ায় সুদৃঢ় বনিয়াদ না থাকে তাহলে কোন সৌধ রচনা করা সম্ভব নয়। তেমনি আদর্শবাদ যত উজ্জ্বল, যত প্রাণবন্ত বা যত বৈপ্লবিকই হোক না কেন, আদর্শবাদীর জীবনের ভিত্তি যদি সুগঠিত না থাকে, তাহলে আদর্শবাদের মূল্য রঙিন তাসের ঘরের চেয়ে বেশী নয়। নেতাজী তাই ভারতের যুবমানসকে যুব-আন্দোলনের গোড়ার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—"এক একটি ইজমের গোঁড়া ভক্তরা মনে করেন যে, ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হলেই পৃথিবীর সব দুঃখ দূর হবে। আজকাল তাই ইজমের লড়াই খুব ঘনিয়ে উঠেছে। আমার নিজের কিন্তু বিশ্বাস কোন ইজমের দ্বারাই মানব জাতির মুক্তি সম্ভব নয়, যদি না সবার আগে আমরা মানুষের ন্যায় শক্তি অর্জন করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন—মানুষ গড়াই আমার সাধনা Man making is my mission ;—জাতি গঠন এবং যে-

কোন ইজম প্রতিষ্ঠার মূল বনিয়াদ হল খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ তৈরী করাই হবে যুব-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।' তিনি আরও বলেন, "ভারতের হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা-দীক্ষা, শৌর্য-বীর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুরই তো অভাব নেই। আছে আমাদের সবই, নেই শুধু একটি বস্তু—উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা—tenacity of purpose। উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা বা নৈতিক বল—tenacity of purpose বা moral stamina—কোথায় পাব আমরা? ঘরে বসে সাধনা করে বা সংসার ত্যাগ করে শক্তি সঞ্চয় হয় না—শক্তি আসে নিষ্কাম কর্ম ও অবিরাম সংগ্রামে জীবন ঢেলে দিয়ে।"

যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য

যুব আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়,—আবার রাজনীতি বর্জিত সংস্কারপন্থী আন্দোলনও নয়। নিছক ইজম বা মতবাদের লড়াই করাও যুব আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। যুব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের যুব শক্তিকে কর্ম ও মানসে বলিষ্ঠ ও আদর্শবতী করে গড়ে তুলে সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রাণবন্ত ধারায় ভারতের জাতীয় জাগৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখা। যুব আন্দোলন সুনিশ্চিতভাবে জাতীয় আন্দোলন, কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। নেতাজী তাই বলেছেন, "কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে থাকেন যে, যুব আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র,—কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়, যুব আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তাই বলে অ-রাজনৈতিকও নয়। রাজনীতি বর্জন করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাজনীতির স্থান আছে কিন্তু তাই বলে যুব আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনও নয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য, বীর্য—সব দিক দিয়ে মানুষ গড়ে তোলা এবং…কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যায়াম-ক্রিয়ায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শে তারুণ্য-শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটান—শতমুখী প্রাণধারায় তাদের বিকশিত করা।" নেতাজী তাই ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের সামনে একটি সুচিন্তিত কর্মসূচী রেখে বলেন, "এই আন্দোলন ও সংগঠনের লক্ষ্য হবে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাদান—যাতে ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে ছাত্র ও যুবকরা ভারতের বলিষ্ঠ মানুষ ও বলিষ্ঠ নাগরিকে পরিণত হতে পারে।" তিনি তাই কর্মসূচীকে আরও বিস্তৃত করে ছাত্র ও যুবসমাজকে পথনির্দেশ

দিয়ে আরও বলেন, "যুবসমাজের কল্যাণের জন্য কো-অপারেটিভ বা সমবায় সংঘ গড়ে তুলতে হবে। তাদের কাজের তালিকায় গ্রহণ করতে হবে—দেহ চর্চার জন্য সমিতি গঠন, ব্যায়ামাগার গড়ে তোলা, আলোচনা বৈঠক, ও বিতর্ক সভার আয়োজন করা, পত্র-পত্রিকা লেখা, সঙ্গীতের আসর গড়ে তোলা, লাইব্রেরী ও পাঠাগার গঠন করা এবং সমাজসেবার বিভাগ-খোলা ইত্যাদি কর্মসূচীর প্রোগ্রাম।"

সমাজবাদী সংস্কৃতি

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে যুবমনের স্বপ্ন ছিল—জাতীয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতার আদর্শে তাদের প্রাণ মন ছিল উদ্বুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীনতার যুগে যুবমন কোন্ স্বপ্নের স্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠবে? সমাজবাদ হবে যুব মনের এই জীবন-কাঠি। সমাজবাদী স্বপ্ন, সমাজবাদী কল্পনায়, সমাজবাদী মূল্যায়নে, সমাজবাদী মানুষ গড়ে তোলার আমন্ত্রণ এক সমাজবাদী সংস্কৃতির সর্বময় মানস রচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন নেতাজী। এই সমাজবাদী সংস্কৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতির তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ নয়,—এই সমাজবাদী সংস্কৃতির মূল আবেদন জীবন মূল্য ও সমাজ মূল্যে। সমাজবাদ মানব সভ্যতার নূতন মূল্যায়ন, মানুষে মানুষে নূতন সাম্য ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপনের নূতন আবেদন। শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন মানুষের সমাজ মূল্য বোধের রূপান্তর। এরূপ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন সমাজবাদী সংস্কৃতি এবং মানুষে মানুষে নূতন সম্পর্ক রচনার উদ্দেশ্যে সমাজবাদী মানুষ রচনা করা। নূতন সমাজ মূল্যের কল্পনায় সমাজবাদী মানুষ রচনার উদ্দেশ্যে তাই আবশ্যক এক সমাজবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। নেতাজী এই সমাজবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন স্বাধীন ভারতের যুব সম্প্রদায়কে। সমাজবাদী সংস্কৃতির আবেদনে সমাজবাদী মানুষ রচনা করা হবে যুব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য—এই নেতাজীর নির্দেশ।

যুবমানসের সামনে যদি নূতন সমাজবাদী সমাজ রচনার জীবন্ত আদর্শ প্রদীপ্ত ভাস্করের মত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে এবং এমনি গঠনমূলক কর্মসূচীর পথে যদি যুব আন্দোলন সমাজবাদী মানুষ গড়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তবেই বলিষ্ঠ যুব আন্দোলনের পথে আগামী দিনের বলিষ্ঠ জাতীয় জীবন রচনা করা সম্ভব। চির উদ্দামধর্মী যৌবন শক্তিকে যাঁরা কারণে-অকারণে নিন্দাবাদ করে থাকেন, তাঁরা যদি নেতাজীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভারতের যুব

মানুষের প্রাণধর্মকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন এবং নূতন সমাজ গঠনের একটি জীবন্ত আদর্শের পটভূমিতে যদি গঠনমূলক কর্মসূচীতে যুব জীবনকে আত্মগঠনের পথে প্রবাহিত করতে পারেন, তবেই আজিকার বিচ্যুতি থেকে ছাত্র ও যুবশক্তিকে জীবন ব্রতের পথ সন্ধানে সার্থক ও সাগ্রহী করে তুলতে পারবেন। জাতীয় জীবনের জীবন্ত আদর্শ ও আত্মগঠনের সুষ্ঠ কর্মপন্থার আমন্ত্রণ পেলে যুবপ্রাণ প্রদীপের সহস্রশিখায় সুদীপ্ত হয়ে উঠবে, নইলে স্বধর্মের তাড়নায় আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে জাতীয় জীবনকে বার বার জ্বালিয়ে মারবে মাত্র।

লেখকের "নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা" হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত সংকলিত।

"প্রসঙ্গ সুভাষচন্দ্র"

—সুরেশচন্দ্র বসু

শুরুতেই বলি নি, আমার সুচিন্তিত অভিমত হ'ল, সুভাষচন্দ্র জন্মেই ছিলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—তা হল—পরদেশীর কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য সর্বশক্তিমান বিধাতা পুরুষও প্রভুতভাবে তাঁকে দিয়েছিলেন অখণ্ড ভগবৎবিশ্বাস ও একান্ত ঈশ্বর নির্ভরতা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয ধী, ফলাকাঙ্খাবর্জিত নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশ সেবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা। পরিপূর্ণভাবে তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী। তাঁর চরিত্রের আর একটি অপূর্ব দিক হল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবময়তা। অসংখ্য মানুষের চোখে এটা ধরা পড়েছিল। এদের মধ্যে এক চেক-মহিলাও আছেন। তিনি তাঁর লেখা "Subhas Chandra Bose As I knew him" গ্রন্থের আরম্ভেই বলছেন: "এই গ্রন্থ...একটা প্রচেষ্টা...নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের, যিনি শুধু অনন্যসাধারণ ছিলেন না রাজনীতি বরং তৎসঙ্গে আধ্যাত্মিকাতেও" ..."এই ছিল প্রথম দেখা। নিঃসন্দেহে আমি দেখলুম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে—একজন মিষ্টিক—একজন প্রকৃত দার্শনিককে, একজন প্রাজ্ঞ হিন্দু...সুনিশ্চিত একজন আধ্যাত্মিক পুরুষকে।" ..."আমি বুঝলাম ইনি কদাপি নিছক রাজনৈতিক নন, ইনি সর্বোপরি একজন দার্শনিক। দেশের মুক্তির জন্য যদিও ইনি শৌর্যপূর্ণ সংগ্রামে লিপ্ত তত্রাচ তিনি সমানভাবে আগ্রহী—মানুষের সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।" 'সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সমভাবে আগ্রহী'—লেখিকার এই মন্তব্য পড়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারি না এবং আমিও তা বিশ্বাস করি। এটা তাঁর পুনরাবির্ভাবের পর তাঁর কার্যকলাপ থেকেই সমগ্র বিশ্বের কাছে উপযুক্তভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

লেখকের "ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধের অংশবিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত।

॥ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুভাষচন্দ্র ॥

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নগর্ভা ভারতবর্ষ। যুগে যুগে কত মহামানব, কত মানুষ সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়েছে এই দেশে যাঁরা যুগ সন্ধিক্ষণে এসে সমস্ত ভারতবর্ষকে ডাক দিয়েছেন বৃহত্তর জীবন, বৃহত্তর মানবতার দিকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই এক যুগ-সূর্য্য। এই যুগসূর্য্যের আলোর ছটায়, ভারতবর্ষ তার পরাধীনতার অন্ধকার কাটিয়ে উঠল। এই মানবসূর্য্যের দেওয়া বাণী 'জয় হিন্দ্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিল্লীর লালকেল্লার শীর্ষে ১৯৭৪ সালের ১৫ই আগষ্ট ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তুলে ভারত স্বাধীন হোল, এতে কোন মিথ্যাচার নেই, এ শাশ্বত সত্য, এ ইতিহাস। ইতিহাস কখনো মিথ্যা বলে না, ইতিহাসের কথা কখনো হারিয়ে যায় না। 'যত বিস্মৃত নীরব কাহিনী' ইতিহাস নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে চলে—সুভাষচন্দ্রও ইতিহাস। সে ইতিহাস কেউ ভোলেনি, ভুলবে না। সেই ইতিহাসের পাতা থেকে কয়েকটি টুকরো এখানে তুলে ধরছি। মাইকেল এডওয়ার্ড তাঁর "The last years of British India" গ্রন্থে লিখছেন—

গান্ধী তাঁর সংস্কারবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কংগ্রেসকে একটি দক্ষ কার্য্যক্ষম যন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু চাষীর ঘরে জন্ম এমন একজনকে নেতৃত্বের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, যিনি তার পাশ্চাত্য শিক্ষা সত্বেও চাষীদের এত নিকট ছিলেন যে চাষীরা তাকে মেনে নেবে। ইনিই বল্লভভাই প্যাটেল। ইনি ছিলেন এক নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি-দলের সংগঠক। তিনি কংগ্রেসকে এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদল একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত হতে পারে। আর একজনকে তিনি নেতা হিসাবে বেছে নিলেন—যার নাম জওহরলাল নেহরু। ইনি হ্যারোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, অ্যারিষ্টোক্রাট্, এবং ভাবধারায় ফেবিয়ান স্যোসিয়ালিষ্ট্। নেহরুর মূল্য ছিল, কারণ তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ ; সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য অর্থে প্রগতিশীল। আধুনিক মনোভাবাপন্ন তরুণদের

দলে টানবার ক্ষমতা তার ছিল। গান্ধীর এই লেফটানান্ট নির্বাচন খুব সঠিক হয়েছিল।

প্যাটেল চিন্তাবিদ ছিলেন না, ছিলেন কর্মী। নেহরু চিন্তাবিদ ছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার মানুষ তিনি ছিলেন না। নেহরুর সম্পর্কে ব্রিটিশদের আশঙ্কা ছিল তার পশ্চাদপটের জন্য, আর তার 'স্যোসিয়ালিজম্' এর জন্য। কিন্তু তারা তাকে একজন চূড়ান্তপন্থী মনে করে ভুল করেছিল। গান্ধী অনেক বুঝতেন এবং যদিও নেহরু গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল পন্থাকে সমালোচনা করতেন তবুও তিনি কখনই পারেন নি গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক চূর্ণ করে সত্যিকারের বিপ্লবাত্মক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শুধু একজন মাত্র বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষই (সুভাষচন্দ্র) স্বতন্ত্র এবং সংগ্রামের পথ নিয়েছিলেন এবং এক কথায় অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে ভারতবর্ষ তাঁর কাছে অধিকতর ঋণী.—এমন কি, যদিও মনে হতে পারে. তিনি বুঝি ব্যর্থ হয়েছেন।

ব্রিটিশ বলপ্রয়োগ খর্বকারী গান্ধীকে কোন ভয় পায় নি। তাদের নেহরুকে নিয়েও আর আশঙ্কা ছিল না, যার মধ্যে দ্রুত ভাবে সুসভ্য—এমনকি উচ্চতর রাজনৈতিকতার লক্ষণ ঃঅযথা অনুমিত হয়েছিল। ব্রিটিশ কিন্তু সন্ত্রস্ত ছিল সুভাষ বোসকে নিয়ে—কিংবা বলা যেতে পারে, তিনি যে বৈপ্লবিক পন্থা তুলে ধরেছিলেন তার জন্যে।

অন্যত্র ইতিহাসের ছেঁড়াপাতার আর একটি উপস্থাপনা [ডঃ লোদার ক্রাঙ্ক তাঁর Epilogue in 'A Beacon Across Asia' গ্রন্থে লিখছেন—]

১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে যখন বোস জার্মানীতে আসেন তখন যুদ্ধে অক্ষশক্তির বিজয়ের কিছুটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ঐ শক্তিবর্গের কাছ থেকে যুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি আদায়েই তিনি সবিশেষ উৎসুক ছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে ঐ একই সময়ে গান্ধীজীও বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে ঐ একই মর্মে যুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভের এক ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি আদায়ের প্রয়াস চালান। একথা ঐতিহাসিক সত্য, যে বোস বা গান্ধীজী কেউ যুদ্ধে লিপ্ত কোন পক্ষ থেকে কোনরকম সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সক্ষম হননি। আরও মনে রাখা দরকার ব্রিটিশদের বিপদের দিনে সহানুভূতি ও সমর্থন প্রদর্শন করেও গান্ধীজী তাদের কাছ থেকে কোন উপযুক্ত সাড়া পাননি। বোস জার্মান

সরকারের কাছে যে স্মারকলিপি (প্রথম স্মারকলিপি দেন ৯ই এপ্রিল, ১৯৪১, পরে অনুরূপ স্মারকলিপি দেন ৩রা মে ১৯৪১) পেশ করেন তার রাজনৈতিক অর্থ উপলব্ধি করতে হিটলার ও তার সমর্থকগণ ব্যর্থ হন। সুভাষচন্দ্র তার দাবী আদায়ের জন্য কখনোও পৃথকভাবে আবার কখনো একক ভাবে ত্রিশক্তির সাথে সুকৌশলে কূটনৈতিক দর কষাকষিতে প্রবৃত্ত হন।

সুপ্রসিদ্ধ জার্মান লেখক জে. এইচ্ ফোক্ত (J. H, Voight) তাঁর "The Indian image in Germany"—গ্রন্থে লিখেছেন—

বোস, নাৎসীশাসন ও জার্মান জাতির মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। হিটলারের সাথে তার হাত মেলানোর অর্থ নাৎসী ভাবাদর্শকে সমর্থন জানানো ছিল না। অবশ্য কিছু লোক এরকম একটা ধারনা এখনও মনে মনে পোষণ করেন। ব্যর্থ হলেও, এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানী পরে জাপানী সহায়তা লাভ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। বোস জার্মানীর প্রারম্ভিক সামরিক সাফল্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তবে হিটলারের নীতি তাঁকে মোটেই খুশী করতে পারেনি। নাৎসীতত্ত্বের প্রতি বোসের বিরূপতা জার্মানীতে বসে ১৯৩৬ সালে থেয়েরফোল্ডারকে লেখা তঁার চিঠি থেকে জানা যায়।

ইতিহাসের অন্যতম পৃষ্ঠার লেখক ডঃ ভের্থ। ডঃ ভের্থ এবং হারবিথ লিখিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ "Netaji in Germany"-তে ডঃ ভের্থ লিখেছেন ; প্রসঙ্গত: ডঃ ভের্থ জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের Special Department, India (Indienreferat) দপ্তরের অন্যতম সচিব।' তখন বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন রিবেনট্রপ। এই কারণে খুব নিকট থেকে নেতাজীকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে জার্মানীতে আসার সময় (এই সময়েই তিনি তাঁর নিরপেক্ষ ইতিহাস গ্রন্থ "The Indian struggle, 1920-1934" লেখেন) হিটলার এবং জার্মান চরিত্র সম্বন্ধে ভালোভাবেই জেনেছিলেন। এমন কি ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে জার্মানরা যে কতখানি অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখতেন, তাও তিনি জানতেন। তবুও ১৯৪১ সালে তিনি তাদেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন কেন, এই বিতর্কিত বিষয়টির উপর ডঃ ভের্থ যে প্রনিধানযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন, তা হ'ল—"বোস ছিলেন বাস্তববাদী, তাই সমস্যাবলীকে তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করতেন। অক্ষশক্তির মধ্যে সামরিক দিকে

সবিশেষ অগ্রগণ্য রাষ্ট্রের কাছে থেকে সাহায্য গ্রহন করার গুরুত্ব তাঁর কাছে বেশী প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। ইতালীতে অবস্থান করলে তিনি নিঃসন্দেহে অনেক স্বাচ্ছন্দলাভ করতে পারতেন। তবুও প্রথম থেকেই তিনি এমন জায়গায় যাওয়া সাব্যস্ত করেন যেখানে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার বিষয়ে কাজ করার সর্বোত্তম সুযোগ লাভ করতে পারবেন। বিশ্বের পরিস্থিতি যদি অন্যরকম হোত এবং কাবুলে যোগাযোগ করার পর যদি তিনি বুঝতেন সোভিয়েত সরকার তাঁর কাজে তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা দান করবেন তাহলে হয়তো বোস মস্কো যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন।"

*   *   *   *   *

কর্মক্ষেত্র থেকে অন্তর্ধান হওয়ার পর কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী বিশেষ করে সেই সব দেশে খ্যাতিলাভ করবেন, যে সমস্ত দেশে এখনও তিনি পূর্ব স্বীকৃতি পাননি। অর্থাৎ ইউরোপে এবং আরও কিছুকাল অতীত হলে কমিউনিস্ট দেশ সমূহেও। অমরতালাভের এই পথ দীর্ঘ কিন্তু অধিকতর নিরাপদ।...অতীত শতাব্দীতে অস্ট্রীয়ার হাত থেকে ইতালীকে মুক্ত করার প্রয়াসে সচেষ্ট মহান গ্যারীবল্ডীর মত তিনিও নিঃসন্দেহে ইতালীতে সম্মানিত হবেন।

জাপান থেকে সংগ্রাম চালিয়ে চীনের রাজতন্ত্রের অপশাসনের হাত থেকে চীনকে মুক্তিদান করে সান-ইয়াং-সেন যে সম্মান অর্জন করেন কমিউনিষ্ট চীনেও নেতাজী কালক্রমে ঐরূপ সম্মানের অধিকারী হবেন। আয়র্লণ্ডকে যুক্তরাজ্য থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে ডি. ভ্যালেরা যে স্বীকৃতি পেয়েছেন, কিছুকাল আগেই হোক বা পরেই হোক নেতাজীও অবশ্যই আইরিশ জনগণের কাছে সেই একই রকম সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করবেন। পরিশেষে, চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতার জন্য ব্রিটেন থেকে কার্যরত ম্যাসারিকের (Massaryk) মত ইউরোপীয় দেশ সমূহে নেতাজীর মূল্যায়ন সম্ভবতঃ অনুরূপ ভাবেই হবে। যারা নেতাজীকে জানতেন, তাঁর সাথে একসঙ্গে কাজ করেছেন অথবা যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই নেতাজীর মত বিরাট ও বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

বর্মার স্বাধীনতা উৎসব। বর্মার জনপ্রিয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম. নেতাজীকে সাদর আমন্ত্রন জানিয়েছেন। নেতাজী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে এসেছেন। ডঃ বা. ম.-র. নিজের কথায়—

"It was at the Singapore airport that we met. Bose made a find handsome and towering figure among the people round him and he was at ease with all of them. I simply saw Bose as a very palpable presence whose general bearing and personality made him stand out in that vast glittering scene of Military Pomp and Power".

অন্যত্র বলেছেন—

"অতীত ও বর্তমানকে আমি যেন একই সঙ্গে দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, দীর্ঘ দিন ধরে ভারতবর্ষে যে ঐকান্তিক বিপ্লব সাধনা চলছে সুভাষচন্দ্র যেন তারই মূর্ত প্রতীক। মনে হল, সেই বিপ্লব সাধনা যেন এশিয়ার বৃহত্তর বিপ্লবের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে এবং এশিয়াকে তা যেন পাল্টে দেবে।"

সুভাষ তখন জাপানে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছেন জাপানে। জাপানী সৈন্য ও আজাদ হিন্দ বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ক'রে দুর্মদভাবে এগিয়ে চলেছে। এই সময় জাপানী সমর নায়কদের মনে হোল ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে যৌথ ভাবে কাজ করার জন্য আগে থেকেই একটা কাউন্সিল গঠন করে আর একজন চেয়ারম্যান ঠিক ক'রে রাখা প্রয়োজন। যেহেতু জাপান তার শক্তি বলে ব্রিটিশ, মার্কিন, ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশী শক্তিকে পরাস্ত করেছে—সেইহেতু চেয়ারম্যানের পদটা জাপানেরই প্রাপ্য। গর্জে উঠলেন নেতাজী—অসম্ভব, এ হতেই পারে না। জাপানের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান. এ কথা ভাবাই যায় না। নেতাজী অনমনীয়। জেনারেল সেগু, জেনারেল ইসোদা, মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো, কর্ণেল কাগোয়া প্রভৃতি সমর নায়কদের সঙ্গে নেতাজী একা ছ'ঘণ্টা ধরে লড়লেন। S. A. Ayer লিখছেন—

"With Extraordinary Patience Netaji would put forward in very clear language all the important reasons why he could not accept the proposal. He told them in plane language that a Japanese Chairman for the Indo-Japanese

War cooperation council on Indian soil was absolutely out of the questions, and he was not going to budge an inch of this issue." শেষ মীমাংসা করেন নেতাজী। council হোক তবে চেয়ারম্যান থাকতেই হবে এর কি মানে আছে? তার চেয়ে একজন গভর্ণর হোক, এবং এ পদের উপযুক্ত ব্যক্তি মেজর জেনারেল এ. সি চ্যাটার্জী। নেতাজীর এ প্রস্তাব জাপানী সমর নায়কগণ মেনে নিতে বাধ্য হন। এ হোল ইতিহাস। খাঁটি ভারতীয় ইতিহাস।

আছে, আরও ইতিহাস আছে। স্যার হিউ টয় (Hugh Toye) তাঁর গ্রন্থ "The Springing Tiger" এ বলছেন—

বিচার পর্বের আকস্মিক পরিণতিতে বোঝা গেল সুভাষচন্দ্রের কতখানি প্রভাব —তাঁর এত প্রভাব আগে কখনো দেখা যায় নি। ...ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার দ্বারদেশে তখন এমন একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে হারানো দুর্ভাগ্য বলতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিক থেকে একমাত্র ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যার সঙ্গে কতকাংশে এর তুলনা চলতে পারে। কেননা মৃত্যু-কালে সুভাষচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র আটচল্লিশ; শ্রীযুক্ত নেহরুর চেয়ে আট বছরের ছোট। চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক জীবন সত্বেও তুলনায় তিনি নবীন, তখন তিনি কতকটা তারুণ্যের মুখপাত্র; যুবকদের কাছে দুর্নিবার তাঁর আকর্ষণ এবং অবিসংবাদিত ভাবে তখনও তাঁর দিক থেকে স্মরণীয় বহু কিছু দেবার ছিল। কী তিনি দিয়েছেন এবং কী তিনি দিতে পারতেন—সেবিচার তাঁর স্বদেশবাসীদের করতে হবে; তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার যাথার্থ্য, তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি, যুক্তিযুক্ততা ও কার্য্য-ক্ষমতা খতিয়ে দেখতে হবে। ধারণার বিশালতা, তাঁর দুরন্ত উৎসাহ যা অন্যকে টানে, তাঁর লেগে থাকার ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত প্রাণশক্তি, তাঁর রেখে যাওয়া আত্মোৎসর্গকারী দেশভক্তির ঐতিহ্য—এই দিয়েই সুভাষচন্দ্র বসুর মহত্বের পরিমাপ করতে হবে। ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অনস্বীকার্য্য।...নিজের দেশকে তিনি বহু কিছু দিয়ে গেছেন। যা তিনি গড়েছিলেন তার সমস্তই ভেঙ্গে পড়লেও কিছু কিছু সার জিনিষ থেকে গেল। ভারতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যদি তিনি দেখে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়া যেত।"

সুভাষ ইতিহাস পুরুষ। স্বর্ণাক্ষরে তাঁর ইতিহাস লেখা থাকবে চিরকাল। অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীও নীরব ছিলেন না—

"The greatest lession that we can draw from Netaji's life is the way in which he infused the spirit of unity amongst his men. So that they could rise above all religious and provincial barriers and shed together their blood for the common cause. His unique achievement would surely immortalise him in the pages of history. ···As Tulsidas has said that no wrong attaches to the really mighty, so no blame could be ascribed on Netaji's name for his escape "

ভারতের পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহ্মেদ তাঁর ৬. ১. ৭৬. তারিখের ভাষণে বলেন—"Netaji Subhas chandra Bose inspired millions of our youngmen to a life of sacrifice, valour and patriotism and made them pledge into the freedom struggle. He has left behind a deep imprint on all our national activities. I offer my respectful tribute to the memory of Netaji and hope that his life and work will inspire our generations to come."

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর ১৫.১.৭৬ তারিখের ভাষণে বলেন—"সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ তাঁদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে বরণ করেছিল। দেশের যুব সম্প্রদায় পেয়েছিল তাদের প্রিয়, বলিষ্ঠ নেতাকে। নেতাজীর আত্মত্যাগ, কর্মসাধনা, অমিত তেজ ও দুর্জয় সাহস আমাদের সবার কাছে এক বিরাট প্রেরণা। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামমুখর জীবন, অতুলনীয় দেশপ্রেমের দীপ্তি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব নেতাজীকে দিয়েছে অমরত্ব। সুভাষচন্দ্রের পুরুষসত্তার মেরুদণ্ড ছিল তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। 'আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব'—এ শুধু আশ্বাসবাণী নয়, এ এক সুদৃঢ় অঙ্গীকার,—এ এক বজ্র কঠোর বীজমন্ত্র যা লক্ষ লক্ষ মানুষের ধমনীতে জাগিয়ে তুলেছিল বিরাট উন্মাদনা, দিয়েছিল অমিত শক্তি। সার্থক নেতার নেতৃত্বের ভিত্তি—স্বচ্ছ দৃষ্টি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, কঠোর সংকল্প ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।"

৮ই এপ্রিল ১৯৭৮—ভারত অষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত

আলোচনাচক্রে লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার এন. জি. গোরে নেতাজী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন—

"আমি আন্তরিকভাবে মনে করি সুভাষবাবু যে অভিযান চালিয়েছিলেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তা সত্যিই 'এক দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলে দিয়েছিল। যদিও সেই অভিযান তার নিজস্ব পথে, লক্ষ্যে পৌছুতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, গান্ধীজী যখন মুক্তিলাভ করেন তখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বিক্ষিপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই বলে কি একথা বলা ঠিক হবে যে, স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর কোন দান নেই? আমার মতে মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষবাবু উভয়েই চমৎকার ভাবে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছেন।...সুভাষবাবু যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করতেন তাহলে তিনি নিজের কাছে খাঁটি থাকতে পারতেন না।"

চীনা শুভেচ্ছা মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল কু তাং চু ২২শে মার্চ ১৯৭৮, নেতাজী ভবনে সুভাষ বসুর জীবনালেখ্য পরিদর্শনকালে যে মন্তব্য করেন, ২৩শে মার্চ ১৯৭৮ আনন্দ বাজার পত্রিকা সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত করেন—

"...চীনা শুভেচ্ছা মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল কু তাং চু সুভাষ বাবুকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক বলে আখ্যা দেন।......ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতকে যেভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে, তেমনই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনুরূপ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে চীনকেও। 'ভিজিটের বুকে' কু মন্তব্য লিখলেন, চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় জনগণ যে বিপুল সমর্থন জুগিয়েছে তার জন্যে তাঁরা চিরকৃতজ্ঞ।"

সুভাষের ইতিহাস জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। আমাদের আর কিছু না থাকলেও গর্ব করবার মত চরিত্র আছে—সে হোল সুভাষচন্দ্র। এই তো সেদিন, ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উক্তি—

"স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবনপণ করেছিলেন, দুঃখকে জয় করে দুঃখাতীতের মুক্তির সন্ধানে অভিযাত্রী হয়েছিলেন, তাদের তোমরা স্মরণ কর। স্মরণ কর নেতাজী সুভাষকে।" এইতো স্বাভাবিক নিয়ম। এমনি করেই যুগে যুগে ইতিহাস ফিরে আসে। ইতিহাসের সেই শিক্ষাকে নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করতে পারলে আমাদেরই লাভ হয়। তাই যা কিছু সুন্দর, যা শিক্ষণীয়, যা আমাদের কল্যাণকর সেই বিস্মৃত ইতিহাসকে বার বার স্মরণ করা প্রয়োজন।

॥ মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষচন্দ্র ॥

—শশাঙ্ক শেখর সান্যাল

আইনের জগতে চালু আছে, কথার মারপ্যাঁচে বা শাস্ত্রের ঝুড়ি দিয়ে আসল কথা ঢাকা যায় না, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস যে মারা যান নি তা খোসলা কমিশনের গতানুগতিক, ফরমায়েসী ও বেঁধে দেওয়া যুক্তি ও সিদ্ধান্তে খণ্ডিত হয় নি। এ সিদ্ধান্ত আদেশের ইঙ্গিত পালন মাত্র। এ যেন জ্যামিতির ধুঁয়া—যা প্রমাণ করতে হবে তাই প্রমাণ করলাম। আমি বাক্য বিস্তার করতে চাই না। আমার সে বয়স নেই। আমি ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে চাই না। যদিও আমার পক্ষে আবেগবর্জ্জিত হয়ে সুভাষ সম্বন্ধে কোন কথা চিন্তা করা বা ব্যক্ত করা সহজসাধ্য নয়। সুভাষ নিরুদ্দেশ হন ১৩ তারিখে। আর তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দীর্ঘ কথোপকথন তার দশ দিন আগে অর্থাৎ ৩রা জানুয়ারী। এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, আমি বাহাদুরী নিচ্ছি সুভাষের নিরুদ্দেশ পরিকল্পনা আমার কাছে তুলে ধরেছিলেন এই বলে। বিন্দুমাত্রও নয়। তবে বুঝেছিলাম যে, তিনি বিশেষ কিছু অসাধারণ ব্যাপারে নামতে যাচ্ছেন। অবশ্য সেই সময় তিনি অনেক গোপন বিষয় আমার গোচরে এনেছিলেন যা তাঁর বিনা অনুমতিতে বা ইঙ্গিতে আমি এখনও প্রকাশ করতে হকদার নই। আমার এখন সাতাত্তর বৎসর বয়স। স্বাভাবিক অবস্থায় পরপারে যাওয়া স্বাভাবিক ও সম্ভব। কিন্তু আমি অপেক্ষা করছি সেইদিনের জন্যে যেদিন তাঁর কাছ থেকে অন্ততঃ ইসারা পাবো কি করতে হবে বা হবে না।

লোকসভায় নতুন এক তদন্ত কমিশনের কথা বলা হয়েছে। এতে আমি আকৃষ্ট নই। আমি চাই সংসদের নেতৃত্বে সমস্ত জাতি দুহাত তুলে তাঁকে আহ্বান জানান। এই উপযুক্ত সময়। ১৯৪৬-৪৭ সালে শরৎ বোসের নেতৃত্বে আমি কেন্দ্রীয় আইন সভায় ছিলাম। আমাদের দুজনের অজ্ঞাতে ও অসম্মতিতে অন্ধকার ঘরে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা খণ্ডিত দেশের স্বাধীনতার ডিমে তা দিচ্ছিলেন। যদিও নির্বাচনী ইস্তাহারে আমরা বলেছিলাম, কংগ্রেস দেশ ভাগ হতে দেবে না এবং মেনে নেবে না। এ বিষয়ে গান্ধীজীরও পরোক্ষ সহায়তার ভূমিকা ছিল, কারণ তিনি বাধা দেন নি। আমি ও শরৎ বোস কুণ্ঠিত, কোণঠাসা। আমাদের প্রতিবাদ নীরবে নিভৃতে রোদন করছিল।

একথা না বললে অন্যায় হবে যে, নেহরুর অবস্থা কতকটা স্বতন্ত্র ছিল। তিনি একদিকে স্বাধীন ভারতের......(তা খণ্ডিত হলেও) প্রধানমন্ত্রীত্বের মোহে আচ্ছন্ন, অন্যদিকে প্রতিশ্রুত আদর্শবাদের কাঁটা তাঁর গলায় খোঁচা দিচ্ছিল। তদানিন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ও সেনানায়ক অকিনলেক সিঙ্গাপুরে ভারত-বিভাগ নিয়ে শলাপরামর্শে ব্যস্ত। ওয়াভেল বলেন—চল আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাই, হিন্দু-মুসলমান নিজেদের বিষয় নিজেরাই বুঝে নিক। অকিনলেক বলেন—এ দায়িত্ব আমাদের। এটা আমাদেরই করে দিয়ে যেতে হবে। এরই মধ্যে ভূপালের নবাব একটি নির্দিষ্ট প্লেনে পণ্ডিত নেহরুকে সিঙ্গাপুরে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিলেন। নেহরু তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে সেখানে আনানো হল। সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে যে কটি প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটি এইরূপ—সুভাষ বোসকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতায় খরচ লেখা হয়নি। সে মৃত অথবা নিখোঁজ হয়েছে এটা আমাদের কথা নয়। সে ফিরবে না একথাও আমরা ধরে নিই নি। কাজেই সে যদি ভারতবর্ষে ফিরে আসে তবে প্রধানমন্ত্রী সে হবে, না তুমি হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন—বাংলা যদি ভাগ না হয় তবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বাঙালী হবে না তোমার উত্তরপ্রদেশের লোক হবে? এই প্রশ্ন দু'টির অঙ্গুলি নির্দেশ সুস্পষ্ট। পণ্ডিত নেহরুর দ্বিধা ঘুচলো এবং তিনি দেশভাগে রাজী হলেন। বহু বৎসর পূর্বে আমি 'যুগবাণী' পত্রিকা মারফতে একথা দেশবাসীকে জানিয়েছিলাম। সরকারী বা বেসরকারী মহল থেকে কোনো প্রতিবাদ আসেনি। কয়েক বছর আগে আমি যখন রাজ্যসভার সদস্য তখন আমার বিঠলভাই প্যাটেল আবাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওল্ডহ্যাম সাহেব আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন—"আমি জানি আপনি নেতাজীর একান্ত সহচর ছিলেন। আমি নেতাজী সম্পর্কে অধ্যয়ন অনুশীলন করছি। আপনার কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।" আমি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উপরোক্ত ঘটনাটি জানাই এবং অনুরোধ করি তিনি যেন সিঙ্গাপুর থেকে প্রেরিত ঐরূপ বিবরণ ব্রিটিশ সরকারে গচ্ছিত আছে কিনা তার অনুসন্ধান করেন। তিনি বলেন যে, তিনি সোজা মাউণ্টব্যাটেনের কাছে গিয়েই এ বিষয়ে সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন। সময়টা বোধ হয় তখন জুন মাস। তিনি বললেন যে, যদি মাউণ্টব্যাটেন এ ঘটনা অস্বীকার করেন তবে নভেম্বর মাসের মধ্যে আমাকে জানাবেন, "অন্যথায় আপনার বক্তব্য সুভাষ সম্বন্ধে আমার অনুশীলন গ্রন্থে এ বিষয়ে

উল্লেখিত হবে।" সেই সময়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, দেশ বিভাগের প্রতিবাদের মাশুল হিসাবে শরৎ বোসকে ও আমাকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল। নভেম্বর মাসের মধ্যে কেন, তারপরে আজ পর্যন্ত ওল্ডহ্যাম সাহেব আমাকে মাউন্টব্যাটেনের বা ওয়াভেলের বা অকিনলেকের কোনো প্রতিবাদ জানান নি।

আর একটি গ্রীষ্মের দিন। আমি তখন শরৎ বোসের কলকাতার বাড়ীতে অজ্ঞাতবাসে। দু'জনারই বন্দীজীবন। হঠাৎ টেলিফোনে একটি বামাকণ্ঠ, জিজ্ঞাসা—শরৎ কোথায়? আমি বললাম—তিনি খাচ্ছেন। আবার প্রশ্ন—আপনি কে? সুভাষের সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ? আমি বললাম—সুভাষের নিরুদ্দেশ যাত্রার পূর্বে বেশ কিছুদিন আমি তাঁর একান্ত গোপনীয় বিষয়ের সহচর ছিলাম। তিনি বোধ হয় আমেরিকান সাংবাদিক, তখন সুইজারল্যাণ্ড থেকে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি সুন্দরী বালিকা, মনে হল অষ্টাদশী—লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে শরৎবাবুর বসবার ঘরে ঢুকলেন। একটা চেয়ারে বসেই একবার আমার দিকে একবার শরৎবাবুর দিকে তাকালেন। বোধ হয় ইতস্ততঃ করছিলেন আমার সামনে কিছু বলতে। শরৎ বোস বুঝতে পেরে বললেন, আমরা দুজনেই সুভাষের একান্ত অনুগামী, তিনি অসংকোচে কথা বলতে পারেন। মহিলা তখন আকর্ষণীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বললেন—"শরৎ, আমি তোমাকে একটা ভালো খবর দিতে এসেছি। আমেরিকা এবং ইউরোপের সাংবাদিকেরা সুভাষের তথাকথিত মৃত্যু ঘটনা কেউ বিশ্বাস করে না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের খাতায় তিনি এখনও মৃত নন। আমাদের সংবাদ এবং এ সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করি যে, তিনি এখন চীনদেশে সা-সুন ছদ্মনামে অবস্থান করছেন।"

আর একটা কথা। তখন আমি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। সুভাষের বিশ্বস্ত হবিবুর রহমান আমার ক্যানিং লেনের বাসভবনে আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর কাছে দু-একদিন এসেছিলেন। আমার স্ত্রীকে আমি বরাবর ব্রাহ্মণীই বলি। প্রচণ্ড শীতের এক সন্ধ্যায় টেলিফোনে রহমান সাহেব জানালেন, তিনি এসে আমার এখানে লুচি খাবেন। খানিকক্ষণ পর তিনি এলেন। আমি বললাম, "কর্ণেল, তোমার গায়ের এই নতুন উলের জ্যাকেটে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।" তিনি হঠাৎ মুখ ফসকে বললেন—"এ জ্যাকেটটি আমার নতুন নয়। বিমান দুর্ঘটনার সময় এ জ্যাকেট আমার পরণে ছিল।" এই বলেই তিনি থতমত খেয়ে গেলেন। আমার ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনার হল কি. আপনি খাচ্ছেন না কেন ?" আমার অশিক্ষিতা ব্রাহ্মণীও ব্যাপারটি বুঝে ফেললেন। দেখা গেল যে, রহমানের হাতের কব্জিতে মাত্র ছিটেফোঁটা কয়েকটি সাদা দাগ, উলের জ্যাকেটটিতে কোন আঁচ বা আঁচড নেই। তারপরে আমরা ক্যানিং লেনে, এবং ফিরোজ শা' রোডের মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। আমি তখন সিগারেট খেতাম। একটা সিগারেট ধরালাম কর্ণেল ধূমপান করতেন না তবুও তিনি একটা সিগারেট আমার কাছ থেকে নিয়ে ধরিয়ে বললেন—"সান্যাল, আমি তোমার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। একথা যেন আর কেউ জানতে না পারে।" আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, আপাততঃ আমি কাউকে বলবো না। পরে এ বিষয়ে আমি "যুগবানীতে" লিখে ছলাম।

আর একদিন দিল্লীর কুইনস্‌ওয়েতে আমি ব্যবস্থা করে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হবিবুর রহমানের সাক্ষাতের আযোজন করেছিলাম। মহাত্মা গান্ধী বিমান দুর্ঘটনাব কথা জানতে চাইলেন। হবিবুর রহমান তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তব্য পেশ করলে মহাত্মা গান্ধী জিজ্ঞেস করলেন—আর কিছু বলার আছে। কর্নেল বললেন—না, আর বিশেষ কিছু বলার নেই। মহাত্মা গান্ধী গর্জে উঠে বললেন—"...তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। সুভাষ মরেনি—মরতে পারে না।" আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর কিয়ানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এই সাজানো মৃত্যুর বিষয়ে হবিবুর রহমান সাহেব বাছাই করে ভারপ্রাপ্ত হলেন কেন? তাতে কিয়ানী সাহেব বলেন যে, নেতাজীর মতে কর্ণেল সাহেব তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তিনি তাঁর এক কথায় নিজের প্রাণ বলি দিতে পারেন। এর বেশ কিছুদিন পরে দিল্লীর সুভাষ অনুরক্ত ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেতা লালা শঙ্করলালের দিল্লীর আবাসে কর্ণেল হবিবুর রহমন অতিথি। একই ঘরে সত্যরঞ্জন বকসী ও তিনি ছিলেন। হবিবুর রহমান আমারই মত অর্ধনগ্ন অবস্থায় শুয়ে থাকতেন। পরণে একটি ইজার মাত্র। ভোরবেলায় উঠে রহমান সাহেব ব্যায়াম করতেন। সেই সময় দেখা যায় তাঁর শরীরের কোনো জায়গায় কোনো পোড়া দাগ নেই—সেই কব্জীতে ছিঁটে-ফোঁটা দাগ ছাডা। এতেই সবটা ধরা-পডে যায় এবং সত্য বকসী যখন একথা জানান তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

এছাড়া আরও অনেক কথা, অনেক বিষয় জানবার আছে। সুভাষ মরেনি। সে বেঁচে থাকলে দেশের পক্ষে মঙ্গল আর বেঁচে যদি না থাকে তো দেশের চরম দুর্ভাগ্য।

দিলীপ চক্রবর্তী সম্পাদিত "জনমহল" ১ম বর্ষ/৪৫ সংখ্যা হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত।

দুস্তর-পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে

রোমাঁ রোলাঁর ডায়েরী থেকে

।। এপ্রিল—১৯৩৫ ।।

সুভাষচন্দ্র বোস এসেছিলেন। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, বামপন্থী সোসিয়ালিস্টের একজন নেতা। ছয় কি আট বৎসর বন্দী ছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের দরুণ ইউরোপে এসে এখন রয়ে গেছেন। কার্যত ভারতে এর ফেরাও (প্রায়) অসম্ভব। বয়সে এখনো যুবা, তবে সব সময় নানা ভাবনা নিয়ে আছেন—গম্ভীর কপালের চিন্তারেখাগুলি একটুক্ষণের জন্যও চপলতায় মুছে যায় নি।

সম্প্রতি ইংরাজীতে ভারতের গত দশ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন—তাতে এঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত রাজনীতি-বিদের মত, নিজের ব্যক্তিগত মত নিরপেক্ষ হয়েই ঘটনাগুলি ও নায়কদের বর্ণনা করেছেন, এটি লক্ষ্য করার বিষয়। যদিও কোনো কোনো নেতাদের সঙ্গে তাঁর নিজের তফাৎ যে কোথায়—তাও (বলেছেন) লুকিয়ে যাননি।

এসে আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁর মতে গান্ধীর কূটনৈতিক নির্দেশ কোণে পৌঁছে দিয়েছে (ভারতকে)। সেই পথ ছাড়তে হবে ভারতকে, যদি আরও অগ্রসর হয়ে সে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়। তার মতে অহিংসভাবে দেশের শাসনকার্যে বাধা সৃষ্টির চাল যে নিষ্ফল হয়েছে তা আজ পরিষ্কার। তাতে জয়ের সম্ভাবনা ছিল—যদি একেবারে সর্বত্র রাজকর্ম-চারীদের বিপর্যস্ত ও শাসনকার্য লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া যেত। যেভাবে ঘোষিত হয়েছিল (প্রারম্ভে) সেই মত পুরাপুরি বিদেশী পণ্য বর্জন করা যায়নি। যেদিকে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, সেই পথের শেষ অবধি, গান্ধীজী নিজে যেতে রাজী নন। সহকর্মীদের কখনও তিনি বলপ্রয়োগ করতে দিতে সম্মত নন। কখনও চাননি একনায়কের মত চলতে বা অন্য কাউকে সেইভাবে চালাতে, যদিও এই ধরনের শাসন-প্রতিরোধে সেটি দরকার। কঠোরভাবে শাস্তির উদাহরণ খাড়া না করলে, যারা চঞ্চল ও অস্থিরমতি বা যারা মুনাফা-লোভী তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কারণ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করতে রাজী হয়নি।

অন্যদিকে ইংরেজ সরকার বহুদিন অস্থিরভাবে Civil Resistance-এর বিরুদ্ধে নানা ব্যবস্থার চেষ্টা করে শেষকালে এমন একটি পাল্টা কর্মপন্থা আবিষ্কার করেছে যাতে গান্ধীর চাল মাৎ হয়ে গিয়েছে। পূর্বেকার কয়েক বৎসরের মত সরকার তার হাজার হাজার ভারতীয়দের জেলে আটকাচ্ছে না (তখন সব জেলখানা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল, বিচার ও শাস্তিদানেরও শেষ ছিল না।) এইবার সে শুধু সেই নেতাদেরই বহু বৎসর কারাগারে আটকাবে,—যারা এই আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। (যেমন জওহরলাল বা বোস ইত্যাদি) কোথাও (এবার) আন্দোলন বিন্দুমাত্র শুরু হলেই তাকে কঠোরভাবে দমন করেছে। গান্ধীর অহিংস নীতিতে তাদের সুবিধা, তারা আরামেই আছে। তারা বুঝেছে, তাদের সম্পর্কে ভয় করার কিছুই নেই। এমন কি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সোসিয়ালিস্ট নেতা Wedgwood-Ben, যিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহানুভূতিশীল, তিনিও সম্প্রতি (প্রো) রাধাকৃষ্ণনকে বলেছেন, "শেষ অবধি ভেবে দেখ কেনই বা আমরা ভারত ছেড়ে চলে আসব—যদি ভারতীয়েরা নিজেরাই আমাদের বহিষ্কৃত করতে অপারগ হয়।"

সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপে বোস নিজে সম্মতি না দিলেও বললেন, এরাই কেবলমাত্র ভারতে ইংরেজদের সমস্যায় ফেলেছে। বস্তুতঃ সংখ্যায় অল্প ও মাত্র বাংলাদেশেই সীমিত থাকলেও এদের কার্য (এবং) তার প্রতিক্রিয়া (শাসনতন্ত্রকে) গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। কারাগারে থাকতে বোস এই স্বীকারোক্তি ইংরাজ কর্মচারীদের মুখেই শুনেছেন। তাঁর অভিমত এই কার্য-পদ্ধতি দেশময় ছড়িয়ে পড়লে, ইংরাজদের কফপ্রধান (স্থিতিরক্ষা) মেজাজ তাড়াতাড়ি প্রভাবিত হতো। তবু বোস বললেন এই সন্ত্রাস সৃষ্টি একটা সুস্থ রাজনৈতিক আচরণ হতে পারে না। তিনি সুসম্বদ্ধ খোলা প্রতিরোধের পক্ষে, তবে অবশ্য হিংসাকে বর্জন করতে চান না, এই পথে বিদেশী শক্তির সহিত যুদ্ধ করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। সাধারণ মানুষের মন এই যুদ্ধের প্রতি অনুকূল করাই প্রধান সমস্যা।

দেশের সর্বস্তরে, সর্বদলীয় লোকের কাছে গান্ধীর জনপ্রিয়তা প্রচণ্ড। তবু সত্যই ফলপ্রসূ হবে এমনভাবে সেটিকে নিয়োগ করছেন না। অবশ্য গত পনের বৎসরে ভারতে জাতীয়তাবোধ গান্ধী যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন জাতীয়দের যেভাবে একত্র করেছেন, তার ফল অপরিমেয়। তবে স্বভাবে তিনি মধ্যপন্থী, চিরকাল চেষ্টা করছেন বিবদমান নানা দলের এক-

দেশদর্শিয়া যেন একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারে। • অচ্ছ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধে তিনি সব মন-প্রাণ নিয়োগ করে লড়ে যাচ্ছেন, আবার তার সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার প্রতি রক্ষণশীল মনোভাবও প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি পরায়ণ অথচ কর্তাদের বিরুদ্ধে তাদের সংঘবদ্ধ হতে বাধা দিচ্ছেন। যদিও যন্ত্রচালিত শিল্পের খোলাখুলি বিরুদ্ধতা করছেন না, তবু সমস্ত প্রয়াস পরিবর্তিত করেছেন, গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প উজ্জীবনে (চরকার ব্যবহার) এতে যেটুকু সুবিধা হবে, তা লক্ষণীয় নয়—অথচ এইভাবে সমবেতভাবে জাতীয় শিল্প উন্নয়নের আবশ্যিক প্রচণ্ড আন্দোলনটি বিপথে চালিত করছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, সর্বত্রই অগ্রগতিতে পিছুটানের (ভাঁটা) এসে পড়েছে—গান্ধী সব সময়ে সংগ্রামের সংঘাত এড়াতে চাচ্ছেন। শুধু অর্থনৈতিক প্রশ্নের উপর তিনি জোর দিচ্ছেন, শুধু এমন সব প্রশ্নকে প্রাধান্য দিতে চান না যা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করবে।

বোসের মত, কিন্তু সেই সব প্রশ্নের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সোসিয়ালিষ্টদের যদি তারা জনসাধারণের ওপর সার্থকভাবে প্রভাব বিস্তার করাতে চায়। সাধারণকে জাগাতে হলে বিভিন্ন দলের মধ্যে স্বপক্ষ নির্বাচন.করতে হবে। কৃষাণকে ভূমির মালিক করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সোসিয়েলিষ্ট আন্দোলন পল্লীদেশে গড়ে তুলতে হবে। দেশের যোদ্ধ সেনা-দলকে মাত্র এইভাবেই পল্লীতে গিয়েই ছোঁয়া যাবে। তাই অভিযান বিশেষ ভাবে বরণীয়, কারণ গ্রামই সেনা সংগ্রহের ক্ষেত্র। এইখানেই জওয়ানরা জন্মেছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই মাধ্যমকে (সেই পল্লীদেশকে) যত্ন করে পরিচর্যা করা উচিত। তবে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমরে ভারতীয়দের নিষ্পেষিত হয়ে যাবার মত বর্তমানের নিকৃষ্টতা বহুদিন ধরে থাকবে, বোস সে কথা গোপন করলেন না। সেইজন্যই সরলভাবে প্রকাশ করলেন, (তাঁর মত) ইউরোপীয় সমরে ইংলণ্ড যখন বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকবে, সেই সময়েই ভারতের বিজয়ের আশা আরও সুদৃঢ়। আমি বললাম—আমরা চাই না যে এই যুদ্ধ বাধে—কারণ আমাদের এই মনোভাবের তরফে বহু সুযুক্তি রয়েছে। (এতে তিনি একটু হতাশ হলেন,—বেচারী—ভাল মানুষের পোলা।)

আমার কাছে আসার কারণ, আমার মত কি জানবার আগ্রহ! (ভাবতে যে আমার মতের মূল্য আছে তা আমি নিঃসন্দেহে জানি।)—এক বিষয়ে। যদি তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নামেন যাতে হিংসানীতি বর্জিত হবে না,

তাহলে কি আমি তাঁদের পক্ষে থাকবো ? আমি প্রকাশ্যভাবে তাদের বর্জন করে দূরে সরে না যাই—এর জন্য তারা সত্যিই ব্যস্ত হয়েছেন। বোসকে—কে বলেছে জানি না, তাঁরই ফরাসী বন্ধুরা, (তাঁদের মনোভাব দোষণীয় নয়, তবে আমার হয়ে কোন কথা বলার যোগ্যতা সত্যই তাঁদের নেই) তাঁরা বলেছেন গান্ধীনীতি পরিত্যাগ করলে ভারতের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি থাকবে না। বেশ জোর দিয়েই তার বিপক্ষে আমাকে বলতে হলো। বিপ্লবের প্রতি (তা হিংসাত্মক বা অহিংসই হোক) আমার মনোভাব যা—আমি নতুন করে "পনের বৎসর যুদ্ধ" নামক পুস্তকে প্রকাশ করেছি। সেইটি তর্জমা করে বোসকে জানাবার চেষ্টা করলাম। (বোস শুধু ইংরাজী বলেন ও বোঝেন)। যদিও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অটুট থাকবে (এ বিষয়ে বোস ও আমি একমত) তবু তাঁর মতবাদে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত বলে নিজেকে মনে করি না। তাঁর (অহিংস) মতবাদ আমার কাছে (ফলের আশায়) প্রশংসনীয় প্রয়াসের কর্মপদ্ধতি মাত্র। ফল অকিঞ্চিৎকর বা কার্যতঃ একেবারেই বিফল হওয়া সত্বেও গান্ধী যদি এই নীতি অনুসরণেই জোর দিতে থাকেন, সর্বোপরি সংঘাত যখন অনিবার্য হয়ে উঠবে ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে—তখনও সবদিক ভালভাবে বিবেচনা করেও যদি তিনি শ্রমিকদের পক্ষে না দাঁড়ান, তবে তাঁর প্রতিকূলে আমি শ্রমিকদের পক্ষেই বলবো—একথা (আমি) কখনও গোপন রাখিনি।

আমার মনে হলো অন্যান্য প্রতিপক্ষদের মত, বোসও বেশী ব্যস্ত নন গান্ধীর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বা যুক্তির জোরে তাঁরা যে ঠিক পথে চলেছেন গান্ধীর কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আদায় করতে। সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে গান্ধীর (বর্তমান) লেখায় বা কথাবার্তায় যে মতের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—প্রতিপক্ষরা সে কথা স্বীকার করতে রাজী নন। দুঃখের কথা এই আমার মত লোক, যার নৈতিক আদর্শে আস্থা আছে (ভারতবর্ষে আজ নেই) আমি গান্ধীজীকে সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে টেনে নামাবার আশা কখনও বিসর্জন দিতাম না, তবে অহিংস নীতি অনুসারেই সেটি করতে হবে। তিনি তো অহিংসার পথ কখনই ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু বোসের মত লোকদের বোঝা দরকার, গান্ধীর মত একজনকে তাঁদের দলে পেলে জয়যাত্রা তাদের কতদূর এগিয়ে যাবে। আসলে তাঁরা কেউ স্বদলে নিয়ে আসতে বেশী ব্যগ্র নন—কারণ তাহলে তাঁরাই গৌণ পংক্তিতে পড়ে থাকবেন। বোধ

হয় জওহরলাল নেহরুরও সেইরকম অবস্থা। ভাব-ভাবনায় গান্ধীর থেকে তিনি অনেক তফাতে, প্রায় কমিউনিজমের চৌকাঠ পার হতে চলেছেন—যদি ইতিমধ্যেই সে ভাবরাজ্যে না প্রবেশ করে থাকেন। কিন্তু গান্ধীর প্রতি পুত্রজনোচিত শ্রদ্ধার বশে কার্যে দুর্বল ও অনিশ্চিতমতি বলে মনে হয়।,

এবিষয়ে বোসকেও মনে হল কমিউনিজমের ধারে পৌছেছেন ; কিন্তু এই ভাবের কথা তিনি শুনতে চান না। বোধ হয় এই বিতৃষ্ণার কারণ নিজের ব্যক্তিগত, যারা ভারতে এই দলের প্রতিনিধি তাঁদেরই সম্পর্কে এটি দাঁড়িয়েছে। কারণ খোলাখুলি তিনি বললেন, U. S. S. R. ভারতকে যদি স্বাধীন হতে সাহায্য করে তার মধ্যে সত্যই কোন দোষ তিনি দেখছেন না। এবং এখন U. S. S. R. কে এই জন্যই নিন্দা করছেন যে স্বদেশাত্মিক রাজনীতি করতে গিয়ে আজ তার বিশ্ববিপ্লবে পূর্বের মত কৌতূহল বা ঈর্ষা নেই।'

* মূল ফরাসী ভাষায় লিখিত রোমা রোলাঁর ডায়েরী (journal Inde 1915-1943) থেকে **জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু** অনূদিত এই প্রবন্ধটি 'কম্পাস পত্রিকা (৫ মার্চ, ১৯৬৬) হ'তে কৃতজ্ঞতার সহি • সংগৃহীত।

একটি পত্রাংশ

9, Beech Close
Walton on Thames,
Surrey, England.
20 September, 1968

My dear Pramatha*,

What has annoyed me most about the Subhas Bose incident is that Toye in his 'Springing Tiger' a life of Bose, says in his account of the incident, that at length t e English lecturer concerned (not naming me, fortunately) laid his hand ou a student. It is a cowardly phrase, meaning whatever the reader likes to read into it. Iu the whole of my service in India I never at anytime laid my hand on any Indian. I wrote to toye, who replied that he had writ.en the best account he could compile from available evidence. ....

Yours affectionatly,
Farely✝

* ডঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি, প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যক্ষ, আইন কলেজ। ✝ Farely=ই. এফ্. ওটেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার সৌজন্যে।

॥ সাহিত্যপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র ॥

'—চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

[সুভাষচন্দ্রকে আমরা জানি বাংলা তথা ভারতের এক বরেণ্য নেতারূপে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের অনেক কিছুই এখনও অনুদ্ঘাটিত এবং মহাভারতের কাহিনীর মতই অবিস্মরণীয়। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তাই 'নেতাজী'কে বাদ দিয়ে নিছক সুভাষচন্দ্র, যিনি বাংলার রূপে-রসে-স্পর্শে-গন্ধে হয়ে উঠেছিলেন এক আদর্শ পুরুষ, মহাকবি এবং এক সাহিত্যরসিক বাঙালী হিসাবে।]

একথা প্রামাণ্যরূপেই প্রমাণিত যে বাংলার মাটি—কবির মাটি, ভাবুকের মাটি। ভারতের মাটি—দর্শনের মাটি, ধর্মের দেশ—যা তার মানুষকে প্রকৃতি-পূজারী করে তোলে, যা তাকে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে নিয়ে যায়, ভূমার দিকে পথ করে দেয়—যা তাকে প্রজাপতির সহস্র রঙের সমাহারে সুন্দর ক'রে তোলে,—শতদলের মত প্রস্ফুটিত হবার প্রেরণা জোগায়। তাই, কাব্য-সাহিত্য দর্শন-ধর্মতত্ব, যা কিছুই মানুষের জীবন-যাত্রার পাথেয়, সব কিছুর মধ্যেই পাওয়া যায় এর নিদর্শন, আর পাওয়া যায় প্রেমিক মানুষ হবার ইসারা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় বাস্তব-জীবন, অরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মন্ত্রঃপূত জীবনের দিকে তাকালে এর সত্যতা প্রমাণিত হতে হয়ত বেশী দেরী হবে না। এই ঐতিহ্য-মণ্ডিত বাংলার বুকে লালিত হয়ে সুভাষচন্দ্র যে অন্য কোনরূপে প্রতিভাত হ'তে পারেন, এ আশা বড় একটা করা সমীচীন হবে না। রবীন্দ্রনাথের মত সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভাবুক কবি, জীবন-কাব্যের মহাকবি (যদিও ছন্দ মিলিয়ে কবিতা তিনি লিখেছেন কি না, জানা নেই), রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতই সংযমী এবং সংগ্রামী আদর্শ পুরুষ আর দেশবন্ধুর মতই স্বপ্ন সাধক। কবি বা সাহিত্যিক কাকে বলে? মানুষের মুখের ভাষাকে, অভিধানের কারাগারে আবদ্ধ নিষ্প্রাণ শব্দকে যিনি প্রাণচঞ্চল ক'রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনে গতিশীল ক'রে তোলেন, তিনিই তো কবি। যাঁর অন্তর-দ্বার উন্মুক্ত নয়, যার হৃদয় প্রেমরসে সঞ্জীবিত নয়, তিনি কি সাহিত্যিক?

ছবির যেমন ল্যাণ্ডস্কেপ, সাহিত্যিকদেরও তেমনি-সাহিত্য আবেগের থাকে

পটভূমিকা। টুকরো টুকরো জীবন, টুকরো টুকরো পরিবেশের মধ্য দিয়ে কবি সাহিত্যিকের আত্মঃভঙ্কার চলে একটি পরিপূর্ণ জীবন সত্যের দিকে। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে যিনি স্বরূপে তাকে মূর্তায়িত করে তোলেন, তিনিই তো যথার্থ কবি বা সাহিত্যিক।

সুভাষচন্দ্রকে যখন আমরা পাই, তখন সংস্কৃতি-জগতে চলেছে এক বিপুল আলোড়ন. মতবৈধ রাজনীতির আবর্তে মানবিক এবং সামাজিক ক্ষেত্র এক ভয়াবহ শূন্যতায় আতঙ্কিত। প্রাণহীন বস্তুর সচলতার মতই এক যান্ত্রিক তাড়নায় বাংলা তথা ভারতের অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত। এক ভয়াবহ শূন্যতা যেন তখন সর্বগ্রাসী। সেই শূন্যতার হাত থেকে মুক্ত করে জাতিকে তার সংস্কৃতি তথা সংহতির মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েই আবির্ভূত হন কেশব সেন, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, তিলক, গান্ধী। রচিত হ'ল ভবিষ্যৎ পথ। চিন্তায়, ধারণায় এবং কর্ম-প্রণালীতে কিছু পরিমাণে বৈপরিত্য থাকলেও একাগ্রতা এলো অনেকখানি। সেই একাগ্রতা সুচারুরূপে মূর্ত হ'য়ে উঠলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মধুসূদন, টেঁকচাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। চিরাগত কুসংস্কার আর ভণ্ডামি, নিপীড়ন-স্পৃহা আর বীভৎসতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে সুরু হোল সাহিত্যিক জেহাদ। এ সংগ্রাম কল্পনাবিলাসী নয়: এ সংগ্রাম মরুভূমির বুকে বালির রসে গজিয়ে ওঠা সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত—যার আঘাতে ভাঙ্গে নিদ্রিতের নিদ্রা, তন্দ্রাচ্ছন্নের তন্দ্রা। তবুও, একথা সত্য যে যতই বাস্তবতার স্পর্শে সজীব হোক না কেন. ভাববিলাসিতার মোহ সে একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তা সত্বেও এই যুগন্ধরদের বাস্তববোধ এবং সংস্কার স্পৃহা. জাতিকে ধীরে ধীরে আত্মসচেতন করে তুলছিল। এই ক্রমজাগরণের কালেই জ্যোতিষ্কের মতই সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব।

১৮৯৪ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু আর ১৯০২ বিবেকানন্দের ইহলোক ত্যাগ। তাই চিন্তা ও সাহিত্য-জগতে তখনও বঙ্কিমী প্রভাব পুরোপুরি রয়েছে আর বিবেকানন্দের আদর্শ তখন জাতির প্রাণে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করেছে —যে প্রভাব এবং চেতনার হাত থেকে সুভাষচন্দ্রও নিষ্কৃতি পাননি।

সুভাষচন্দ্র যদিও সমসাময়িক সাহিত্যিক বা কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিরাট বিরাট উপন্যাস বা কবিতা রচনা করেন নি. আর সাহিত্যিক বা কবি হিসাবে কোন খেতাবও তিনি পান নি, তবুও তিনি যে কত উঁচুদরের সাহিত্যিক বা কবি ছিলেন বা রাজনীতির ক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে তা হতে পারতেন, তার জাজ্বল্য প্রমাণ মেলে বহুজনকে লেখা তার পত্রাবলী, বিভিন্ন

সভাস্থলে প্রদত্ত ভাষণ, রণাঙ্গণের রোমাঞ্চকর পরিবেশে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে। মানুষের জীবন যদি কাব্য হয়, তাহলে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব মুহূর্ত থেকে সুরু করে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিপুল এবং বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে তিনি যে সাহিত্য বা মহাকাব্য রচনা করে গেছেন, নিঃসন্দেহে তা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এপিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

—"ঐ দূরে, বহুদূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ বনভূমি আর পর্বত পেরিয়ে রয়েছে আমাদের দেশ, চির-ঈপ্সিত জন্মভূমি, যার কোলে বসে প্রথম এই পৃথিবীকে দেখেছি। আর আজ আবার আমরা চলেছি যার কোলে।

"ঐ শোনো, ভারত ডাকছে, ডাকছে ভারতের রাজধানী দিল্লী, ডাকছে আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ ভারতবাসী, ভাই ভাইকে ডাকছে, রক্তে এসে পৌঁছেছে রক্তের ডাক।

"এই তো সম্মুখে রয়েছে পথ, যে পথ তৈরী করে গিয়েছেন আমাদের অগ্রজেরা। সেই পথ ধরেই আমরা করবো যাত্রা। করবো যাত্রা শত্রুর ব্যূহের ভিতর দিয়েই। এই পথ দিয়েই পৌঁছব অন্তরের ঈপ্সিতধামে, নয়তো, ভগবান যদি করেন, এই পথের প্রান্তেই অর্জন করবো ঈপ্সিত অমর মরণ।"

দৃষ্টির এমন নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছতা, লক্ষ্যাভিমুখীতায় এমন নিশ্চিন্ত প্রত্যয়, ভাব এবং ভাষার সমন্বয়ে শব্দের এই প্রচণ্ড গতিশীলতা কি সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন নয়? প্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসে উচ্চারিত "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত" যদি অমর সাহিত্যের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে তবে সুভাষচন্দ্রের আত্মজ এই শব্দনিচয়ও নিঃসন্দেহে তার সমভাগী।

প্রথম জীবনে যাঁরাই সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের পক্ষেই রোমান্সের সঙ্গে বাস্তবতার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়নি, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তিকালে বাস্তব-বাদীতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। কিন্তু, সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক দৃষ্টির মধ্যে প্রথম থেকেই রোমান্স ও বাস্তবতা পাশাপাশি কাজ করে গেছে। বাঙ্গালীর সহজাত সাহিত্য-প্রীতি নিয়েই সুভাষচন্দ্রের জন্ম। রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা সেই প্রীতিকে স্বাভাবিক পথে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার সুযোগ না দিলেও, তা অপরূপ সৃজন-প্রতিভায় সৌরভ-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। যেখানেই তিনি ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখেছেন,

সেখানে তিনি গঠনের আদর্শও তুলে ধরেছেন—যা একমাত্র প্রকৃত সাহিত্য-সেবীর পক্ষেই সম্ভব। তাই সুভাষচন্দ্র সমসাময়িকের মধ্যে ব্যতিক্রম।

সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু সে স্বপ্ন পরগাছার মত অলীককে জড়িয়ে নেই; সে স্বপ্নের ভিত্তিমূল গ্রথিত হয়েছে বাস্তবের কংক্রীটে। বাস্তব ছাড়া স্বপ্নের সার্থক অস্তিত্ব যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আবার স্বপ্নকে বাদ দিয়ে বাস্তবের মূল্যায়ন মাংস-রুধির ও মনকে বাদ দিয়ে কঙ্কালের মধ্যে মানুষের মূল্যায়নের মতই সত্য। সুভাষচন্দ্রের দর্শন-প্রতীতীই এই মতবাদের মূল ভিত্তি। তাই তাঁর সাহিত্যিক মনটির পরিচয় পেতে গেলে, তাঁর দার্শনিক মনটিকেও জানতে হবে। সুভাষচন্দ্রের দর্শন পক্ষপাতদুষ্ট ভারাক্রান্ত মতবাদের আবিলতায় পুষ্ট নয়। তাঁর দর্শন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ। প্রথম জীবনে সুভাষচন্দ্রকে আমরা দেখি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদে বিভ্রান্ত দার্শনিকরূপে। ১৫/১৬ বছর বয়সে কটক থেকে মা-কে লেখা চিঠিই তার প্রমাণ। তখন, তাঁর এই ধারণাই হয়েছিল যে "পরম সত্যকে মানুষের মনের দ্বারাই আয়ত্ত করা যায়। শঙ্করের মায়াবাদই সমস্ত জ্ঞানের মূল।" যদিও পরবর্তিকালে নেতা সুভাষচন্দ্র যে শঙ্করাচার্যের প্রভাব একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি, তার যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও, যেদিন প্রকৃত জমির উপর দাঁড়িয়ে যথার্থ মাটির আঘ্রান পেলেন তিনি এবং তাঁর মননশীলতার সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষে রোমান্স তিক্ততাব গরলে ছেয়ে গেল, সেদিন সেই গরলকে আর তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। কারণ দর্শন বাস্তব-বর্জ্জিত গগণচারী হোক, এ তিনি কোনদিনই চান নি। তাই যে দর্শনের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক আছে, সেই ব্যবহারিক দর্শনের খোঁজেই তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। বৈষ্ণবের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রথম মুক্ত প্রাণের প্রশান্ত বিস্তৃতির ইসারা দিল তাঁকে, যার মধ্যে দেওয়ার আনন্দ আছে, নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। এ এক অপূর্ব প্রেমদর্শন। জীবাত্মা আর পরমাত্মার এখানে কোন ভেদ নেই—যার স্বীকৃতি মেলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে। আবার কোন কোন দর্শন জ্ঞানের মধ্যেই মুক্তির দর্শন দিয়েছেন। পরামন আর পরাচেতনাই জ্ঞানের বিশুদ্ধিতার পাথেয়। কিন্তু, এই পরাচেতনার স্থান সাধারণ চেতনার বাইরে এক অলৌকিক জগতে—যেখানে যেতে গেলে চাই যোগ সাধনা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান তো আর বাস্তব বর্জিত নয়। এ সাধারণ চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবকে পূর্ণ করে রয়েছে এই যে সাধারণ চেতনা, তার মূল প্রকৃতিই হচ্ছে প্রেম। তাই সুভাষচন্দ্র বললেন—

"আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম"—যার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা থাকলেও বাস্তবের মতই নিত্য পরিবর্তনশীল ও প্রগতির অভিসারী। এই প্রগতি বা পরিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রথমে এল হিন্দু সাংখ্য দর্শন। পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পেন্সরের মতে—প্রগতি অর্থাৎ বিবর্তন মানেই হচ্ছে সরল থেকে জটিলে যাওয়া। তার ফল হার্টম্যান তো খুঁজতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে গেলেন। কিন্তু হেগেলের চিন্তায় কিছু বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাষ মেলে—বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বাহ্যজগতে ও অন্তর্জগতে উভয়েই দ্বান্দিক। সংঘাত সমাধানের মধ্য দিয়েই জীবনের প্রগতি। সুভাষচন্দ্রের মতে এই হেগেলীয় মতবাদেই সত্যের পরিমাণ বেশী. কারণ চেতনার ক্রিয়া। তাই তিনি বললেন "চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম। যার বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে।" প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে চরম বাস্তব। তাই স্বপ্নবিলাসী সুভাষচন্দ্র নিছক কল্পনাশ্রয়ী স্বপ্নের পূজারী নন বরং চরম বাস্তবের মধ্যেই নিহিত তাঁর স্বপ্ন-সাধনা। "...I confess that I am a dreamer. I may tell my enemies that in dreaming dreams of India's freedom, I am in a very good company....If I did not dream dreams of India's freedom, I would have acepted the chains of slavery as something eternal." শুধু তাই নয়, যদি তিনি চরম বাস্তববাদী না হতেন, তাহলে কখনই নির্দ্বিধায় বলতে পারতেন না—"I am talking as a realist and from experience." বিবেকানন্দের আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী (শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, গিরীশ ঘোষ, নবীন সেন প্রভৃতি) আর রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুভাষচন্দ্রকে সাহিত্যিক মনের দিক থেকে বাস্তববাদী হয়ে উঠতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেছিল।

সাহিত্যিক মন না থাকলে যেমন সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া যায় না, তেমনি আবার সাহিত্যিক সমাজে নিজেকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভবপর নয়। সাহিত্যের আরও একটা গুণ—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সাযুজ্য রচনা। সুভাষ জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল এই সাযুজ্য নিয়েই। সুভাষবাবুর নিজস্ব উক্তি দিয়েই বলি—"তিনিই (শিক্ষক বেণীমাধব দাস) আমাকে শেখান কি করে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হয়. প্রকৃতির প্রভাবকে জীবনে গ্রহণ করতে হয়—শুধু সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে নয়—নৈতিকবোধের দিক থেকেও বটে। তাঁর উপদেশ অনুযায়ী আমি দস্তুরমত প্রকৃতির পূজা

সুরু করে দিয়েছিলাম।" লক্ষণীয় হোল, সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে প্রকৃতি লাস্যময়ী নয়, জীবন-দাতৃ এবং নৈতিকবোধ-দাতৃ যা তাঁকে সাহিত্যিক মন নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক নির্দিষ্ট নৈতিকলক্ষ্যাভিসারী, প্রত্যয়িত আদর্শের পরিচ্ছন্ন প্রবক্তা এবং একাগ্র অনুগামী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। মান্দালয় জেল থেকে লেখা তাঁর চিঠিগুলিই এর নিষ্কলঙ্ক সাক্ষ্য। ১৯২৬ এ দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে লেখা একটি চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম—

"প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্যে মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিতে আমার সুখ।'

সিভিল সার্ভিসের লোভনীয় চাকুরী পরিত্যাগ করে দেশ সেবার ব্রত নিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন দেশবন্ধুর অনুগামী, দেখা যায়, তখন থেকেই তিনি তদানীন্তন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক। রাজনৈতিক বিচিত্র কর্মাবলীর ফাঁকে ফাঁকেও দেখা যায় সুভাষচন্দ্রকে বিভিন্ন সাহিত্যিক বৈঠকে, মজলিসে—রসালাপে, কৌতুকে কিংবা কোন সুগভীর আলোচনায়। রাজনৈতিক কূটচক্রে নিষ্পেষিত আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিক ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেবার আগে তিনি এক সাহিত্যিক বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন সেই বৈঠক সম্ভব না হওয়ায়, পরে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়িতে সেই বৈঠক বসে। আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ় এবং বলিষ্ঠ আবেদন রাখেন সুভাষচন্দ্র—সাহিত্যিক এবং কবিদের পক্ষেই সম্ভব জাতিকে বাঁচানো আর তার জন্য প্রয়োজন বাস্তবধর্মী সাহিত্যিক মানসের সংগঠন। সাহিত্যিকদের তৈরী হতে হবে দেশের খাতিরে, মানুষের প্রয়োজনে। সুভাষচন্দ্রের এই আহ্বানে সেদিন সর্বপ্রথমেই যারা সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন—জন-দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি নজরুল ইসলাম, কবিশেখর কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অতুল গুপ্ত, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, দীলিপ রায়, সরোজ রায়চৌধুরী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন সাহিত্য জগতে এঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিশ্রুতিতে সমুজ্জ্বল। তারপর সেই মোহনায় এসে যোগ দিয়েছিলেন আরো অনেকে। শরৎচন্দ্র এবং বিজয়রত্ন মজুমদারের সঙ্গে

সুভাষচন্দ্রের সম্প্রীতি সুবিদিত। কাজী সাহেবকে আমরা দেখি, যেন সুভাষচন্দ্রেরই সেই আপোষহীন ছন্দোবদ্ধ বাঙ্ময়রূপ। "...আপোষে মানুষকে অপজাত করে, তাহার আদর্শকে মলিন করিয়া দেয়।" দুরভিসন্ধি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম এবং তার নিগড় থেকে মানুষের মুক্তি সাধনের নীতিই হোল সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক মানসের মাপকাঠি। এই নীতিতে তিনি নিজে ছিলেন যেমন অবিচল তেমনি উদ্বেল করে তুলেছিলেন গোটা সাহিত্যিক সমাজকে। তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী' শ্রদ্ধারূপে নিবেদন করলেন সুভাষচন্দ্রকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের নামে। কবি দীনেশ দাস রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানালেন তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতা দিয়ে। এই একলব্য নীতির ফলেই সুভাষচন্দ্রের অন্তর-দ্বার উন্মুক্ত ছিল, বিশেষ করে তাদেরই জন্যে যারা সমাজে অবহেলিত, নিষ্পেষিত। ঝান্সীর রাণী বাহিনী গঠন সেই অতুলনীয় সাহিত্য মানসের এক অপরূপ সৃষ্টি। দার্শনিক ইমানুয়েলের কথায় তিনি যেন বারবার বলতে চেয়েছেন—"Always treat humanity both in their own person as well as in the person of others always as an end, never as a means." এই নৈতিক-বোধের জন্য তিনি শুধু শরৎচন্দ্র নয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও এক নিদারুণ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে আভিযাত্রিক 'নেতাজী'র মধ্যে কবিগুরুর সবিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বরণ করেছিলেন "দেশনায়কে"র পদে। কেবলমাত্র তারুণ্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নয় সুভাষচন্দ্রের অন্তরে ফল্গুধারার মত লুকিয়ে থাকা কবি বা সাহিত্যিক মনকেও বিশ্বস্রষ্টা কবি ভবিষ্যত নায়কত্বের পদে যে বরণ করে নেন নি, একথা কি নিঃসন্দেহে বলা যায়?

সুভাষচন্দ্র কোন কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এমন কোন সাহিত্য-কর্ম রেখে যান নি, যা তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে অমর করে রাখবে, একথা আমি আগেই বলেছি। 'আকালীন মেঘের' মত হৃদয় আকাশে যখন যে ভাবরাশি বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চেয়েছে প্রথমদিকে কটক থেকে মাকে লেখা, পরবর্তীকালে জেল থেকে বিভিন্ন জনকে লেখা এবং বিশেষ করে মান্দালয় থেকে লেখা পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর সাহিত্যিক বা কবিমনের একটি সুস্পষ্টরূপ আমাদের দেখতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। ডঃ গিরিজা মুখার্জির কথায়—

সুভাষচন্দ্রের লেখনী ছিল যে কোন সাহিত্যিকের ঈর্ষার বস্তু। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"প্রাতে অথবা অপরাহ্ণে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়, মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গজননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ বলে পাঠাই বৈষ্ণবের ভাষায়—'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিতে আমার সুখ'। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনে সূক্ষ্ম দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে ওঠে এবং সেই রক্তিমরাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ করে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার সূর্যালোকের দৃশ্য।"

[অনাথবন্ধু দত্তকে লেখা—১৯২৬]

অথবা—

"পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত করে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয় বন্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষত বিক্ষত হলেও তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি, একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।"

[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা—১৯২৫]

আবার—

"আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্যকলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার রুদ্র করাল মূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডবনৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ কত সাম্রাজ্য ধুলায় মিশিয়া গিয়াছে।"

[তরুণের স্বপ্ন, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০]

কিংবা—

"বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু

কষ্ট অনাহার দারিদ্র ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ['দেশের ডাক', ১১ই পৌষ, ১৩৩২]

কিংবা—

"তিনি কোন ওপার থেকে আনন্দে আজ এক সোনার সুতোয় কাটনা কেটে আসছেন—যা আজ রবির কিরণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিকমিক করে উঠছে—ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে সে এক আনন্দ স্রোতে ভেসে চলেছে। আবার সেই সোনার সুতোই যেন আজ আমাদের হাতের রাঙা রাখী হয়ে আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছি—ভোগীর সঙ্গে ত্যাগীকে, প্রবীণের সঙ্গে নবীনকে, কর্মীর সঙ্গে ভাবুককে। এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকের এই পুণ্যদিনের ভরসার কিরণ সম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতের সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে—আর তখন, যিনি ওপারের দ্যুলোকে আকাশের চরকায় আলোকের সুতা কাটছেন এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের স্বর্ণসূত্র গ্রথিত করে চলেছেন—আমরা জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে তখন তাঁকে আদরে বরণ করে নেব।"

এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে যার মূল্যায়ণ Subjective বা Objective truth-এর পরিমাপে নয়, একমাত্র প্রকৃত সাহিত্যের পরিমাপেই যার মূল্যায়ণ সম্ভব। স্টাইল এবং ডিক্‌শন্, ভাব-ভাষা, কল্পনা এবং বাস্তব মিলেমিশে যেন সবকিছুর মধ্যেই এক ঐন্দ্রজালিকতার সৃষ্টি করে গেছে। দক্ষিণ কলকাতা চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে সুভাষচন্দ্র লিখছেন—

"আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এইজন্য যে আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতা ও স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি— এখনো বিহার কল্পজগতে/জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী/এখনো কেবল নীরব ভাবনা/কর্মবিহীন বিজন সাধনা/দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা/ আপন মর্মবাণী।/......মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,/গড়িতেছি মন আপনার মনে/যোগ্য হতেছি কাজে।/......কবে প্রাণ খুলি বলিতে

পারিব/পেয়েছি আমার শেষ./তোমরা সকলে এস মোর পিছে/গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে; /আমার জীবনে লভিয়া জীবন/জাগরে সকল দেশ।/"

১৩৩৩ সালের (১৯২৬) সুভাষচন্দ্র বাঙালীর মানসিক এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা, তার ভূ-বিদীর্ণকারী ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার জন্যে সমালোচকের আসন থেকে তাঁর 'গোড়ার কথা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গেয়েছিলেন—'আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি'—তখন তিনি আমাদের সামনে ভ্রান্ত আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন। আমাদের এখন বলার সময় এসেছে 'আমি যাব না, য'ব না, যাব না ঘরে/বাহির করেছে পাগল মোরে।/"

১৯২৬-এর এই আকাঙ্খার সঙ্গে কবিগুরুর ছন্দোবদ্ধ আকাঙ্খা যেদিন সুভাষচন্দ্রের অন্তরে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল, যেদিন মহাকালের আহ্বানে সুখময় নীড়ের আশ্বাস পরিত্যাগ করে ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ডে আর এক নয়া-সুভাষচন্দ্র, সিপহ্‌শালার সুভাষচন্দ্র, মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটলো, সেইদিন থেকে তাইহোকুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত, সুভাষচন্দ্রের যে অনবদ্য সাহিত্য প্রতীতী পরিলক্ষিত, তা পৃথিবীর সাহিত্যে সুদূর্লভ। ফরাসী বিপ্লবের কালে দাঁতো, মারা আর রবেস্‌পীয়ারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এক একটি কথা যেমন স্বাধীনতার সাহিত্যে অমর হয়ে আছে, আজাদ হিন্দ অভিযানে মুহূর্তের প্রেরণায় সুভাষচন্দ্রের স্বতোৎসারিত এক একটি কথাও তেমনি এক একটি মন্ত্রের মত ভারতীয় তথা বাংলার স্বাধীনতা—সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে গেছে।

সুভাষচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—"আজাদ হিন্দ অভিযানের সেই স্বল্পায়ুর মধ্যে সঙ্গীতে, অভিনয়ে, বেতারে, প্রাচীর-পত্রে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, নেতাজী যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টা করেছিলেন সৈনিকদের কাছে তাঁর প্রতিদিনের নির্দেশের মধ্যে, তিনি নিজে যে অপরূপ সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয়, দিয়েছিলেন, তা থেকে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর চরিত্রের আর একটি অবজ্ঞাত দিকের। তাঁর মধ্যে সুপ্ত হয়েছিল এক বিরাট সাহিত্যিক, বাঙালীর সাহিত্য-প্রীতির সহজাত অধিকার নিয়েই তিনি জীবনের পথ চলতে সুরু করেন। কিন্তু নির্মম স্বামীনীর মতন রাজনীতি সে প্রীতিকে সার্থক করবার অবকাশ দেয়নি। তাই সেই অবরুদ্ধ শক্তি ছদ্মবেশে তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে

সাহিত্যের রঙে রাঙিয়ে তোলে, তাঁর চরিত্রের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে এক অপরূপ সৃজন প্রতিভা।" বস্তুতঃ, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক অভিযান বা রাজনৈতিক অধিকার অর্জন উপলক্ষে সমরাভিযান সব কিছুর মধ্যেই একটি নিষ্কলঙ্ক সাহিত্যিক-মনের অনুপস্থিতি নেই। বরং বলা যায়, এই অকপট সাহিত্যিক-মন, সাহিত্য-প্রীতিই তাঁকে সেই রাজনীতির পথে পরিচালিত করেছিল, যার মধ্যে লেশমাত্র স্বার্থবুদ্ধি বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতাব অবকাশ ছিল না। সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রতিদিনেব সেনাপতির আদেশকে সামরিক ভাষায় বলা হয় 'অর্ডার অফ্ দি ডে' এবং সামরিক কলেজের শিক্ষার্থীদের তা অবশ্য পাঠ্য। সোভিয়েত স্কুলের প্রতিটি ছাত্রই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিনের 'অর্ডার অফ দি ডে-র' সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের, আজাদ হিন্দ সৈনিকদেব উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সিপাহ্‌শালার সুভাষচন্দ্রের সামরিক সাহিত্যের ইতিহাসে অমর সাহিত্য 'অর্ডার অফ্ দি ডে' আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

রাজনৈতিক নেতা, সামরিক সিপাহ্‌শালার সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক-মন, সাহিত্য-প্রীতি, ও সাহিত্যিক চরিত্র, যা অনেকাংশে সু-সংগঠিত হয়েছিল তৎকালীন বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থাবলীর পাঠের মধ্য দিয়ে[২], তা কতখানি তুলনা-রহিত ছিল, লাল-কেল্লায় আই. এন. এ-র বিচারকালে তার আর এক প্রমাণ নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সামরিক আইনে বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। আবহমানকাল এই শাস্তিও যেমন চলে এসেছে, তেমনি বিশ্বাসঘাতকতাও চলে এসেছে পাশাপাশি, যা আজাদ হিন্দ ফৌজের দুর্জয় অভিযানকেও আঘাত হেনেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার অর্থই হলো নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, চরিত্রহীনতা। চরিত্র সাধনায় সিদ্ধপুরুষ সুভাষচন্দ্র আজাদীর সাধনায় সেই চরিত্রকে গড়ে তোলার জন্যে সৈন্যাধ্যক্ষের আসন থেকে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে যে শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন, তা যেমন ছিল সাহিত্যিক মানসের ইঙ্গিতবহ, তেমনি পৃথিবীর সামরিক জগতে এক অভিনব দৃষ্টান্ত।

"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

কাপুরুষতা আর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরের ঘৃণা আর বিতৃষ্ণাকে প্রকাশ করবার জন্য আমরা স্থির করেছি, প্রত্যেক আজাদ হিন্দ শিবিরে একটা দিন নির্দিষ্ট থাকবে, যেদিন এই শিবিরের সৈনিকেরা নিজেদের চেষ্টায় একটি উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

এই উৎসবের অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে প্রত্যেক শিবিরকে আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে এবং অনুষ্ঠানের কার্যসূচী এবং বিষয়বস্তু প্রত্যেক শিবিরের সৈনিকেরা নিজেদের রুচিমত গড়ে তুলবেন।

ভীরুতা আর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কবিতা, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি থাকবে।

এই মর্মে বিশেষভাবে ছোট ছোট নাটিকা রচনা করে শিবিরের সৈনিকেরা অভিনয় করবেন।

যে সব বিশ্বাসঘাতক আমাদের দল ছেড়ে চলে গিয়েছে (বিরাজ, মদন, সারবারী, দে, মহম্মদ বকৃশ ইত্যাদি) তাদের নামে কার্ডবোর্ড, ঘাস বা মাটি দিয়ে জঘন্য জন্তুর মূর্তি তৈরী করে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে তাদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা আর আক্রোশকে রূপ দিতে হবে।

অতীত ভারতের বীর পুরুষদের জীবন নিয়ে গাথা তৈরী ক'রে গাইতে হবে এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যাঁরা বীরত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে অভিনন্দিত করতে হবে।

প্রত্যেক অনুষ্ঠান সঙ্গীত ও সমবেত জয়ধ্বনিতে শেষ হবে।

যে শিবির সবচেয়ে ভালো অনুষ্ঠান করতে পারবে, তাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করা হবে।

স্বাক্ষর—সুভাষচন্দ্র বসু
সর্বাধিনায়ক—আজাদ হিন্দ ফৌজ

অসমাপ্ত-জীবন বেদের পরিপূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। কিঞ্চিদধিক দুদশকের সুভাষ-জীবন, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি; তার অধিক অংশই এখনও আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত নয়। একটা নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক মন কীভাবে যে সুভাষচন্দ্রকে একজন সার্থক সৃজন শিল্পীতে রূপান্তরিত ক'রে তুলেছিল, তা এখনও যথেষ্ট গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তবু যেটুকু পরিসর আমাদের গোচরীভূত, তাতে, আলিপুর জেলে বোমার মামলার আসামী অরবিন্দের কৌসুলী চিত্তরঞ্জন দাশ সওয়াল-কালে অরবিন্দ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, তারই অনুরণন দেখা যায়—"He will be looked upon as a poet of patriotism, the prophet of nationalism and lover of humanity. His words will be echoed and reechoed…"

(১) শ্রীগুরু লাইব্রেরী থেকে শ্রীগোপাল লাল সান্যালের উদ্যোগে সুভাষচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৩৫ সালে। এবং এই পুস্তকের 'নিবেদন' সুভাষচন্দ্র নিজেই লিখে দিয়েছিলেন। এতে তিনি লিখেছিলেন—"গত ১৩৩০ সাল হইতে এখন পর্যন্ত আমার যে সকল পত্র ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আজ তাহারই কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকাশিত হইল। সময়ের অল্পতা হেতু সকল পত্র ও প্রবন্ধ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হইলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন পত্র, রচনা ও বক্তৃতা একত্রে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ইতি—১০ই পৌষ, ১৩৩৫/ বিনীত—সুভাষচন্দ্র বসু।

(২) দ্রষ্টব্য—মান্দালয় জেল থেকে লেখা দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্মী হরিচরণ বাগ চিকে লেখা এবং নেহরুজীকে লেখা পত্র।

॥ নেতাজী, জওহরলাল ও কম্যুনিজম্ ॥

—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ইউরোপে তখন ফ্যাসিজম আর কমিউনিজমের জের চলেছে। প্রত্যেক রাজ্যেই এই দুই দল গড়ে উঠেছে, কম আর বেশী। সুভাষবাবুরও এদের সঙ্গে মিশে মিশে এই দুই দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য এই যে বাস্তবিকপক্ষে তিনি পুরোপুরি ভাবে কোন বিশেষ দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি। উপরন্তু তিনি এই দুই মতবাদের সারাংশ—ভাল অংশগুলোর সামঞ্জস্য করে একটা নিজস্ব ও উদার মতবাদ সৃষ্টি করেছিলেন। এই মতবাদের নাম সমবাদীয় মতবাদ। এই মতবাদকে কেন্দ্র করে তিনি যে দল গঠন করার পরিকল্পনা করেছিলেন সেই দলের নাম সমবাদীয় সঙ্ঘ। লণ্ডনে আহূত নিখিল ভারত সর্বদলীয় অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানেই প্রথম তাঁর এই নব পরিকল্পিত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লণ্ডনে প্রবেশ করবার অনুমতি না পাওয়ায় তাঁর অভিভাষণ ডাঃ ভাট পাঠ করে শোনান।

এই সময়ে ভারতবর্ষে পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি প্রচারের ওপর জোর দিচ্ছিলেন। বোধ হয় সুভাষবাবুর ইউরোপের জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উদ্দেশ্য কিছুটা প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল এর পিছনে। যাই হোক একদিকে যেমন সুভাষবাবু ফ্যাসিজমকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে এবং কমিউনিজমকে অনেক ক্ষেত্রে নিন্দা করে নতুন ধরনের মতবাদ গড়ে তুলছিলেন এবং জগৎ সমক্ষে প্রচার করবার চেষ্টা করছিলেন, অপরদিকে তেমনি জওহরলাল বিশেষ করে নাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দা করে কমিউনিজমকে বিশেষভাবে গ্রহণ করবার ও অনুসরণ করবার নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি প্রচার করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। অবশ্য সুভাষবাবু নাৎসী ফ্যাসি বা সাম্রাজ্য কোন 'বাদ'কেই গ্রহণ করেন নি কিন্তু তেমনি আবার কমিউনিজমকে ভীষণ আক্রমণ করেছেন।

জওহরলালজী লিখলেন, আমি জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে জগতের মূল্য সমস্যা হয় কমিউনিজম নয় ফ্যাসিজমকে গ্রহণ করা এবং আমি সর্বতো-

ভাবে কমিউনিজমের পক্ষপাতী। আমি ফ্যাসিজম সম্পূর্ণ অপছন্দ করি... কারণ ফ্যাসিজম পরোক্ষভাবে ধনিকতন্ত্রের স্বার্থসিদ্ধির একটা ঘোরালো উপায় মাত্র। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে এবং আমি কমিউনিষ্ট আদর্শকেই নেবো ইত্যাদি।

সুভাষবাবু জবাব দিলেন, এইখানে লেখক যে মন্তব্য করেছেন তা আগাগোড়াই ভ্রমাত্মক। আমরা যতক্ষণ না বিবর্তনের শেষ পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করছি—অবশ্য বিবর্তনবাদকে একেবারেই বরবাদ যদি না করা হয়—তাহলে এ দুটোর মধ্যেই আমাদের পছন্দ সীমাবদ্ধ করে রাখবার কোন যুক্তি নেই। এমন দিন আসছে সেদিন জগতের ইতিহাসে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের একটা মিশ্রণেব সূত্রপাত হবে। আর ভারতেই যদি তার প্রথম সূত্রপাত হয় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি ?· ·জগৎ গান্ধীবাদের মত একটা নূতন পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে যদি এত উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারে তাহলে সাবা জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর একটি পরীক্ষা ভারতে সুরু হবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

শুধু ব্যক্তিগত বাদানুবাদেব ওপর জোর না দিয়ে দুজনের বক্তব্য ও মতবাদের ওপর এখন জোর দেওয়া উচিত। অবশ্য জওহরলালজী যখন বলছেন যে কমিউনিজম মতবাদের ওপর তিনি যথেষ্ট আস্থাবান (সম্পূর্ণ নয়) তখন সে দিকটা আলোচনা কববার বিশেষ কিছু ·নেই। কিন্তু সুভাষবাবুর মতবাদ সম্পূর্ণ অভিনব। তাই তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা দরকার। যথা :—

(১) এই দল কিষাণ, মজুর প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষা করবে। অর্থাৎ জমিদার, বণিক এবং মহাজন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের জন্য নয়।

(২) এই দল ভারতের জনসাধারণের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে।

(৩) ভারতের শেষ লক্ষ্য, ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট হিসাবে এই দল সংগ্রাম চালাবে তবে ভারতকে নিজের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কয়েক বছরের মেয়াদে একজন ডিক্টেটরের অধীনে শক্তিশালী এক কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের ওপর বিশ্বাস রাখবে।

(৪) দেশের শিল্প ও কৃষি জীবনের পূর্ণ সংস্কার সাধনের নিমিত্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার ওপর জোর দেবে ;

(৫) বিগত যুগের পঞ্চায়েৎ পরিচালিত গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে

নতুন ধরণের সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা ও জাতিভেদ ও অন্যান্য সামাজিক বিধি নিষেধের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টায় রত থাকবে।

(৬) আধুনিক জগতের গবেষণামূলক ও কার্যকরী পদ্ধতি অনুযায়ী আধুনিক ধরণের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।

(৭) জমিদারী প্রথা রদ ও সমান হারের ভিত্তিতে জমিকর ব্যবস্থার চেষ্টা করবে।

(৮) গণতন্ত্র বলতে মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারত যখন নিজের প্রতিষ্ঠার ওপর স্বাধীনভাবে অধিষ্ঠিত হবে তখন একটা অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি না হয়ে ভারত যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে তার জন্য সামরিক শৃঙ্খলা প্রাপ্ত একটি মাত্র শক্তিশালী দলের উপর শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ায় বিশ্বাস রাখবে।

(৯) শুধু ভারতের মধ্যে নিবদ্ধ রেখে নয়, এই দল ভারতের মুক্তিপ্রশ্নকে আরও প্রাধান্য দেবার জন্যে আন্তর্জাতিক প্রচার কার্যেরও আশ্রয় নেবে এবং বর্তমানের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে।

(১০) এরা সমস্ত অগ্রগামী দলগুলিকে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করবে যাতে যখনই কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হবে তখন একই সঙ্গে সবক্ষেত্রে সকল দিক থেকে কাজ সুরু হয়ে যেতে পারে।

একদিকে যেমন ইউরোপ থেকে সুভাষবাবুর বক্তৃতা, ভাষণ, লেখা, প্রচার পত্র প্রভৃতি আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছে দেশের খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়—মানুষ সমস্ত প্রাণের আগ্রহ নিয়ে শুনছে জগতে নতুন এক আদর্শ নতুন এক মতবাদের পূর্বসূচনা অন্যদিকে তেমনি দেশের মধ্যে থেকে জওহরলালজী সোশ্যালিজম ও কমিউনিজমকে সমর্থন করে আর ফ্যাসিজমকে নিন্দা করে বক্তৃতা দিচ্ছেন, লোককে আকর্ষণ করছেন এবং কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টিকে শক্তিমান করে তুলছেন। সুভাষবাবুর অবর্তমানে জওহরলালই ভারতের তরুণ সম্প্রদায়ের একমাত্র কর্ণধার। তাহলে গান্ধীজীর প্রভাব কি একেবারেই খর্ব হয়ে গেল? না, কথাটা অত সহজেই উড়িয়ে দেবার মত নয়।

গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ করলেও সবার পশ্চাতে ধ্রুবতারকার মত উজ্জ্বল ও একদর্শী হয়ে পথ নির্দেশ করছেন। তাঁর তিনটি প্রধান সহায় সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সর্দার প্যাটেল কংগ্রেসের সভাপতি এবং সর্বেসর্বা—প্রকৃতপক্ষে ডেমক্রাসীর পরিবর্তে কংগ্রেস প্যাটেলের ডিক্টেটরশিপে বা একাধিপত্যের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

…কংগ্রেসের অবস্থা তখন অনেকটা জার্মানীর নাৎসী পার্টির মতই। এখানেও ডিক্টেটরশীপের পূর্বাভাষ দেখা দিচ্ছে। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও কার্যতঃ কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ বিপরীত দিকে চলতে বসেছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সুভাষবাবুকে ফ্যাসিস্টপন্থী বলে তাঁর মতবাদকে যে ডিক্টেটরশিপের জয়গান বলে কংগ্রেস মিথ্যা আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে কংগ্রেস অপরদিকে পরোক্ষভাবে সেই ডিক্টেটরশিপের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

গান্ধী অনুপ্রাণিত কংগ্রেসের এই দলীয় প্রভাব খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলেও কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তা একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়। সুভাষবাবু যদিও সকল বিষয়ে এদের সঙ্গে একমত ছিলেন না তবুও তিনি লিখেছেন, বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দল যে পন্থা অবলম্বন করছে তাতে তারা বিশেষ অগ্রসর হতে পারবে না। দলের সংগঠন বিসদৃশ উপাদানের সংমিশ্রণ মাত্র এবং কয়েকটা মত আবার একালের উপযুক্ত নয়। কিন্তু এই দল গঠনের মূলে আছে যে প্রেরণা তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। এই বামপন্থী দল থেকেই পরিশেষে এমন একটি নতুন পূর্ণবিকশিত দল বেরিয়ে আসবে যার স্পষ্ট আদর্শ ও নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও পদ্ধতি জানা আছে।…তবে তাদের সাহায্য করবার মত অনেক লোকের সাহচর্য থেকে এখন তারা বঞ্চিত। যখন তাদের সাহচর্য তারা পাবে তখন তারা আরও প্রবলভাবে অগ্রসর হতে পারবে।

পরবর্তিকালে সুভাষবাবু সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার পর (১৯৩৭) থেকে এই সমাজ-তান্ত্রিক দল আদর্শের দিক থেকে অনেক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী হলেও সুভাষবাবুর সঙ্গে সাহচর্য বজায় রেখে চলছিল। বস্তুত পক্ষে এই সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারা—যথা জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি—কখনও সুভাষবাবু আবার কখনও জওহরলালের পথ অনুসরণ করে আসছেন।

দেখা যাচ্ছে সুভাষবাবু কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে যতদূর আক্রমণ করেছেন তার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দলকে একটু যেন সমর্থনই করে আসছিলেন। কিন্তু কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তিনি রীতিমত বক্তব্য রেখে এসেছেন। তিনি যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কেন কমিউনিজম আমাদের দেশে চলতে পারে না। যথা—(১) কমিউনিজমের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সমর্থন নেই। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ জাতীয়তাবাদ (২) বর্তমান সময়ে রাশিয়ার সর্বদেশীয় বিপ্লবের কোন চেষ্টা নেই বরং সে ধনতন্ত্রবাদ

রাজ্যদের সঙ্গে চুক্তি করছে, আদান-প্রদান করছে। (৩) ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে বিরোধিতা অসম্ভব। রাশিয়ায় অধার্মিকতা ও নাস্তিকতা যে রকম বিস্তার লাভ করছে ভারতবর্ষে সে রকমটা আশা করা যুক্তি সঙ্গত নয়। (৪) যদিও এক শ্রেণীর লোক ভারতে কমিউনিষ্ট প্রচারিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস করবে তবু আর সকলে এমন কি এই শ্রেণীর লোকরাও বস্তুতন্ত্রবাদকে সমর্থন করতে পারবে না। (৫) যদিও পরিকল্পনাদি অর্থ নৈতিক ব্যাপারে কমিউনিজম যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে তবু মুদ্রা-সংক্রান্ত বিষয়ে তা মোটেই কোন নতুন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে নি যাতে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে।

সুভাষবাবুর কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এই সব মতামতের ফলে ইং ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে কমিনটার্ণ সমস্ত জগতের কমিউনিষ্ট দলদের এই জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আদেশ দেয়। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যেও কমিউনিষ্টদের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। †

† লেখাটি লেখকের 'নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ' হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত সংকলিত।

॥ একটি ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি ॥

—রাম চট্টখুণ্ডী

স্বাধীনতার নেপথ্য ইতিহাসের চড়াই উৎরাই, যা আজ প্রায় সকলেরই জানা, তার পুণরুক্তি না করেও একথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা যায়, শিলায় খোদিত শিলালিপির মৃত্যু নেই।

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্বিখণ্ডিত ভারতের নায়ক প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল। হেলায় অস্বীকার করতে পারতেন সবকিছুই। এমন কি নেতাজীর অস্তিত্বকেও। কিন্তু পারেন নি। ইতিহাসের নির্মম সত্যপথেই, শিলাবক্ষে খোদিত চিরসত্যের কাছে ঠিকই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল।

১৯৫৪ সাল। প্রকাশ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁকে ঘোষণা করতে হয়েছিল: "নেতাজী যে কেবল সাহসী ছিলেন তাই নয়, স্বাধীনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। যা কিছু তিনি করেছিলেন, তা করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে। স্বকীয় পন্থায় সারাজীবন তিনি যেভাবে সংগ্রাম করেছিলেন—সেই আন্তরিক নিষ্ঠায় কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।...ভারতের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক নেতাজী সুভাষচন্দ্র—তিনি শুধু যে বিপুলভাবে ভারতের সেবা করেছেন তাই নয়, পরন্তু আমাদের কাছে ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। নেতাজী শুধু বাংলার নন, তিনি ভারতের অতি আদরের মানুষ। আমাদের জাতীয় ধ্বনি 'জয়হিন্দ'ই শুধু নেতাজীর অবদান নয়, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতও প্রকৃতপক্ষে নেতাজীর অবদান ; কেননা, আমাদের গ্রহণের বহু পূর্বেই নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ তা গ্রহন করেছিলেন।"

সুভাষ-জওহর

প

ত্রা

লা

প

অভিন্নহৃদয় সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল। গান্ধীজী প্রভাবিত কংগ্রেসী রাজনীতির মঞ্চে এঁদের বিস্ময়কর প্রথম আবির্ভাব ছিল অনাগত তুফানের দ্যোতক। তখন তাঁরা ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক—সখা ও সচিবরূপে। দেশ-বিদেশের নানাস্থান থেকে লেখা সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত পত্র তার সাক্ষ্য বহন করে।

তবু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত একদিন এই দুই অভিন্ন-ব্যক্তিত্বকে ভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নতুন ইতিহাস রচয়িতায় পরিণত করেছিল, মর্মন্তুদ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল তাঁদের মিলনের সঙ্গম-স্থলে, তারও সাক্ষ্য বহন করে আছে কতিপত্র পত্র।

আমরা এখানে সুভাষ-নেহরুর দুই পর্যায়ের কিছু পত্র 'A Bunch of Old Letters' থেকে সংগ্রহ করে দিলাম। জওহরলালের উদ্দেশ্যে ২৮ মার্চ ১৯৩৯ সালে লেখা সুভাষচন্দ্রের সাতাশ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী পত্রটির ভাষান্তর শিশিরকুমার বসু সম্পাদিত 'কোন পথে'—প্রথম খণ্ড থেকে কৃতজ্ঞতার সহিত সংগৃহীত হোল।

কুরহস্ হকল্যাণ্ড
বাদগাষ্টীন, (অষ্ট্রিয়া)
৪ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথের শেষে গতকাল সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। জায়গাটা সুন্দর এবং শান্ত। কর্মের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তুমি যদি ইউরোপে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারতে, আমি সুখী হতাম।

তোমাকে যেসব বলেছি, সেই মত একটা বিবৃতি দেব কিনা, তোমার কাছ থেকে আসার পর থেকে সেই কথাই ভাবছি। দেওয়াই উচিত বলে আমার মনে হয়, তার কারণ আবার আমার কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং এমন কিছু লোক হয়ত আছে, যারা আমার পরামর্শ কামনা করে। আমার বিবৃতি যথাসম্ভব ছোট হবে এবং তাতে স্পষ্টভাবে এই কথাই আমি বলব যে তোমাকে আমার পূর্ণ সমর্থন দানের সিদ্ধান্তই আমি করেছি।

বর্তমানে যাঁরা অগ্রগণ্য নেতা, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার কাছেই আমরা এই আশা করতে পারি যে কংগ্রেসকে প্রগতির পথে পরিচালনা করা হবে। তাছাড়া তোমার প্রতিষ্ঠাও অসামান্য, এবং আমার মনে হয় যে মহাত্মা গান্ধীও তোমার কথাকে যতখানি মেনে নেবেন, অন্য আর কারও কথাকেই ততখানি মেনে নেবেন না। আমি খুবই আশা করছি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনচিত্তে তোমার প্রতিষ্ঠাকে তুমি পুরোপুরি কাজে লাগাবে। যেটুকু শক্তি সত্যিই তোমার রয়েছে, তার চাইতে কম শক্তিশালী বলে নিজেকে তুমি মনে কর না। তুমি যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পার, এমন মনোভাব গান্ধীজী কখনও অবলম্বন করবেন না।

আমাদের সর্বশেষ আলোচনায় তোমাকে জানিয়েছি, তোমার আশু কর্তব্য হবে দুটি—(১) দপ্তর গ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধাপ্রদান করতে হবে, ও (২) ওয়ার্কিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে তুলতে হবে। তা যদি তুমি করতে পার ত নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাবে, দুর্গতি থেকে তাকে উদ্ধার করবে। বড় বড় সমস্যাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবি রাখা যেতে পারে; নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করা আমাদের আশু কর্তব্য।

শুনে আমি অত্যন্তই সুখী হয়েছি যে কংগ্রেসে তুমি একটি বৈদেশিক বিভাগ খুলতে চাও। আমার অভিমতের সঙ্গে এর সম্পূর্ণই মিল রয়েছে।

যাত্রার জন্য তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছ; যাত্রার আগে নিশ্চয়ই টুকিটাকি নানান কাজও তোমার রয়েছে। তাই এই চিঠিকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। কামনা করি; নির্বিঘ্নে যেন তুমি স্বদেশে ফিরতে পার, এবং যে ক্লান্তিকর কর্মভার তোমাকে তুলে নিতে হবে, তাতে ভাগ্য যেন তোমার সহায় হয়। আমাকে যদি এখনউয়ে যেতে দেওয়া হয়; তাহলে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত থাকব।

স্নেহানুসক্ত

সুভাষ

□

কুরহস্ হকল্যাণ্ড

বাদগাষ্টীন, (অষ্ট্রিয়া)

১৩ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনসালের কাছ থেকে এইমাত্র আমি এক জরুরী চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানি এই:

"আপনার নিকট এই মর্মে এক সাবধান বাণী প্রেরণের জন্য পররাষ্ট্র সচিবের নিকট হইতে আজ আমি নির্দেশ পাইয়াছি যে আপনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক বলিয়া সংবাদপত্রে যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা দেখিয়াছেন এবং ভারত সরকার স্পষ্টভাবে আপনাকে জানাইয়া দিতে চাহেন যে আপনি যদি তাহা করেন, তাহা হইলে মুক্ত থাকিবার আশা আপনি করিতে পারেন না।

(স্বাঃ) জে. ডব্লু. টেলর

হিজ ম্যাজেষ্টিজ কনসাল।"

যাত্রার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করতে চলেছি, এমন সময় এই চিঠি পেলাম। বস্তুত, সমুদ্রপথে গেলে আমার বেশী সুবিধে না বিমানপথে, এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলাম বলেই তখনও আমি টিকিট বুক করিনি। বিমান পথে গেলে এখানে আমার পুরো কোর্সের চিকিৎসা সম্পূর্ণ হতে পারত। চিকিৎসায় মোট ২৫ দিন লাগে।

এ-ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারি, এমন কেউ এখানে নেই। কন্টিনেন্টেও এমন কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। তোমার নিজের প্রতিক্রিয়া থেকেই তুমি অনুমান করে নিতে পারবে যে এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা ক'রে দেশে যেতেই এই মুহূর্তে আমি ইচ্ছুক। শুধু একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখা দরকার: জনস্বার্থ কিসে অক্ষুণ্ণ থাকবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আমি আদৌ-আমল দিই না; এবং জনস্বার্থের খাতিরে যে-কোনও পথ অবলম্বনে আমি প্রস্তুত। জনসেবার ক্ষেত্র থেকে এত দীর্ঘকাল ধ'রে আমি দূরে রয়েছি যে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জনসাধারণের অধিকতর মঙ্গল হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আমার পক্ষে শক্ত। এই ধরণের সঙ্কটের মুহূর্তে আর একজনকে উপদেশ দেওয়া যে তোমার পক্ষেও শক্ত তা আমি জানি। তবে ব্যক্তির কথা তুমি বিস্মৃত হতে পার—জনস্বার্থ সংক্রান্ত প্রশ্ন দেখা দিলে তা যে তুমি পার তা আমি জানি—এবং শুধু জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে বিচার করে দেশকর্মীকে তুমি উপদেশ দিতে পার। আমাদের দেশের জনসেবার ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা তোমার রয়েছে, তাতে এই রকমের অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর অবস্থায় কাউকে উপদেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিলে তোমার দায়িত্বকে তুমি এড়িয়ে যেতে পার না।

এরকম একটা ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করবার সপক্ষে আমার একমাত্র যুক্তি এই যে এমন আর কারও কথা আমি ভাবতে পারছি না, যার উপরে আমি অধিকতর আস্থা রাখতে পারি। সময় এতই অল্প যে একগাদা লোকের কাছেও উপদেশ চাইতে পারছি না। আমার নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে উপদেশ চেয়ে লাভ নেই, তার কারণ ব্যাপারটাকে জনস্বার্থের দিক থেকে বিচার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। সুতরাং একটি মাত্র পথ আমার কাছে খোলা রয়েছে, সে হল তোমার উপদেশের ওপর নির্ভর করা। ২০ তারিখ নাগাদ এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার কথা। তার অব্যবহিত পরেই তুমি যদি আমাকে একটা তার পাঠাও, তা হলে সময়মতই তা আমার হাতে পৌঁছবে। কে. এল. এম. বিমান ২ এপ্রিল তারিখে রোম থেকে রওনা হবে। সে-বিমান আমি ধরতে পারি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রওনা হব বলে ২১ তারিখ এমন কি ২২ তারিখেও যদি আমি সিদ্ধান্ত করি, তা হ'লে ২ এপ্রিল তারিখে যে-বিমান রোম ছাড়ছে, তাতে একটা আসন পাব বলেই আমার বিশ্বাস। এমনও সম্ভব যে ২৯ মার্চ তারিখে যে বিমান রওনা হচ্ছে তাতেও একটা আসন পেয়ে যেতে পারি।

লখনউ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য সময়মত দেশে যাব বলে যখন সঙ্কল্প করেছিলাম, তখন অবশ্য এমন সম্ভাবনা ছিল যে দেশের জমিতে অবতরণ করা মাত্র আমাকে কারারুদ্ধ করা হবে। কিন্তু অন্তত কিছুকালের জন্য আমাকে মুক্ত থাকতে দেওয়া হবে এমন সম্ভাবনাও তখন ছিল। শেষোক্ত সম্ভাবনাটি এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হল, এবং এখন দেশে যাওয়ার একমাত্র অর্থ হল কারাগারে যাওয়া। অবশ্য জনস্বার্থের দিক থেকে কারাগারে যাওয়ারও একটা উপযোগিতা আছে এবং এই ধরণের একটা সরকারী আদেশ অমান্য করে জেনে শুনে কারাবরণ করবার সপক্ষেও অনেক কিছুই বলা যেতে পারে।

যথাসম্ভব শীগগির একটা উত্তর দিও। এই ঠিকানায় তার পাঠাতে পার:

বোস, কুরহস্ হকল্যাণ্ড, বাদ্‌গাস্টীন, অষ্ট্রিয়া,

আশা করি তোমার ভ্রমণ পথ আরামদায়ক হয়েছে, এবং তোমার স্বাস্থ্যও ভালো আছে।

স্নেহাসক্ত

সুভাষ

সবে গতকাল সংবাদপত্রে একটা বিবৃতিতে আমি এই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে এখানকার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হবার পর আমি বিমানযোগে রওনা হতে পারি।

সু. চ. ব

□

ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়

এলাহাবাদ

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

শান্তিনিকেতনে আমাদের ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশী আলাপ হয়েছিল. আমার ভয় হচ্ছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে আমরা পারি নি। বাস্তবিকই পারি নি, কেননা বহু সংশয় আছে আর এ-ও জানি না ব্যাপারগুলি কি রূপ নেবে। আমাদের এইগুলির সম্প্রসারণের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আবার একই সঙ্গে এই সম্প্রসারণ আমাদের উপর, বিশেষ করে তোমার উপর নির্ভর করছে।

আমি যা তোমাকে বলেছিলাম, তোমার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু মঙ্গল এবং কিছু ক্ষতি করেছে। আমি মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর পরে যে অনিষ্ট আসবে, সেই আমার ভয়। আমি এখনো মনে করি, খতিয়ে দেখলে এই বিশেষ বিরোধ এইভাবে না ঘটলেই ভালো হত। কিন্তু সে তো এখন অতীতের কথা, আমাদের ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হবে। এই ভবিষ্যতকে আমাদের ব্যাপক যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে। ব্যক্তিত্বের নিরিখে দেখলে চলবে না। ব্যাপারগুলো আমরা যেমনটি আশা করেছিলাম, তেমনি রূপ নেয়নি বলে আমাদের কারো পক্ষেই বিরক্ত হওয়াটা সঙ্গত হবে না। যা কিছুই ঘটুক, আমাদের আদর্শের জন্ম নিজেদের শ্রেষ্ঠ যা কিছু তা দান করতে হবে। এটা মেনে নিলেও ঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয় এবং আমার মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

প্রথমেই আমাদের পরস্পরের মতামত যতটা সম্ভব পুরোপুরিই বুঝতে হবে। এটা যদি করা যায় তাহলে প্রস্তাব গঠন করা তো অতি সহজ। কিন্তু অপরজনের উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে যদি আমাদের মন বিরোধ আর সন্দেহে পূর্ণ থাকে, তাহলে ভারতবর্ষকে রূপ দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। এই গত কয়েক বছরে আমি গান্ধীজী, বল্লভভাই এবং তাঁর মতাবলম্বীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছি। আমাদের মধ্যে বারংবার এবং দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে, আমরা পরস্পরকে যদিও দৃঢ় প্রত্যয় করাতে পারি নি, কিন্তু বেশ খানিকটা প্রভাবিত করেছি, আর আমার মনে হয়, পরস্পরকে আমরা অনেকখানি চিনতে পেরেছি। অনেক দিন আগে, ১৯২৩ সালে, জেল থেকে খালাস পেয়েই আমি পূণায় গান্ধীজীকে দেখতে যাই তিনি তখন প্রায়োপবেশনের ধকল থেকে মুক্ত হয়ে উঠছেন। আমাদের সংগ্রামের নানা দিক নিয়ে তখন দীর্ঘ আলোচনা চলে, এবং পরে চিঠি-পত্রেরও আদান প্রদান হয়, যা পরে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রগুলি এবং আলাপ-আলোচনায় আমাদের স্বভাবগত বা মূলগত পার্থক্য প্রকাশিত হয়, আবার আমাদের মধ্যে বহু ঐক্যও দেখা দেয়। তারপর থেকে গোপনে এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা চলেছে। কয়েকবারই আমার রাষ্ট্রপতি পদ, এমন কি ওয়ার্কিং কমিটি ত্যাগ করবার উপক্রম হয়। কিন্তু এই ভেবে আমি বিরত হই যে, যখন ঐক্যই মূলতঃ দরকার, তখন এটা সঙ্কটকেই ত্বরান্বিত করবে। হয়তো আমার ভুল হয়েছিল।

এখন এই সঙ্কট এমনভাবে এসে দেখা দিয়েছে যাকে দুর্ভাগ্যই বলা যায়।

আমার নিজের কার্যপদ্ধতি স্থির করবার আগে তুমি কংগ্রেসকে কি তৈরী করতে, আর কি করতে চাও—সে সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা থাকা উচিত। আমি তো এ ব্যাপারে একেবারে অকূল পাথারে পড়েছি। বামপন্থী আর দক্ষিণ পন্থী, ফেডারেশন প্রভৃতি নিয়ে বহু কথা হয়েছে, যতদূর মনে পড়ে যদিও তোমার রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ওয়ার্কিং কমিটিতে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কোন আলোচনা আমাদের হয় নি। জানি না, কাকে তুমি বামপন্থী আর কাকে দক্ষিণপন্থী বল। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিযোগিতা করার সময়ে, যেভাবে তোমার বিবৃতিতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছ, তাতে এই মনে হয়েছিল যে, গান্ধীজী এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে যাঁরা তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত বলে বিবেচিত হন, তাঁরাই দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা যাই হোন না কেন, তাঁরাই বামপন্থী। এটা আমার কাছে পুরোপুরিই ভুল বর্ণনা বলে মনে হয়। আমার মনে হয় যে, তথাকথিত বামপন্থীদের অনেকেই তথাকথিত দক্ষিণ পন্থীদের চেয়ে বেশী দক্ষিণ মতাবলম্বী। তীব্র ভাষা, সমালোচনার ক্ষমতা এবং পুরাতন কংগ্রেসী নেতৃত্বকে আক্রমণের রাজনীতিতে বামপন্থার পরীক্ষা হয় না। আমার মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের একটি প্রধান বিপদ এই হবে যে, যোগ্য এবং দায়িত্বশীল পদে এমন মানুষেরা গিয়ে বসবে, যাদের কোন দায়িত্ব জ্ঞান নেই বা যারা পরিস্থিতির সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারে না, আর উন্নত ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির জন্যও তারা খ্যাত নয়। তারা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, তাতে মহা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর তখন প্রকৃত বামপন্থীরা ভেসে যাবেন। চীনের উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। যদি পারি তো আমি চাই না ভারত ঐ দুর্ভাগ্যের পথে চলুক।

আমার মনে হয়, বাম আর দক্ষিণ এই দুটি কথার ব্যবহারই সাধারণতঃ একেবারে ভুল ও বিভ্রান্তকারী। এই শব্দগুলির বদলে যদি আমরা নীতির কথা বলতাম, বোধ হয় তাই ঢের ভালো হোত। তুমি কোন্ নীতির পক্ষে? ফেডারেশন বিরোধী—বহুৎ আচ্ছা। আমার মনে হয় ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই পক্ষে, এবং এই ব্যাপারে তাঁদের দুর্বলতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা তো শোভন নয়। ওয়ার্কিং কমিটিতেএই বিষয় নিয়ে পূর্ণ আলোচনা করা কি তোমার পক্ষে এর চেয়ে ভালো হোত না? এমন কি এ বিষয়ে একটা প্রস্তাবও আনতে পারতে, তারপর লক্ষ্য করতে তার প্রতিক্রিয়া। এটা ঠিকই যে, সহকর্মীদের সঙ্গে প্রথমে পুরোপুরি বিষয়টার আলোচনা না করে

তাদের সবশুদ্ধ পিছনে হঠার জন্য দায়ী করা কচিৎ শোভন বলেই মনে হয়। তুমি যে ফেডারেশনের মন্ত্রীসভাগুলির এরই মধ্যে বিভেদের এক অদ্ভুত অভিযোগ করেছিলে, সে সম্পর্কে আমি যা বলেছিলাম, তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অধিকাংশ লোকই এটা অবশ্যম্ভাবী ভেবে নিয়েছে যে, তোমার ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্মীরাই দোষী।

তোমার মনে আছে, তোমার এবং ওয়ার্কিং কমিটির কাছে য়ুরোপ থেকে আমি দীর্ঘ সব বিবরণী পাঠিয়েছিলাম। আমাদের ফেডারেশন সম্পর্কে মত কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম, আর নির্দেশ চেয়েছিলাম। তুমি কোন নির্দেশ পাঠাও নি। এমন কি প্রাপ্তি স্বীকারও করনি। গান্ধীজী আমার প্রস্তাবের প্রণালী সম্বন্ধে একমত। আমি শুনেছি ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যও তাই। আমি এখনও জানি না তোমার প্রতিক্রিয়া কি। কিন্তু আমাকে খবর দেওয়া ছাড়াও, তোমার পক্ষে এই বিষয় নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটিতে তন্নতন্ন আলোচনা এবং এক না একভাবে সিদ্ধান্ত করার কি ঐটেই সুযোগ ছিল না? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি এবং অন্যান্য ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটিতে তুমি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়ভাব নিয়ে বসে আছ, যদিও কখনো কখনো বাইরে তোমার মতমত তুমি প্রকাশ করেছ। তার ফলে, তুমি পরিচালনাকারী রাষ্ট্রপতির চেয়ে সভাপাল হিসাবেই কাজ করেছ বেশী।

গত বছরের মধ্যে এ. আই. সি. সি. কার্যালয়ের যথেষ্টই অবনতি হয়েছে। তুমি তো ওটি দেখওনি, তোমার কাছে প্রেরিত চিঠি এবং তারগুলিরও কচিং কখনো জবাব পাওয়া যায়। তার ফলে বহু অফিস-সংক্রান্ত কাজ অনির্দিষ্ট-কালের জন্য পড়ে আছে। ঠিক এই মুহূর্তে, যখন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, তখন প্রধান দপ্তর আনাড়ীর মতই কাজ করছে।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা আছে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আছে, আর আছে কিষাণ ও মজুর সমস্যা। এইগুলি সম্পর্কে বহু মত এবং বহু বিরোধ আছে, তোমার কি এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মত আছে যা তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে মেলে না? বম্বে ট্রেড ডিসপিউট বিলের কথাই ধর। এর কতকগুলি বিধান সম্পর্কে আমি একমত নই। আমি যদি এখানে থাকতাম, তাহলে সেগুলি পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। তুমিও কী বিরোধী মতাবলম্বী নও, যদি তাই হয়, সেগুলি বদলাবার জন্যে

চেষ্টা করেছিলে কী? বাংলা নিয়ে অনেকগুলি প্রদেশে, যে সাধারণ কৃষি পরিস্থিতি দেখা যায়, জানি না সে সম্পর্কে তোমার নির্দিষ্ট মত কী?

প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলি দ্রুতবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনের প্রসার খুব সম্ভব মহা-সংকটের পথে নিয়ে যাবে, আর তাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি সহ আমরা সকলেই জড়িয়ে পড়ব। আমাদের কোন্ পথ গ্রহণ করতে হবে ভাবছ কি? বাংলায় তোমার যুক্তি মন্ত্রীসভা গঠনের ইচ্ছা, গঠনতান্ত্রিকতার পথে যাবার বিরুদ্ধে তোমার প্রতিবাদের সঙ্গে একরকম খাপই খায় না। সাধারণভাবে, এটা দক্ষিণপন্থী নীতি বলেই মনে হবে, পরিস্থিতি যখন দ্রুত ঘোরালো হয়ে উঠছে, তখন তো আরো হবে।

তারপরে আছে পররাষ্ট্র নীতি। তুমি তো জানো, এদিকে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি, বিশেষতঃ আজকের এই অবস্থায়। আমি যতদূর জানি, তুমিও তাই দিয়ে থাক। কিন্তু আমি সঠিক জানি না, কোন্ নীতি তুমি গ্রহণ করবে বলে ঠিক করেছ। আমি গান্ধীজীর মত সাধারণভাবে জানি, তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতও নই, যদিও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের দুই কি তিন বছর আমরা একসঙ্গেই চলেছি এবং চলতেও পেরেছি। তিনিও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও আমারটা প্রায় মেনেও নিয়েছেন।

এইগুলি এবং আরো অনেক প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে, এবং আমি জানি, আরো অনেকে এই সব প্রশ্ন দ্বারা বিচলিত; তোমাকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও এর মধ্যে আছেন। এটা খুবই সম্ভব যে, এদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসে উত্থাপিত প্রশ্নের উপরে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ভোটও দিতে পারেন, আর তাতে নতুন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে একগাদা সমস্যার উদ্ভব হবে। সর্বশেষ সমস্যা হবে এই কমিটি গঠন যেটি এ. আই. সি. সি-র এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে। এই অবস্থায় সেটা খুবই শক্ত। এমন কমিটি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, যার স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেইসব লোকের নীরব সম্মতির উপর যাদের দায়িত্বশীল মনে করা যায় না এবং যাদের প্রাধান্যের প্রধান যোগ্যতা হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনা করা। এমন কমিটি কারোরই বিশ্বাসভাজন হবে না—সে বাম বা দক্ষিণপন্থী যাই-ই হোক না কেন। হয় সে কমিটিকে বাতিল করা হবে, নয়তো সে তুচ্ছতায় মিলিয়ে যাবে।

এটা খুব সম্ভব যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংগ্রামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বল্লভভাই এমনকি গান্ধীজীও এতে আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়বেন। ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে এইটিই কেন্দ্রস্থান অধিকার করবে, এবং অন্যদের দ্বারা গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি নিষ্ফলভাবেই কাজ করে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। গত দশকে বা তারও আগে থেকে ওয়ার্কিং কমিটি ভারতে এবং এমনকি বাইরেও অতি উচ্চ আসন অধিকার করে আছে। এর সিদ্ধান্তগুলির কিছু অর্থ ছিল, এক কথায় শক্তি ছিল। সে বড় বেশি চিৎকার করেনি, কিন্তু যা বলত, তার আড়ালে ছিল শক্তি আর কাজের পরিচয়। আমার তো ভয় হয়, আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের অনেকেই আর কিছুর চেয়ে কড়া ভাষা ব্যবহারে বেশি বিশ্বাসী। নরীম্যানের মত জনসেবক আমার কোন প্রশংসাই পাবে না। আর এই ধরণের বহু কর্মী চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে।

আমরা একটা বিশ্রী ফাঁদে পড়েছি এবং এই মুহূর্তে তার থেকে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট উপায় আমি দেখি না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে রাজী কিন্তু ব্যাখ্যা এবং নেতৃত্ব তোমার কাছ থেকেই আসতে হবে, তখনি অন্যদের পক্ষে তারা নিজেরা যোগ্য কি অযোগ্য তা স্থির করা সম্ভব হবে। অবস্থাটির সবগুলি লক্ষণ পর্যালোচনা করে; উপরে উল্লিখিত নানা সমস্যা খতিয়ে দেখে তাদের উপর একটা বিস্তারিত মন্তব্য লেখার জন্য তাই তোমার কাছে প্রস্তাব করব। এটি প্রকাশের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাদের সহযোগিতার জন্য তুমি আহ্বান করছ তাদের এটি দেখানোই উচিত হবে। এমনি ধারাই মন্তব্য হবে আলোচনার ভিত্তি এবং এই আলোচনাই বর্তমানের কানাগলি থেকে পথ পেতে সাহায্য করবে। কথাই যথেষ্ট নয়, কথাতো অস্পষ্ট আর প্রায়ই বিপথে নিয়ে যায়, এরই মধ্যে অস্পষ্টতা তো টের পেয়েছি। ব্রিটিশ সরকারকে তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার প্রস্তাবটি আরো বিশদ করে যাতে জানাও তাই-ই আমার ইচ্ছে। ঠিক কি ভাবে এ ব্যাপারে এগোতে চাও, তারপরেই বা কি করবে? আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি তোমার এই ভাবধারা আদৌ পচ্ছন্দ করি না কিন্তু যদি তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর তাহলে হয়ত আগের চেয়ে ভালো করে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে।

সংবাদপত্রে তোমার বিবৃতি আমি দেখেছি। সেটা এতই অস্পষ্ট যে তোমার অবস্থা কি সেটা আমার পক্ষে বোঝাই দায়। তাই পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য আমার এই অনুরোধ।

জনগণের কার্যে আদর্শ এবং নীতি জড়িত থাকে। আর সেগুলিতে থাকে পরস্পরকে বোঝাবুঝি এবং সহকর্মীর প্রতি বিশ্বাস। যদি বিশ্বাস এবং বোঝাবুঝির অভাব ঘটে, তাহলে সহজভাবে সহযোগিতায় সুবিধা করা শক্ত। আমার যত বয়স বাড়ছে, আমি তত সহকর্মীদের মধ্যে এই বোঝাবুঝি আর বিশ্বাসের প্রতি ক্রমেই বেশি গুরুত্বই দিচ্ছি। সবচেয়ে চমৎকার আদর্শ দিয়ে আমার কি হবে, যদি না সংশ্লিষ্ট মানুষের উপর আস্থা থাকে? বহু প্রদেশে দলাদলি এর উদাহরণ, সাধারণতঃ যারা স্পষ্টবাদী এবং সম্মানভাজন মানুষ তাঁদের মধ্যেই আমরা চরম তিক্ততা এবং প্রায়ই একেবারে বিবেক বর্জিত ভাব দেখতে পাই। এ জাতের রাজনীতি আমি হজম করতে পারি না, আমি এসব থেকে বহুদিন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমি কোন গোষ্ঠী বা দ্বিতীয় মানুষের সমর্থন ছাড়াই ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করছি, যদিও আমি বহু লোকের বিশ্বাসভাজন হতে পেরে যথেষ্টই সুখী। আমার মনে হয়, এই প্রাদেশিক অবনতি এখন অখিল ভারতীয় স্তরে স্থানান্তরিত বা প্রসারিত হচ্ছে। আমার কাছে এটা সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তার বিষয়।

তা হলে এই কথায়ই আমরা ফিরে আসছি: রাজনীতিক সমস্যার আড়ালে রয়েছে মনস্তাত্বিক সমস্যা এবং এইগুলির ব্যবস্থা করাই বেশি শক্ত। পরস্পরের কাছে পূর্ণ সরলতাই হচ্ছে এর একমাত্র উপায়, এবং আমি তাই আশা করি যে, আমরা সবাই পুরোপুরি সরল হব।

তুমি এই চিঠির জবাব এখনি দেবে তা আশা করি না। কয়েকদিনের সময় লাগবে বই কি। কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে প্রাপ্তি স্বীকার করে খবর দেবে।

তোমার প্রীত্যার্থী

জওহর

□

চট্টগ্রাম, গয়া জিলা

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

কলকাতায় বসেই তোমার দীর্ঘ চিঠিখানি পাই। তুমি আমার ত্রুটিগুলির উল্লেখ করেছ। সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও একথা বলতে পারি যে কাহিনীর আর একটা দিকও আছে। অধিকন্তু আমাকে যে বাধাগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে সেগুলি কারও ভোলা উচিত নয়। এই চিঠিতে সে

সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই নে—তার খানিকটা কারণ এই যে, তাতে মতদ্বৈধের সৃষ্টি করবে, আর খানিকটা এই যে, তাতে অন্য লোকের উপর কটাক্ষ করতে হবে, এখন আসল বিষয় হচ্ছে; ত্রিপুরী কংগ্রেসের কার্যসূচী। ১২ তারিখে জয়প্রকাশ তোমার সঙ্গে দেখা করে কার্যসূচী সম্পর্কে আমার মত জানাবে। আমারও ঐ সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা পারব বলে মনে হয় না। যাহোক এই মাসের বিশ তারিখে তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে দেখা করতে চেষ্টা করব।

রাজকোট প্রভৃতি সম্পর্কে তোমার বিবৃতি দেখেছি। চমৎকার বিবৃতি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, একটি ত্রুটি আছে। ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাঁদের ফাঁদে গিয়ে ধরা দেব না। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে রাজ্যগুলির সমস্যা নিয়ে যখন লড়াই চালাশ, তখনই স্বরাজ্যের প্রস্তাব নিয়েও সোজাসুজি ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। তোমার বিবৃতিতে এই ভাবধারাটি আমি পাইনি। স্বরাজের কাজ ফেলে দিয়ে শুধু দেশীয় রাজ্যের সমস্যা নিয়ে যদি ব্রিটিশ সরকার আর দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে শুরু করি, তাহলে আমার মনে হয়, আসল লড়াই থেকে সরে গিয়ে বিপথে চালিত হবার দায়িত্বে পড়েছি। দেখা হলে আরও কথা হবে।

তোমার প্রীত্যর্থী

সুভাষ

□

পোঃ জিয়ালগোরা

জেলা মানভুম, বিহার

২৮শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

কিছুদিন থেকে দেখছি আমার উপর তুমি ভয়ঙ্কর বিরূপ হয়ে উঠেছ। আমার একথা বলার কারণ আমি দেখছি আমার বিরুদ্ধে বলবার কোন সুযোগ পেলে সাগ্রহে তুমি তা গ্রহণ কর; এবং আমার অনুকূলে কিছু বলবার থাকলে তা তুমি ভ্রুক্ষেপই কর না। রাজনীতি ক্ষেত্রে যারা আমাব প্রতিপক্ষ তারা আমার নামে যা কিছু বলে তুমি তাতে সায় দাও, অথচ তাদের বিপক্ষে যা বলা যেতে পারে সে বিষয়ে তুমি প্রায়ই চোখ বুজে থাকো। পরে যা বলছি তাতে এইটেই নানা ঘটনা থেকে দেখাতে চেষ্টা করবো।

আমার উপর তোমার এই প্রচণ্ড বিরূপতা কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমার দিকে, ১৯৩৭ সালে অন্তরীণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি কর্মক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের সঙ্গে তোমার সঙ্গে আচরণ করে এসেছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার বড ভাই ও নেতা হিসাবে তোমাকে দেখে এসেছি এবং প্রায়ই তোমার উপদেশ চেয়েছি। গত বছর ইউরোপ থেকে তোমার ফিরে আসার পর আমি এলাহাবাদে গিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন পথে তুমি আমাদের চলতে বল। এই ভাবে যখনই তোমার কাছে গিয়েছি, সচরাচর তুমি যে জবাব দিয়েছ, তা অস্পষ্ট ; হাঁ-ও নয়, না-ও নয়। যেমন গত বছর ইউরোপ থেকে তোমার ফিরে আসার পর, আমাকে তুমি এই বলে হাটিয়ে দিলে যে, গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করার পর আমাকে তুমি যা জানাবার জানাবে। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের পর ওয়ার্ধায় আমাদের যখন দেখা হয় তুমি আমাকে সুস্পষ্ট কিছু জানাও নি। পরে যখন ওয়ার্কিং কমিটিতে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ কর, তাতে নতুন কিছুই ছিল না, অন্তত দেশকে চালিত করার মত কিছুই ছিল না।

গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে অপ্রীতিকর যে বাগবিতণ্ডা চলে তাতে অনেক কিছুই বলা হয়েছিল—কিছু আমার স্বপক্ষে ; কিছু আমার বিপক্ষে। তোমার সবকটি উক্তি ও বিবৃতিতে যা কিছু বলা হয়েছে সবই আমার বিপক্ষে। খবরে প্রকাশ দিল্লীতে এক বক্তৃতায় তুমি বলেছ, আমার জন্যে ভোট ভিক্ষার ব্যাপারটা তোমার খারাপ লেগেছে। জানি না তুমি কী মনে করে এ কথা বলেছিলে, কিন্তু তুমি চমৎকার ভাবে ভুলে গিয়েছিলে যে খবরের কাগজে ডক্টর পট্টভীর নির্বাচনী আবেদন বার হবার পর আমারটা বেরিয়েছিল। ভোটভিক্ষার কথা যদি বল, ডক্টর পট্টভির পক্ষে ভোট যোগাড় করতে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীকে কি রকম কাজে লাগানো হয়েছিল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তুমি তা মনে রাখনি। অপরপক্ষে পুরোদস্তুর একটি সংগঠন ছিল যেমন, গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি এবং সম্ভবতঃ চরকা সঙ্ঘ এবং এ. আই. ভি. আই. এ [অর্থাৎ অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইনডাষ্ট্রীস এসোসিয়েশন]। এর উপরে আমার বিরুদ্ধে নামানো হয়েছিল বড় বড় মহারথীদের তাঁদের মধ্যে তুমিও ছিলে। পুরোপুরি তারা সুযোগ পেয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর সুনাম ও মর্যাদাকে ব্যবহার করতে। এ সবের তুলনায় আমার কি ছিল ? আমি ছিলাম একা। তুমি জানো কি না জানি না তবে আমি নিজে জানি

অনেক জায়গায় ডক্টর পট্টভির জন্যে ভোট চাওয়া হয় নি, চাওয়া হয়েছিল গান্ধীজী ও গান্ধীবাদীদের জন্যে, যদিও এই রকম প্রচারের কারসাজি অনেক লোককেই ভোলাতে পারেনি। তবু প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কারণে তুমি আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছ।

এরপরে পদত্যাগ প্রসঙ্গে আসছি। বারো জন সদস্য পদ ত্যাগ করেন। তাঁদের চিঠিখানি ছিল সরল অকপট—ভদ্র চিঠি, তাতে তাঁরা তাঁদের অবস্থা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কারভাবে জানান। আমার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে, আমার সম্পর্কে একটিও অপ্রিয় কথা তাঁরা বলেন নি, যদিও যদি তাঁরা চাইতেন আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তোমার বিবৃতি? কি করে তার বর্ণনা দেব? কঠিন ভাষা আমি প্রয়োগ করতে চাই না, এইটুকু শুধু বলতে চাই তা তোমার পক্ষে অশোভন হয়েছে। (আমি শুনেছি, তুমি তোমার বিবৃতির সারাংশ সাধারণ পদত্যাগ পত্রের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তাতে কেউ রাজী হয়নি।) তারপর তোমার বিবৃতি থেকে মনে হয় তুমি পদত্যাগ করেছ যেমন আর বারো জন করেছেন—অথচ এখন পর্যন্ত তোমার অবস্থা জনসাধারণের কাছে রহস্যে ঢাকা। সঙ্কটের সময়ে প্রায়ই তুমি পথ ঠিক করে উঠতে পার না। ফলে জনসাধারণ মনে করে তুমি দুনৌকোয় পা দিয়ে রয়েছ।

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তোমার বিবৃতির কথা আবার বলছি। তোমার ধারণা তুমি অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং তোমার কথায় ও কাজে খুব সঙ্গতি আছে। কিন্তু নানা উপলক্ষে তোমার আচরণ দেখে অন্য লোকেরা বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে। তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বিবৃতিতে তুমি বলেছ, তুমি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং তার কারণ হিসেবে আলমোড়া থেকে ২৬শে জানুয়ারী তারিখের বিবৃতিতে যা বলেছিলে তার উল্লেখ কর। স্পষ্টত তুমি আগেকার যুক্তি থেকে সরে আস। এ ছাড়াও বোম্বাইয়ের কিছু বন্ধু আমাকে জানান, তুমি তাঁদের আগেই বলেছিলে যে আমি যদি দাঁড়াই তাতে তোমার আপত্তি নেই, তবে আমাকে বামপন্থী প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে।

তোমার আলমোড়া বিবৃতির উপসংহারে তুমি বলেছ, ব্যক্তির কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে, মনে রাখতে হবে একমাত্র মূলনীতি ও আদর্শের কথা। কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই যে তুমি আমাদের ব্যক্তির কথা ভুলতে বল, এ কথা কখনই তোমার খেয়াল থাকে না। সুভাষ বসু যখন আর একবার

নির্বাচনে দাঁড়ায় তখনই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার হতশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং তুমি নীতি ও আদর্শের স্তুতিতে মেতে ওঠো। মৌলানা আজাদ যখন আবার নির্বাচনে দাঁড়ান, তার জন্যে তখন দীর্ঘ প্রশস্তি লিখতে তোমার বাধে না। যখন সুভাষ বসুর সঙ্গে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যদের বিরোধ বাধে, তখন সুভাষ বসুকেই প্রথমে তার ব্যক্তিগত দিকগুলিকে সুষ্ঠভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। শরৎ বসু যখন ত্রিপুরির কোন কোন ব্যাপার সম্পর্কে অভিযোগ করেন (যথা মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া ভক্ত বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন তাঁদের মনোভাব ও আচরণ সম্পর্কে)—তোমার মতে তিনি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নিজেকে নামিয়ে আনছেন। তখন তাঁর উচিত ছিল মূলনীতি ও কার্যক্রমে নিজেকে আবদ্ধ রাখা। আমি স্বীকার করছি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোমার যুক্তির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বার করতে অক্ষম।

আমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রশ্নটা যখন তোমার চোখে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে, এবার তাহলে সেই দিকটাই দেখা যাক। তুমি অভিযোগ করেছ, আমার বিবৃতিগুলিতে আমি আমার সহকর্মীদের উপর অবিচার করেছি। স্পষ্টতঃই তাদের মধ্যে তুমি ছিলে না এবং যদি আমি কোন অভিযোগ করে থাকি তা অন্যদের বিরুদ্ধে। কাজে কাজেই তুমি তোমার হয়ে বলনি, অপরের হয়ে ওকালতি করেছ। সাধারণতঃ মক্কেলের থেকে উকীল কথা কয় বেশী। তুমি জেনে অবাক হবে যে, ত্রিপুরিতে এই নিয়ে যখন সর্দার প্যাটেলের (রাজেন্দ্রবাবু ও মৌলানার) সঙ্গে কথা বলি, তিনি আমাকে যা জানান তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান যে অভিযোগ তা নাকি গত জানুয়ারি মাসে বর্দৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হয়েছিল তারও আগেকার। আমি যখন তাঁকে জানাই যে, সাধারণের ধারণা আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের মূলে আছে আমার 'নির্বাচনী বিবৃতিগুলি,' তিনি বলেন সেগুলি অতিরিক্ত অভিযোগের কারণ। অতএব দেখা যাচ্ছে "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে" তোমার মক্কেলরা ততখানি গুরুত্ব দেননি, যতখানি তাঁদের, উকিল হয়ে তুমি দিয়েছ। 'ত্রিপুরিতে যেহেতু সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই এ. আই. সি. সি. মিটিং-এ যোগদান করতে চলে যান, এবং কথা দেওয়া সত্ত্বেও মিটিং-এর শেষে ফিরে আসেন না, বর্দৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এর আগে কোন্ ঘটনার কথা তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন তা ঠিকমত জানবার জন্যে আমি আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি নি। কিন্তু আমার দাদা শরতের সঙ্গে এ বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের কথা

হ'য়েছিল। সর্দার প্যাটেল তখন তাঁকে বলেছিলেন, ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে এ. আই. সি. সি-র যে বৈঠক থেকে সোস্যালিষ্টরা সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে যায় সেখানে তিনি আমার যে মনোভাব দেখেন, তাঁর আসল অভিযোগের কারণ তাই। আমার দাদা এবং আমি দুজনেই একথা শুনে অবাক হয়ে যাই, তা সত্ত্বেও এই থেকেই কিন্তু জানা গিয়েছিল, "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারটাকে" তুমি যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যদের মনে তার কোনই গুরুত্ব ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ত্রিপুরিতে থাকাকালে কয়েকজন ডেলিগেট (তোমাকে জানিয়ে রাখছি, তাঁরা আমার সমর্থক নন) আমাকে বলেন, "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারটা" অনেকে ভুলেই গিয়েছিল, তুমি নানা বিবৃতি দিয়ে, বারে বারে বলে বলে সেই বিতর্ককে আবার খুঁচিয়ে তুলেছ। এই প্রসঙ্গে তোমাকে এ কথাও বলতে পারি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য একযোগে আমাকে সাধারণের চোখে যতটা না নামিয়ে এনেছেন, তুমি একা তার চেয়ে অনেক বেশী নামিয়েছ। যদি আমি এতটা পাষণ্ড হয়ে থাকি, জনসাধারণের কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশ করা তোমার শুধু অধিকারই নয় কর্তব্যও। কিন্তু হয়তো তোমার একথা মনে হতে পারে তোমার মত, মহাত্মা গান্ধীর মত বিরাট বিরাট নেতাদের এবং সাতটা আটটা প্রাদেশিক সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে শয়তানটা আবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়, নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু একটা ভালো আছে। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন এক বছরে নিশ্চয় সে দেশের কিছু সেবা করেছে যার জন্যে তার পিছনে কোন সংগঠনের জোর না থাকা সত্ত্বেও, অসম্ভব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, সে এতগুলি ভোট লাভ করতে পেরেছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ, "কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে আমি বলেছিলাম এইটেই প্রথম ও সবচেয়ে জরুরী বিবেচ্য বিষয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছুই করা হয়নি"। এই কথাগুলি লেখার সময় তোমার কি একবারের জন্যও মনে হয়নি যে এই ভুল বোঝাবুঝিকে ঠিক করতে হলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার এবং সেই দেখা করার সুযোগ আমি পাব ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ? একথা সত্যি যে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি "অপবাদ সংক্রান্ত ব্যাপার" নিয়ে আলোচনা করিনি, যদিও তিনি একবার একথা তুলেছিলেন। তখন আমি তোমারই অনুশাসন মেনে চলছিলাম—

অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের থেকে মূলনীতি ও কার্যক্রমের উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলাম। তা সত্বেও, জেনে রাখ, মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে যখন আমি শুনলাম যে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা একই কমিটিতে থেকে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না, আমি তাঁকে বলি. ২২শে তারিখে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে এই সব বিষয় নিয়ে কথা কইব এবং চেষ্টা করব যাতে তঁাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। হয়তো তুমিও মানবে, অপবাদ যদি কিছু হযে থাকে তা মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে হয়নি। হয়েছিল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে এবং তাঁদের সঙ্গেই ব্যাপারটা আলোচনা করার দরকার ছিল।

ওই বিবৃতিতেই আমি বামপন্থা দক্ষিণপন্থা শব্দগুলি বলতে ঠিক কী বুঝি আমার কাছ থেকে লিখিতভাবে তা জানতে চেয়েছ। তুমি এই ধরণের প্রশ্ন করবে আমি ভাবতেই পারিনি। হরিপুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তুমি নিজে এবং আচার্য কৃপালনী যে রিপোর্ট পেশ করেছিলে, তার কথা কি ভুলে গেছ? সেই রিপোর্টে তুমি বলনি, দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের চেপে রাখার চেষ্টা করে চলছে? বাম দক্ষিণ কথাগুলি প্রয়োজনমত তোমার ব্যবহারে যদি বাধা না থাকে—অপরেও কি তা ব্যবহারে সমান অধিকারী নয়?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার নীতি আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইনি, এ অভিযোগও তুমি করেছ। আমি মনে করি আমার একটা নীতি আছে, সে নীতি ভুল হোক বা ঠিক হোক। ত্রিপুরিতে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করি। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ভারতের ও বিদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে একটি মাত্র সমস্যা—একটিমাত্র কর্তব্য আমাদের সামনে আছে, তা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বরাজ আদায় করে নেওয়া। একই সঙ্গে আমাদের দরকার সারা দেশে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য ব্যাপক এক পরিকল্পনা। আমার মনে পড়ছে ত্রিপুরির আগে শান্তিনিকেতনে এবং পরে আনন্দ ভবনে আমাদের মধ্যে যখন দেখা হয় তখনই তোমাকে আমার যা ধারণা তা খুলে বলি। এইমাত্র যা লিখলাম তা অন্তত সুনির্দিষ্ট একটা নীতি। এখন তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি; তোমার নীতি কী? সম্প্রতি এক চিঠিতে ত্রিপুরি কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় দাবির প্রস্তাবটি উল্লেখ করেছ। মনে হচ্ছে এটাকে তুমি দারুণ কিছু বলে মনে

করেছ। শূন্যগর্ভ সুন্দর কথার বিন্যাসে ঠাসা এইরকম ধোঁয়াটে প্রস্তাব আমার মনে কোন সাড়া জাগায় নি, দুঃখের সঙ্গে আমি একথা স্বীকার করছি। এতে আমাদের পথের কোন হদিস নেই। যদি আমাদের অভিপ্রায় এই হয়, স্বরাজের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে, এবং আমরা মনে করি তার উপযুক্ত সময় এসেছে, সুস্পষ্টভাবে সেই কথা বলে আমাদের কাজে নেমে পড়া উচিত। একাধিকবার তুমি আমাকে বলেছ, চরমপত্র ব্যাপারটা তোমাকে নাড়া দেয় না। অথচ গত বিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে বারেবারে চরমপত্র দিয়ে আসছেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি এত কিছু যে আদায় করতে পেরেছেন তা কেবল পর পর এই চরমপত্র এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন বুঝে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া থেকেই সম্ভব হয়েছে। সত্যিই যদি তুমি বিশ্বাস কর আমাদের জাতীয় দাবী আদায় করার উপযুক্ত সময় এসেছে, চরমপত্র না দিয়ে আর কীভাবে তুমি অগ্রসর হবে? এই কদিন আগে মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ব্যাপার নিয়ে চরমপত্র দিলেন। আমি চরমপত্রের কথা বলেছি বলেই কি তোমার আপত্তি? তাই যদি, ঢাকা-চাপা না দিয়ে খোলাখুলিভাবে তা বললেই তো হয়?

মোদ্দা কথা, দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যা সম্পর্কে তোমার কী নীতি আমি বুঝতে অপারগ। মনে পড়ছে তোমার কোন এক বিবৃতিতে আমি পড়েছি, তোমার মতে রাজকোট ও জয়পুর আর সব রাজনৈতিক সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠবে। তোমার মত এইরকম প্রখ্যাত নেতার কাছ থেকে এমন মন্তব্য পড়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কোন সমস্যা স্বরাজের আসল সমস্যাকে কি করে চাপা দিতে পারে আমার বুদ্ধির অগম্য। এই বিরাট দেশে রাজকোট ক্ষুদ্র একটা বিন্দুমাত্র। রাজকোট থেকে জয়পুর অবশ্য আয়তনে কিছুটা বড়, তাহলেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের আসল যে লড়াই তার কাছে জয়পুর সমস্যা মশার কামড়ের মত। এ ছাড়া, ভারতবর্ষে যে ছশোর বেশী দেশীয় রাজ্য আছে একথা আমাদের ভুললে চলবে না। আমরা যদি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের গণসংগ্রাম স্থগিত রেখে এখনকার এই রয়ে সয়ে একটু করে এগোবার নীতিতে চলতে থাকি, দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বশীল সরকার পেতে আমাদের ২৫০ বছর লাগবে। এবং তারপরে আমরা আমাদের স্বরাজের কথা ভাবব।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তোমার নীতি মনে হয় আরও অস্পষ্ট। কিছুদিন

আগে তুমি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে ভারতে ইহুদীদের আশ্রয় দেবার এক প্রস্তাব যখন পেশ কর আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই। ওয়ার্কিং কমিটি (সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে) তা অগ্রাহ্য করে এবং তাতে তুমি মর্মাহত হও। বৈদেশিক নীতি বাস্তব বুদ্ধিতে চালিত হয়, সেই নীতি নির্ধারণে জাতির নিজস্ব স্বার্থের দিকটাই প্রবল। যেমন ধর, সোভিয়েত রাশিয়া। তার আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে যতই কমিউনিজমের দাপট থাক, বৈদেশিক নীতিতে সে কখনও ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেয় না। সেই জন্য নিজের প্রয়োজন সে যখনই বুঝেছে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনি। ফ্র্যাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি এবং চেকোস্লোভাক-সোভিয়েত চুক্তি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমন কি আজও সোভিয়েত রাশিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলাতে উৎসুক। এবারে তুমি বলবে কি, তোমার কী বৈদেশিক নীতি? ভাবে ভরা আবেগ আর ভালো ভালো কথার বিন্যাস দিয়ে বৈদেশিক নীতি তৈরী হয় না। সব সময় নিষ্ফল প্রয়াসের ধ্বজা ধরে কোন লাভ নেই, তেমনই একদিকে জার্মানী ও ইটালির মত দেশগুলিকে শাপান্ত করে, অন্যদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের গুণগান করেও কিছু লাভ হবে না।

কিছুদিন থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীকে এবং তোমাকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারতের স্বার্থে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তোমার বা মহাত্মাজীর মনে আমি কোন রেখাপাত করতে পারিনি যদিও ভারতের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ আমাকে সমর্থন করেছে এবং ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্ররা আমার নীতি সমর্থন করে অনেকের সই করা এক বিবৃতি আমার কাছে পাঠিয়েছে। ত্রিপুরি প্রস্তাবের বেড়িতে আমাকে বেঁধে রেখে কেন আমি তাড়াতাড়ি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করছি না বলে আজ যখন তুমি আমাকে দোষারোপ করতে ছাড়ছ না, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হঠাৎ তোমার চোখে অত্যধিক গুরুত্বের বিষয় হয়ে দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ইওরোপে আজ এমন কী ঘটল যা অপ্রত্যাশিত? আন্তর্জাতিক রাজনীতির খবর রাখে এরকম প্রতিটি লোক কি জানত না বসন্তকালে ইওরোপে একটা সঙ্কট দেখা

দেবে? ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্র দেওয়া কত জরুরী তা বোঝাবার জন্তে বারে বারে আমি কি একথা বলিনি?

এবারে তোমার বিবৃতির আরেকটা অংশ সম্পর্কে বলছি। তুমি বলেছ: "আপাততঃ ওয়ার্কিং কমিটি বলে কিছু নেই। প্রেসিডেন্ট, তাঁর নিজের ইচ্ছামত, অবাধে প্রস্তাবগুলি রচনা করে কংগ্রেসের কাছে উপস্থাপিত করতে চান। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্তেও এখনো কোনো মিটিং ডাকা হয়নি।" এইরকম অর্ধসত্য—তাই বা কেন, অসত্য বলার মনোবৃত্তি তোমার কি করে হল, ভেবে অবাক হচ্ছি। ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের পদত্যাগপত্র আমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে গেল, তবু তাদের কোন দোষ তুমি দেখতে পেলে না, দেখলে আমার, যেহেতু তুমি কল্পনায় ধরে নিলে যে সম্ভবত আমি প্রস্তাবগুলি নিজের ইচ্ছামত রচনা করতে চেয়েছি। এ ছাড়া দৈনন্দিন কাজ চালাতে কবে আমি তোমাদের বাধা দিয়েছি? ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি মুলতুবি রাখতে বলেছিলাম ঠিকই। তা সত্ত্বেও সর্দার প্যাটেলকে যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তাতে কি আমি বলিনি, কংগ্রেসের জন্য প্রস্তাব রচনার আসল কাজ সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের কি মত আমাকে যেন জানিয়ে দেন? এ বিষয়ে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে সর্দারকে যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তা একবার দেখতে অনুরোধ করি। আমার টেলিগ্রাম ছিল এই:

সর্দার প্যাটেল ওয়ার্ধা।

মহাত্মাজীকে করা আমার টেলিগ্রাম অনুগ্রহপূর্বক দেখিবেন। দুঃখের সঙ্গে বোধ করিতেছি ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবি রাখিতে হইবে। সহকর্মীদের পরামর্শ লইয়া টেলিগ্রামে অভিমত জানাইতে অনুরোধ করি।

—সুভাষ

ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হবার সাতদিন পরে তুমি আমাকে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম কর যে, কংগ্রেসের কার্যকলাপে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যে আমি দায়ী। তোমার তো ন্যায় অন্যায় বোধ প্রবল, তবু এটুকু তোমার খেয়ালে এল না যে ত্রিপুরি কংগ্রেসে যখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন ভালোমতই জানা ছিল আমি গুরুতর অসুস্থ এবং মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরিতে আসেন নি, অতএব

আমাদের দুজনের মধ্যে অবিলম্বে সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন। তোমার এও খেয়াল এল না, গঠনতন্ত্রবিরুদ্ধ ও অবৈধ উপায়ে আমার হাত থেকে ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কংগ্রেসই এই অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গঠনতন্ত্রকে এমন হেলাভরে যদি অমান্য না করত তাহলে ১৯৩৯-এর ১৩ই মার্চ আমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতাম। কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হবার মাত্র সাত দিন পরে তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন শুরু করে দিলে যদিও আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা তুমি ভালো ভাবেই জানতে। আমাকে পাঠানো তোমার টেলিগ্রাম আমার কাছে পৌঁছবার আগেই খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্যের পদত্যাগ করার ফলে ত্রিপুরির আগে পুরো এক পক্ষকাল কংগ্রেসের কার্যকলাপে যখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিবাদে তুমি একটি কথাও বলেছিলে? আমাকে কি একটুও সহানুভুতি জানিয়েছিলে? হালে তুমি এক চিঠিতে বলেছ, তুমি যা কর বা যা বল তা সম্পূর্ণ নিজের থেকে, কেউ যেন মনে না করে অপরের হয়ে তুমি তা বলছ। আমাদের দুর্ভাগ্য, তোমার কখনই মনে হয় না যে অপরে তোমাকে দক্ষিণপন্থীদের প্রতিনিধির ভুমিকাতেই দেখে থাকে। ২৬শে মার্চ তারিখের তোমার শেষ চিঠির কথাই ধরা যাক। তুমি যেখানে বলেছ, "আজ খবরের কাগজে তোমার বিবৃতি পড়লাম। এই রকম যুক্তি তর্ক দেখিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হয় না।"

চতুর্দিক থেকে আমার উপর যখন অন্যায় ও অশোভন ভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, প্রতিবাদে একটি কথাও তুমি বলছ না, আমার জন্যে সহানুভূতির কণামাত্রও তোমার নেই। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে যখনই কিছু বলছি অমনি তার প্রতিক্রিয়ায় তুমি বলছ "এইরকম যুক্তিতর্ক দেখিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না।" আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা যুক্তিতর্ক দেখিয়ে যখন বিবৃতি দিয়েছিল তখন কি তুমি একথা বলেছিলে? খুব সম্ভব তা দেখে তুমি আনন্দে গদগদ হয়েছ।

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ, "কংগ্রেসের স্থানীয় বিবাদবিসংবাদগুলো সাধারণত বাঁধাধরা প্রণালীতে না মেটানোর একটা ঝোঁক এসেছে, সরাসরি উপর থেকে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তার ফলে বিশেষ বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর উপর নেকনজর পড়ে বেশী, বিভ্রান্তি বেড়ে চলে এবং কংগ্রেসের কাজের ক্ষতি হয়।...আমার দেখে কষ্ট হয় যে, আমাদের সংগঠনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে নতুন নতুন প্রণালী প্রবর্তন করা হচ্ছে, তার একমাত্র

পরিণতি হবে এই যে, স্থানীয় সংঘর্ষ দেখা দেবে এবং তা উপরতলাতেও ছড়িয়ে পড়বে।"

সব ঘটনা ও তথ্য জানবার তুমি চেষ্টাও করলে না অথচ এই রকম একটা অভিযোগ করলে যা পড়ে আমি যেমন বেদনাবোধ করছি তেমনই অবাকও হয়েছি। অন্তত এইটুকুতো করতে পারতে, আমি যা ঘটনা জানি আমাকে তা জানাতে তো বলতে পারতে। আমি জানি না, একথা যখন তুমি লিখেছ তোমার মনে তখন কি ছিল ?, আমার এক বন্ধু আন্দাজ করছেন, তুমি তখন দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কথা ভাবছিলে। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে খোলাখুলি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, দিল্লী সম্পর্কে আমি যা করেছি আমার কাছে তাই ছিল একমাত্র সঙ্গত কাজ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, উপরতলা থেকে নিয়মিত হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে কোন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট তোমাকে হারাতে পারবে না। সম্ভবত কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসেবে তুমি যা কিছু করেছ সবই ভুলে গেছ, অথবা নিজেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখা বোধ হয় কষ্টকর। ২২শে ফেব্রুয়ারী তুমি আমার নামে অভিযোগ করেছ, উপর থেকে আমি হস্তক্ষেপ করেছি। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমাকে লেখা একটা চিঠিতে তুমি আমার নামে যে অভিযোগ করেছিলে, প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আমি নিষ্ক্রিয়, আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না, সে কথা কি ভুলে গিয়েছিলে ? তুমি লিখেছিলে, কার্যত দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেণ্টের পরিচালন করার দায়িত্ব পালন করা থেকে তুমি স্পিকারের কাজই করছ বেশী।" সবচেয়ে আপত্তিকর তোমার এই অভিযোগ যে আমার কাজে পক্ষপাতিত্ব আছে এবং আমি কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে বেশী সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের নামে খবরের কাগজে প্রকাশ্যে এইরকম গুরুতর অভিযোগ বার করার আগে কংগ্রেস সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর কাছে (ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে না হলেও) এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে দেখা তোমার কি কর্তব্য ছিল না ?

৮. নির্বাচন সংক্রান্ত বাকবিতণ্ডাকে সমগ্রভাবে দেখলে আশা করা স্বাভাবিক যে, নির্বাচন হয়ে গেলে সব ব্যাপারটা সবাই ভুলে যাবে এবং সবার মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে, বক্সিং খেলার পরে প্রতিদ্বন্দ্বীরা হাতে হাত মিলিয়ে সব মিটিয়ে ফেলে। কিন্তু সত্য ও অহিংসা সত্ত্বেও তা হল না। নির্বাচনের ফলকে খেলোয়াড়ের মন নিয়ে নেওয়া হল না, আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রাখা হল এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি কাজ করতে লেগে গেল। তুমি ওয়ার্কিং কমিটির

অন্যান্য সদস্যদের হয়ে মুগুর ঘোরাতে শুরু করলে, অবশ্য সে অধিকার তোমার নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে, আমার স্বপক্ষে কিছু বলা যেতে পারে? আমার অনুপস্থিতিতে, আমার অলক্ষ্যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যে মিলিত হয়ে স্থির করলেন ডক্টর পট্টভিকে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্যে দাঁড করানো হবে এতে কি কিছুই অন্যায় ছিল না? ওয়াকিং কমিটিব সদস্য হিসেবে সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই ডক্টর পট্টভিকে সমর্থন করার জন্যে কংগ্রেস ডেলিগেটদের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতেও কি কোন অন্যায় ছিল না? নির্বাচনী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সর্দাব প্যাটেল যে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও কর্তৃত্বকে পুরো কাজে লাগিয়েছিলেন তাতে অন্যায় কিছু ছিল না? আমাকে পুনর্নির্বাচিত করলে দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, সর্দার প্যাটেলের এই উক্তিতে কি অন্যায় কিছুই ছিল না? ভোট জোগাড করাব জন্য বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে কাজে লাগানোয় অন্যায় কিছুই ছিল না?

তথাকথিত "অপবাদ" সম্পর্কে আমার যা বলার খবরের কাগজে বিবৃতিতে এবং ত্রিপুরীতে সাবজেকটস কমিটির কাছে আমার বক্তব্যে আমি আগেই বলেছি। কিন্তু তোমাকে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। লড লোথিয়ান যখন ভারত পরিভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে সব কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে মেলে না—একথা কি তুমি ভুলে গেছ? এই মন্তব্যের তাৎপর্য ও গূঢার্থ কী?

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তোমার বিবৃতিতে তুমি অভিযোগ করেছ, ওপরতলার আবহাওয়া পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসে কলুষিত। তুমি কি শুনে রাখবে, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আগে অবধি তোমার সময়েব থেকে আমার সময়ে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে অনেক কম সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল? অন্তত তার ফলে আমাদের কখনই পদত্যাগ করার অবস্থায় আসতে হয়নি, তোমাকে যেমন, তোমারি কথানুযায়ী, একাধিকবার সে অবস্থায় আসতে হয়েছিল। আমি যতদূর বুঝতে পারছি, আসল গোলমাল শুরু হয়েছে নির্বাচন দ্বন্দ্বে আমার জয়লাভ করা থেকে। আমি যদি হেরে যেতাম তাহলে সম্ভবত জনসাধারণ "অপবাদ" ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতেই পেত না।

তুমি যা বল নিজের কথা বল, তুমি কারও প্রতিনিধিত্ব কর না, তুমি কোন দলেই নেই—নিজেকে এইভাবে জাহির করা তোমার অভ্যাস। সময়ে সময়ে এইসব কথা এমনভাবে বল যাতে মনে হয় এইজন্য তুমি গর্বিত ও সুখী।

একই সঙ্গে কিন্তু নিজেকে তুমি সমাজতন্ত্রী, সময় সময় খাঁটি সোশ্যালিষ্ট বলে পরিচয় দাও। একজন সমাজতন্ত্রী কি করে তোমার মত নিজেকে স্বাতন্ত্র্য-বাদী ভাবতে পারে—আমার বুদ্ধির অগম্য। একটি আরেকটির বিপরীত তত্ত্ব। তোমার স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারায় কি করে সমাজতন্ত্র আসতে পারে, তাও আমার কাছে রহস্য। নির্দলীয় তকমা নিলে সব দলের কাছে জনপ্রিয় হতে পারা যায়, ঠিক, কিন্তু তার মূল্য কি? যদি কারও কোন মতে বা নীতিতে বিশ্বাস থাকে, তারতো চেষ্টা হওয়া উচিৎ সেই মত ও নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা এবং করতে হলে একমাত্র পার্টি বা সংগঠন মারফতই করতে হবে। পার্টির মাধ্যমে ছাড়া কোন দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা প্রসার লাভ করেছে, আমি শুনিনি। এমনকি মহাত্মা গান্ধীরও নিজের পার্টি আছে।

আরও একটি বিষয়ে তুমি প্রায়ই বলে থাক। বিষয়টা জাতীয় ঐক্য। এ সম্পর্কেও আমার কিছু বলার আছে। আমি মনে প্রাণে ঐক্য চাই, আমার বিশ্বাস দেশের সবাই তাই চায়। কিন্তু তা একটি শর্তসাপেক্ষ। আমরা যে ঐক্যের প্রয়াসী বা যে ঐক্য রক্ষা করতে চাই তা কর্মের ঐক্য; নিষ্কর্মের ঐক্য নয়। ভাঙন সর্বক্ষেত্রেই খারাপ নয়। প্রগতির স্বার্থে মাঝে মাঝে ভাঙনের প্রয়োজন হয়। ১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি যখন বলশেভিক ও মেনশেভিক দলে ভেঙে গেল লেনিন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মেনশেভিকদের জগদ্দল সরে যাওয়াতে তিনি নিশ্চিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন এবারে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে বাধা নেই। ভারতবর্ষেও "মডারেটরা" যখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এল, প্রগতিশীল কেউই তাই নিয়ে আক্ষেপ করেনি। আরও পরে ১৯২০ সালে কংগ্রেস কর্মীদের একটা বড় অংশ যখন কংগ্রেস ছেড়ে আসে, যারা রইল তারা, তাদের চলে যাওয়া নিয়ে আফসোস করেনি। এই ভাঙনগুলি আসলে প্রগতিরই সহায়ক। সম্প্রতি আমরা যেন অন্ধভাবে ঐক্যের দোহাই দিয়ে চলেছি। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। একে দুর্বলতার সাফাই হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা এর দোহাই দিয়ে এমন আপোষ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে যা মূলত প্রগতিবিরোধী। তোমার নিজের কথাই ধর। তুমি গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলে—কিন্তু ঐক্যের খাতিরে তা মেনে নিলে। পরে প্রদেশে সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে তুমি ছিলে, কিন্তু যখন ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সম্ভবত একই কারণে তুমি তাও স্বীকার করে নিলে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পাকে

প্রকারে কার্যকর করতে রাজী হল, তখন যারা যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী তারা তাদের দৃঢ় অভিমত থাকা সত্ত্বেও ঐ একই ঐক্যের খাতিরে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের বিবেকের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেনে নিতে প্রলুব্ধ হতে পারে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যই লক্ষ্য নয়, তা উপায়মাত্র। যতদিন তা প্রগতির অনুকূল ততদিনই তা কাম্য। যখনই তা প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায়, তখনই তা ক্ষতিকর। কংগ্রেস যদি অধিকাংশের মতানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গ্রহণ করাই ঠিক করে, তাহ'লে, বলবে কি, তুমি কি করবে? তুমি কি সেই সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে, না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?

৪ঠা ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ থেকে লেখা তোমার চিঠিটা একটু অন্যরকমের, এতে দেখছি আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব তেমন কঠোর হয়ে ওঠেনি, পরে যেমন হয়েছে। যেমন সেই চিঠিতে তুমি বলেছ, "আমি যেমন বলেছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে তোমার নির্বাচনে কিছুটা ভালও হয়েছে, কিছুটা খারাপও হয়েছে।" পরে তোমার ধারণা হয় আমার দ্বিতীয়বারের নির্বাচন একেবারে নির্ভেজাল গর্হিত ব্যাপার। এরও পরে তুমি লিখেছ, "এই ভবিষ্যৎকে আমাদের দেখতে হবে ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যক্তি বিশেষের দিক থেকে দেখলে চলবে না। আমাদের মনের মত সব কিছু হচ্ছে না বলে অধৈর্য হওয়া স্বভবত আমাদের কারও উচিত নয়। যাই ঘটুক না কেন আদর্শের জন্যে আমাদের সব কিছু দিতে হবে।" স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত "অপবাদ" ব্যাপারটার উপরে পরে যে গুরুত্ব দিয়েছ তা দাওনি। শুধু তাই নয়; এর আগেই আমি দেখিয়েছি "অপবাদ" ব্যাপারটা নিয়ে পরে যে চাঞ্চল্য দানা বাঁধে তাও মুখ্যত তোমারই সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে হয়তো তোমার মনে আছে, শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে যখন দেখা হয় তখন তোমাকে আমি একথা আমাদের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের বলি যে, সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, কংগ্রেসকে চালিত করার দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারি না। তখন তুমি আমার কথায় সায় দিয়েছিলে। পরে, কী কারণে আমি জানি না, তুমি যেন একেবারে সশরীরে অপরপক্ষে গিয়ে ভিড়লে। তা করবার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে, তবে তোমার সমাজতন্ত্র ও বামপন্থার হাল কী হবে?

৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে তুমি একাধিকবার অভিযোগ করেছ; আমার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ফেডারেশনের মত জরুরী বিষয় নিয়ে কোন

আলোচনাই হয়নি। এ এক অদ্ভুত অভিযোগ যখন তুমি নিজেই প্রায় ছয়মাস ছিলে দেশের বাইরে। তুমি কি জানো, শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের লণ্ডনে দেওয়া তথাকথিত বক্তৃতার উপর এখানে যখন ঝড় উঠেছিল, তখন আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে বলি, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব নেওয়া আছে তার পুনরাবৃত্তি করা আমাদের উচিত, সেই সঙ্গে দেশে ফেডারেশন-বিরোধী প্রচারও চালাতে হবে এবং কমিটি তা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তুমি কি জানো পরে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে ফেডারেশনের নিন্দা করে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন বলে শেষ পর্যন্ত বিবেচিত হয় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐ চিঠিতে তুমি আরও একটা অভিযোগ করেছ, আমি নাকি ওয়ার্কিং কমিটিতে একেবারে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকতাম এবং বস্তুত আমার কাজকর্মে স্পীকারের সঙ্গে মিল ছিল বেশী, প্রেসিডেন্ট যে কমিটিকে চালায়—তার সঙ্গে তেমন মিল ছিল না। মন্তব্যটা একটু বেশী মাত্রায় নির্মম হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির বেশীর ভাগ সময় যে সাধারণত তুমিই নিয়ে নিতে, একথা বললে কি ভুল বলা হবে? ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমার মত বাক্যবাগীশ আরও একজন সদস্য থাকলে, আমার মনে হয় আমরা কখনো আমাদের কাজ শেষ করে উঠতে পারতাম না। তাছাড়া তোমার হাবেভাবে মনে হত প্রেসিডেন্টের সব কাজের দায়িত্ব তুমিই বুঝি নিয়ে নেবে। আমি অবশ্য তোমাকে সংযত করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারতাম, কিন্তু তাহলে আমাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যেত। নির্মম সত্য বলতে গেলে, ওয়ার্কিং কমিটিতে সময় সময় তুমি বয়ে যাওয়া ছেলের মত আচরণ করতে এবং প্রায়ই মেজাজ গরম করতে। কিন্তু, তোমার এত লম্ফঝম্প, এমন দুমদাম চটে ওঠা সত্বেও লাভ করেছ কী? সাধারণত তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে চলতে কিন্তু শেষকালে সব মেনে নিতে। সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই তোমাকে কায়দা করার একটা তুখড় কৌশল জানতেন। তাঁরা তোমাকে সমানে বকে যেতে দিতেন, শেষকালে তাঁদের প্রস্তাবের খসড়াটা তাঁরা তোমাকে লিখতে বলতেন। প্রস্তাবের খসড়া লেখার সুযোগ পেলে—সে প্রস্তাব যারই হোক না কেন, তুমি দারুণ খুশী হয়ে যেতে। কদাচিৎ আমি দেখেছি তুমি শেষ পর্যন্ত নিজের মতে স্থির থেকেছ।

আমার বিরুদ্ধে আর এক অদ্ভুত অভিযোগ, গত এক বছরের মধ্যে এ. আই. সি. সি'র আপিসের নাকি দারুণ অবনতি ঘটেছে। প্রেসিডেন্টের

কাজের দায়িত্ব বলতে তুমি কী বোঝ আমার জানা নেই। আমার মতে, প্রেসিডেন্ট উচ্চপর্যায়ের একজন কেরানী, এমনকি উচ্চপর্যায়ের একজন সেক্রেটারির থেকে অনেক বড় কিছু। প্রেসিডেন্ট থাকা কালে তুমি সেক্রেটারির কর্তব্য তাকে করতে না দিয়ে নিজেই করতে, তাই বলে অন্য প্রেসিডেন্টরাও তাই-ই করবে এমন কোন কারণ নেই। এ কথা ছাড়াও, আমার প্রধান অসুবিধা ছিল, এ. আই. সি. সি-র অফিসটা ছিল দূরে এবং জেনারেল সেক্রেটারিকে প্রেসিডেণ্টের অনুগত থাকা উচিত বলতে যা বোঝায় (আমি ইচ্ছা করেই বিষয়টি অত্যন্ত নম্রভাবে বলছি) আমার প্রতি জেনারেল সেক্রেটারির সেই অনুগত্য ছিল না, তাহলেও খুব বেশী বলা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, কৃপালনীজীকে আমার উপর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হয়তো তোমার মনে আছে, এ. আই. সি. সি'র অফিসের একটা অংশকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম যাতে তার কাজ আমি ঠিকমত দেখাশোনা করতে পারি। তখন তোমরা সবাই মিলে আমাকে তা করতে দাও নি, অথচ আজ তোমরাই এ. আই. সি. সি'র আপিসে গলদের জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকেই দোষী করছ। তোমার অভিযোগ মত সত্যিই যদি এ. আই. সি. সি'র আপিসের অবনতি ঘটে থাকে, তার জন্যে দায়ী জেনারেল সেক্রেটারি, আমি নই। একমাত্র যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনতে পারো তা এই যে, আমার প্রেসিডেন্ট থাকা কালে জেনারেল সেক্রেটারির কার্যকলাপে কম হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং তিনি কার্যত আগের থেকে অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করেছেন। অতএব, এ. আই. সি. সি'র আপিসের সত্যিই যদি অবনতি ঘটে থাকে, তার জন্যে জেনারেল সেক্রেটারিই দায়ী, আমি নই।

আমি অবাক হচ্ছি, তুমি আসল খবর কিছু না জেনে আমার নামে অভিযোগ করেছ বোম্বাই ট্রেড ডিস্‌পিউট্‌স্ বিলটি বর্তমান আকারে আইনে পরিণত হবার সময় আমি আমার সাধ্যমত বাধা দিইনি। প্রকৃতপক্ষে দেখছি যেখানে আমি জড়িত, সেখানে আসল ঘটনা কি তা জানবার চেষ্টা না করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার, সময় সময় প্রকাশ্যে তা করার দক্ষতা তুমি সম্প্রতি অর্জন করেছ। এই বিষয়ে আমি কি করেছি যদি তা জানতে চাও, স্বয়ং সর্দার প্যাটেলকে জিজ্ঞাসা করলে ভালভাবে জানতে পারবে। একমাত্র আমি যা করিনি তা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। যদি তা অপরাধ হয়ে থাকে, আমি সেই অপরাধ স্বীকার করছি। প্রসঙ্গত তুমি

কি জানো বোম্বাই শাখায় কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি বর্তমান আকারে বিলটিকে সমর্থন জানিয়েছেন ? এবার তোমার কথায় আসছি। বিলটি যাতে আইনে পরিণত না হয় সেইজন্যে তুমি কী করেছ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ? তুমি যখন বোম্বাইয়ে ফিরে এসেছিলে, তখনও তোমার কিছু করবার মত সময় ছিল। যতদূর জানি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তোমার সঙ্গে দেখাও করেছিল এবং তাদের তুমি কিছুটা আশ্বাসও দিয়েছিলে। আমার চেয়ে তুমি ছিলে অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থায়, কারণ আমার থেকে অনেক বেশী তুমি মহাত্মা গান্ধীকে প্রভাবিত করতে পারতে। যদি তুমি নিজে থেকে চেষ্টা করতে, আমি যেখানে কিছু করতে পারিনি, তুমি সফল হতে পারতে। সে চেষ্টা কি তুমি করেছিলে ?

একটি ব্যাপাব সম্পকে প্রাযই তুমি আমাকে খোঁচা দাও—কোয়ালিশন্ মন্ত্রিত্ব নিয়ে। মতান্ধ রাজনীতিবিদের মত পাকাপাকি ঠিক করে ফেলেছ কোয়ালিশন্ মন্ত্রিত্ব দক্ষিণপন্থী একটা চাল। এই প্রশ্নে চূড়ান্ত রায় দেবার আগে অনুগ্রহ করে একটা কাজ করবে ? দু সপ্তাহেব জন্য একবার আসাম প্রদেশ ঘুরে এসে আমাকে জানাবে কি সেখানকার বর্তমান কোযালিশন্ মন্ত্রিত্ব প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াপন্থী ? এলাহাবাদে বসে বসে বিজ্ঞের মত বুলি আউড়িয়ে লাভ কি ? যে সব বুলির সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার কোন যোগ নেই ? সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতনের পর আমি যখন আসামে যাই আমার এমন একজনও কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়নি যে কংগ্রেস কোয়ালিশন্ মন্ত্রিসভা যে সম্ভব একথা জোরের সঙ্গে বলেনি। আসল কথা সারা প্রদেশ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রি-সভার দাপটে কাতরাচ্ছিল। অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছিল এবং দুর্নীতি বেড়েই চলেছিল। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন আসামবাসী মাত্রই নতুন মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো এবং আবার তাদের আত্মবিশ্বাস ও আশা ভরসা ফিরে পেল। যদি সারা দেশের পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণের নীতিকে তুমি নাকচ কর, আমি তাতে স্বাগত জানাবো এবং আমার সঙ্গে আসাম ও বাংলার কংগ্রেস কর্মীরাও তা জানাবে। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি যদি সাতটি প্রদেশের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়, তাহলে অন্যান্য অংশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতেই হবে। আসামে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হওযার পর থেকে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কী উন্নতি হয়েছে যদি জানতে তাহলে তুমি তোমার মত একেবারে পালটিয়ে ফেলতে।

বাংলা সম্পর্কে আমার মনে হয় তুমি তেমন কিছুই জানো না। দু'বছর

প্রেসিডেণ্ট থাকাকালে কখনই তোমার মনে হয়নি এই প্রদেশটায় একবার যাওয়া দরকার, যদিও যে ভয়াবহ নিপীড়ণের মধ্যে দিয়ে সেই প্রদেশকে যেতে হয়েছে তা ভাবলে অন্য সব প্রদেশের থেকে ঐ প্রদেশেই তোমার বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই প্রদেশে কী ঘটেছে কখন কি তা জানতে চেয়েছ? যদি জানতে তাহলে রাজনীতির মতান্ধের মত কথা কইতে না। তাহলে আমার সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করতে যে, প্রদেশটিকে যদি বাঁচাতে হয়, হক মন্ত্রিসভার বিদায় নিতেই হবে এবং বর্তমান অবস্থায় যে সরকার সবচেয়ে ভালো, অর্থাৎ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, তাই প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কিন্তু এসব কথা বলবার সময় আমি এটুকুও বলে রাখতে চাই যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার কথা উঠেছে যেহেতু পূর্ণ স্বরাজের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছে। কাল এই সংগ্রাম শুরু কর, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সব কথা শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

এবারে ২০শে মার্চ তারিখে দিল্লী থেকে যে টেলিগ্রাম করেছ তার কথা উল্লেখ করছি। তাতে তুমি বলেছ "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সংকটাপন্ন জাতীয় সমস্যার দরুণ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের, আপিস ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন" ইত্যাদি। ওয়ার্কিং কমিটি তাড়াতাড়ি গঠন করা যে প্রয়োজন যে-কেউ তা বোধ করতে পারে—কিন্তু তোমার টেলিগ্রামটার প্রথমেই যা নজরে পড়ে তা হচ্ছে আমি যে দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে চলেছি সে সম্পর্কে তোমার সহানুভূতির চূড়ান্ত অভাব। তুমি ভালমতই জানতে পন্থ প্রস্তাব যদি উত্থাপন করা না হোতো ও গৃহীত না হত, ১০ই মার্চই ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা যেত। ঐ প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, কংগ্রেস তখন ভালমতই জানত যে আমি গুরুতর অসুস্থ, জানত, মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরিতে আসেন নি, এবং এও জানত যে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে সাক্ষাত হওয়া দুষ্কর। ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হল না, এদিকে একমাস কেটে গেল, এতে জনসাধারণ যে, স্বাভাবিক কারণেই চঞ্চল হয়ে উঠবে তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু এই বিক্ষোভ শুরু করা হয়েছে ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবার ঠিক এক সপ্তাহ পর থেকে এবং এক্ষেত্রেও—"অপবাদ" ব্যাপারের মতই—তুমি আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করেছ। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা না করে কি সহজেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা যেত? মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার দেখা করা কিভাবে সম্ভবপর ছিল? তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে গত বছর হরিপুরা কংগ্রেসের প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল? খবরের

কাগজে তোমার টেলিগ্রাম বার হবার পরে জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের এক অংশ আমার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ শুরু করে, তুমি কি মনে কর তা সরল ও অকপট মনে করা হয়েছে? আমার ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির গঠন বন্ধ রেখে আমি কি জ্ঞাতসারে কংগ্রেসে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছি? আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যদি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত না হয়ে থাকে, রোগশয্যায় যখন আমি শায়িত তখনও আমার হয়ে সর্বজনস্বীকৃত নেতারূপে তুমি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেছ কি?

আমি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে 'এ. আই. সি. সি'র অবনতি ঘটেছে, তোমার এই অভিযোগের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। সেই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে চাই। তোমার কি খেয়াল ছিল না আমাকে হেয় করতে গিয়ে জেনারেল সেক্রেটারিকে তো হেয় করেছই, সেই সঙ্গে আপিসের সব কর্মচারীকে হেয় করেছ?

তোমার টেলিগ্রামে "সংকটাপন্ন জাতীয় সমস্যার" কথা উল্লেখ করেছ এবং সেই জন্যে তুমি চাও এখনই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হোক—যদিও, তোমার কথামত, তুমি নিজে ওয়ার্কিং কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে চাও না। এই "সংকটাপন্ন জাতীয় সমস্যাগুলি" কী বলবে কি? আগের এক চিঠিতে তুমি বলেছ, সবচেয়ে সংকটজনক সমস্যা রাজকোট ও জয়পুর পরিস্থিতি। যেহেতু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যা করবার মহাত্মাজী নিজেই করেছেন, একপক্ষে সেগুলি ওয়ার্কিং কমিটি ও 'এ. আই. সি. সি'র এক্তিয়ারের বাইরে।

এছাড়াও তোমার টেলিগ্রামে তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছ। তোমার একথা বলার পর আমি খবরের কাগজে লক্ষ্য করলাম কয়েকজন লোক যাদের আন্তর্জাতিক বোধ বলতে কিছু নেই, ভারতের স্বার্থের দিক থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বোঝবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় যাদের নেই, হঠাৎ তারা বোহেমিয়া ও স্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছে। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমাকে অপদস্থ করতে সুবিধা মাফিক একটা হাতিয়ার পাওয়া গেছে। গত দুমাসে ইওরোপে এমন কিছু ঘটেনি যা প্রত্যাশিত ছিল না। সম্প্রতি চেকোস্লোভাকিয়ায় যা ঘটেছে তা মিউনিক চুক্তির পরিণাম মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ইওরোপ থেকে যে খবর পাচ্ছি তার ভিত্তিতে গত ছমাস ধরে আমি আমার কংগ্রেসী বন্ধুদের বলে আসছি যে ইওরোপে বসন্তকালে একটা সংকট দেখা দেবে এবং তা থাকবে গ্রীষ্ম পর্যন্ত। এইজন্যে আমাদের তরফ থেকে সক্রিয় একটা কিছু করবার জন্যে, যেমন, বৃটিশ

সরকারের কাছে পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে চরমপত্র দেবার জন্যে চাপ দিয়ে আসছি। আমার মনে আছে (শান্তিনিকেতনে বা এলাহাবাদে) [সম্প্রতি একবার তোমাকে যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বলি এবং বৃটিশ সরকারের কাছে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করার যুক্তি হিসাবে যখন তার উল্লেখ করি, নিস্পৃহভাবে তুমি জবাব দিয়েছিলে, আন্তর্জাতিক সংকট কয়েক বছর ধরে চলবে। হঠাৎ দেখছি তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে! তবে একথা তোমাকে বলে রাখছি : তোমার দিক থেকে বা গান্ধীবাদীদের দিক থেকে আমাদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সদ্ব্যবহার করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তোমার টেলিগ্রামে সবসময় তুমি বল, আন্তর্জাতিক সঙ্কটের দিক থেকে 'এ. আই. সি. সি'র শীঘ্র বৈঠক একান্ত দরকার। কিন্তু কেন? গালভরা বড় বড় কথায় তৈরী দীর্ঘ এক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য, যার প্রকৃত কোন কার্যকারিতা নেই? অথবা তুমি কি তোমার মনোভাব 'এ. আই. সি. সি'কে বলবে, এবারে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের জন্যে এগিয়ে যেতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে হবে? না, তা হবে না। আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি গভীরভাবে অনুধাবন করে আমাদের স্বার্থে যাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা যায়, হয় সেই চেষ্টা করা উচিত, নয়তো, এসব ব্যাপার নিয়ে কোন কথা বলাই উচিত নয়। কাজ করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য না হয়, ঢাক পিটিয়ে কোন লাভ নেই।

আমি শুনলাম, তুমি যখন দিল্লীতে তখন মহাত্মাজীর কাছে এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর একবার এলাহাবাদে যাওয়া দরকার। খবরটা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে। যদি তা না হয়, তুমি কি তাঁকে একবার ধানবাদেও যেতে' বলেছিলে? ডাক্তারের নিষেধ থাকার দরুণ মহাত্মাজী ধানবাদে আসতে পারছেন না, সংবাদপত্রের এই খবর প্রতিবাদ করবার জন্যে আমার সেক্রেটারি ২৪শে মার্চ যখন তোমাকে টেলিফোন করে, তখন তাঁর ধানবাদে আসা সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে কোন আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, যদিও গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির গঠন আমাকে ঘোষণা করতে হবে এবং সেজন্যে তোমার উদ্বেগের সীমা নেই। টেলিফোনেই তুমি জানিয়ে দিয়েছিলে ধানবাদে তাঁর যাওয়ার কথা নেই। মহাত্মাজীকে ধানবাদে আসতে রাজী করানো তোমার পক্ষে কি অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল? তুমি কি চেষ্টা করেছিলে? হয়তো তুমি বলবে রাজকোটের

ব্যাপারের জন্যে তাঁকে দিল্লী ফিরে যেতে হত। কিন্তু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আগেই তাঁর হয়ে গেছে। এবং স্যার মরিস গয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, সে কাজ ছিল তো সর্দার প্যাটেলের, মহাত্মাজী নয়।

রাজকোটের ব্যাপারে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। মীমাংসার যে শর্তে মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করলেন তাই নিয়ে তুমি অনেক ভেবেছ। এমন কোন ভারতবাসী নেই যে মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা হওয়ায় নিশ্চিন্ত ও খুশী হয়নি। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় মীমাংসার শর্তগুলিকে পরীক্ষা করে কী দেখা গেল? প্রথমত, যে—মরিস গয়ার, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত তাঁকে মধ্যস্থ বা সালিশ মানা হোলো। তার ফলে কি প্রকারান্তরে (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কাঠামোকে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি? দ্বিতীয়ত, স্যার মরিস আমাদেরও লোক নন কিংবা স্বাধীন ব্যক্তিও নন। তিনি খাঁটি ও সরলভাবে সরকারী লোক। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন বিরোধ বাধলে আমরা যদি কোন হাইকোর্টের জজ বা দায়রা জজকে মধ্যস্থ বা সালিস মানি ব্রিটিশ সরকার তাতে সানন্দে রাজি হবে, যেমন বিনা বিচারে আটক রাজ-বন্দীদের প্রশ্নে সরকার সর্বদা বড়াই করে বলেছে যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দুজন হাইকোর্ট বা দায়রার জজের কাছে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কখনও তা সন্তোষজনক মীমাংসা বলে মেনে নিইনি। তা হলে রাজকোটের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল কেন?

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনি, তুমিই তা ভাল-ভাবে আমাকে বোঝাতে পারবে। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং যথাসময়ে সাক্ষাৎকারও হয়েছে। এখনও কেন তিনি সেখানে অপেক্ষা করছেন? অপেক্ষা করার কথা সর্দার প্যাটেলের, যদি মরিস গয়ারের তাঁকে দরকার হয়। বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও মহাত্মাজী যদি দিল্লীতে রয়ে যান প্রকারান্তরে তাতে কি ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না? ২৪শে মার্চ তারিখের চিঠিতে তুমি বলেছ. মহাত্মাজী দিল্লীতে কিছুদিনের জন্য মোক্ষমভাবে আটক আছেন এবং কিছুতেই তিনি দিল্লী ছেড়ে যেতে পারবেন না। আমি ভাবছিলাম দিল্লীতে অপেক্ষা করার চেয়ে গান্ধীজীর পক্ষে এখন আরও অনেক বেশী জরুরী কাজ ছিল। মহাত্মাজী যদি নিজে থেকে একটু চেষ্টা করতেন তাহলে অচলাবস্থার, যে পথভ্রষ্ট হবার কথা তুমি এত বলে থাক, তা নিমেষে সুরাহা হয়ে যেত। কিন্তু এ বিষয়ে তুমি নীরব এবং যা কিছু দোষ সবই আমার।

তোমার ২৩শে মার্চ তারিখের চিঠিতে তুমি লিখেছ, "পরে অপরলোকদের কিছু কানাঘুষা কথা থেকে আমি জানতে পাই যে, 'এ. আই. সি. সি'র একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। আমি ঠিক জানি না এইভাবে কারা ভাবছিল এবং এই মিটিং করায় তাদের উদ্দেশ্যই বা কী। অবশ্য পরিস্থিতিটা আরও বিশদ করে বোঝানোর জন্যে তার দরকার হতে পারে।" হাওয়ার সঙ্গে কথাটা দৌড়য়। আমার কাছে খবর আসে, কিছু এম. এল. এ (কেন্দ্রীয়) এ. আই. সি. সি-র তাড়াতাড়ি মিটিং আহ্বান করানোর জন্য এ. আই. সি. সি'র সদস্যদের দিয়ে রিকুইজিশন পত্রে সই করানোর চেষ্টা করছে, যেন আমি এ. আই. সি. সি-র মিটিং ডাকতে চাইছি না এবং কংগ্রেসে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছি। এই ধরনের কিছু কি তুমি দিল্লীতে বা অন্যত্র শোনোনি? যদি শুনে থাক, তুমি কি মনে কর কাজটা সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত হয়ে ছিল?

একই চিঠিতে (২৩শে মার্চের) তুমি জাতীয় দাবির প্রস্তাবের এবং শরতের [দাদা] তা বিরোধিতা করার কথা বলেছ। শরতের [দাদা] মনোভাব সম্পর্কে মনে হয় তিনি নিজেই তোমাকে এ বিষয়ে লিখবেন। কিন্তু একথা বলা ঠিক নয় যে তাঁর বিরোধিতার কথা বাদ দিলে প্রস্তাবটি সর্ববাদী সম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি বেশ কয়েকজনের কাছে শুনেছি, তাঁরা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছেন, এজন্যে নয় যে প্রস্তাবটিতে অন্যায় কিছু ছিল, করেছেন এইজন্য যে তাতে প্রকৃত তাৎপর্য কিছু ছিল না। এটা অনেকটা সেই রকম নির্দোষ প্রস্তাবের মত যা প্রত্যেক কংগ্রেসের শেষের দিকে উত্থাপিত, সমর্থিত এবং সর্বসম্মতভাবে অথবা বিনা বাধায় গৃহীত হয়ে থাকে। বাস্তবিক আমি বুঝে পাই না এই রকম প্রস্তাব নিয়ে কি করে তুমি এত মাতামাতি করতে পার। প্রকৃতপক্ষে এর থেকে কোন পথের হদিস পাওয়া যাবে?

এই সূত্রে আমি না বলে পারছি না, সম্প্রতি কয়েক বছরের কংগ্রেস প্রস্তাবগুলিতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ভারী ভারী শব্দ ও বাগাড়ম্বরই বেশী। এগুলিকে "প্রস্তাব" বলা থেকে "প্রবন্ধ" বা "নিবন্ধ" বললেই ঠিক হয়। আগে আমাদের প্রস্তাবগুলি হত সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক ও কাজের। বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে যে, আমাদের প্রস্তাবগুলির এই নবরূপায়ণে তোমার বেশ কিছুটা হাত আছে। আমার কথা যদি বল, লম্বা লম্বা প্রবন্ধের থেকে আমি কাজের প্রস্তাব বেশী পছন্দ করি।

একাধিকবার তুমি তোমার চিঠিগুলিতে আজকের কংগ্রেসে দুঃসাহসিক

প্রবণতার প্রাদুর্ভাবের কথা বলেছ। তুমি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছ? আমার মনে হচ্ছে কিছু ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে তোমার একথা বলা। নূতন নূতন নারী পুরুষ কংগ্রেসে এসে প্রাধান্য পাক, এতে কি তোমার আপত্তি আছে? তোমার কি এই অভিপ্রায় যে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কয়েকজন ব্যক্তির কুক্ষিগত থাকবে? আমার যদি স্মৃতিভ্রংশ না হয়, উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিলে এই মর্মে একটি রুল গৃহীত হয় যে, কোন কোন কংগ্রেস সংগঠনে একই ব্যক্তি তিন বছরের বেশী কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকবে না। স্পষ্টতই এই রুলের প্রয়োগ ক্ষেত্র অধস্তন সংগঠনগুলি। উচ্চতর সংস্থা গুলিতে একই ব্যক্তি একই পদে যুগ যুগ কাটাতে পারে। তুমি যাই বল না কেন, একদিক থেকে আমরা সবাইতো দুঃসাহসিক কারণ জীবনটাই একটা দুঃসাহসিক অভিযান। আমার মনে হয়েছিল, যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে মনে করেন, কংগ্রেস সংগঠনের সকল স্তরে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হোক, সাগ্রহে তাঁরা তা চাইবেন।

একথা ভাববার কারণ তোমার নেই (এ ক্ষেত্রে তোমার ২৪ তারিখের চিঠি উল্লেখ করছি) যে, শরতের [আমার দাদা] চিঠিখানি আমার হয়ে লেখা। তাঁর নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাবার পর তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পান এবং তাতে তাঁকে লিখতে বলা হয়। গান্ধীজী যদি ঐভাবে টেলিগ্রাম না করতেন, তিনি একান্তই লিখতেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অবশ্য একথা আমাকে বলতেই হবে যে, মহাত্মাজীকে লেখা তাঁর চিঠিতে কিছু কথা আছে যা আমার মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি।

[আমার দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তোমার চিঠি থেকে আমি ধরে নিতে পারি, ত্রিপুরির পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন তা পড়ে তুমি অবাক হয়েছ। এতে আমি অবাক হচ্ছি, যদিও যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াবার অবস্থা আমার ছিল না, ওখানকার অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ সম্পর্কে স্বতন্ত্রসূত্রে আমি যথেষ্ট রিপোর্ট পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছি না, এসব সম্পর্কে কিছুই না জেনে ও না শুনে ওখানে তুমি কি করে ঘুরে বেড়াতে পারলে।

দ্বিতীয়ত, তুমি মন্তব্য করেছ ত্রিপুরিতে ব্যক্তিগত প্রশ্নের দিক থেকে অন্যান্য প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ। কেবল তুমি একটা কথা বলনি, যদিও এই বিষয় নিয়ে সাবজেক্টস্ কমিটিতে বা কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ

অধিবেশনে তুমি উচ্চবাচ্য করনি—আর সবার চাইতে তুমিই এই সব ব্যক্তিগত প্রশ্নকে বেশি করে তুলে ধরে সাধারণের চোখে তার প্রাধান্য দিয়েছ।

[দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠিতে তুমি বলেছ, "সুভাষের অসুখকে কেউ ভুয়ো বলতে পারে, এ অসম্ভব ব্যাপার। আমার জানা নেই আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ সেরকম সন্দেহ প্রকাশ করেছিল কিনা।" তোমার এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় চোখ থাকতেও তুমি একেবারে অন্ধ হয়ে ছিলে। কারণ কে না জানে ত্রিপুরিতে এবং তার আগে থেকে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমার নামে নিয়মিতভাবে ঐ মর্মে প্রচার চালিয়েছিল। কিছুদিন থেকে আমার উপরে তুমি যে সম্পূর্ণ বিরূপ হয়েছ, এ তার আরেকটি প্রমাণ (এই চিঠির প্রথম অংশ দেখ)। [দাদা] শরৎ ত্রিপুরির পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে যা বলেছেন মনে হয় না তাতে সামান্যও অতিরঞ্জন আছে।

ত্রিপুরিতে শোনা কিছু অপ্রীতিকর রিপোর্টের কথা তুমি উল্লেখ করেছ। যে সব রিপোর্ট আমাদের বিরুদ্ধে যায় সেই গুলিকেই তুমি গুরুত্ব দাও, তোমার মত লোকের কাছ থেকে এই ব্যাপার কিছুটা অশোভন ও অস্বাভাবিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, তুমি কি জানো ডেলিগেটদের টিকিট বিলি করার ব্যাপার নিয়ে একমাত্র বাংলা প্রদেশের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়নি? জান কি অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ করা হয়েছে? কিন্তু তুমি শুধু বাংলার কথাই উল্লেখ করেছ। তুমি একথা জান, আসল রসিদ হারিয়ে গেছে বলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যখন নকল রসিদ দেয়, বি. পি. সি. সি এ বিষয়ে এ. আই. সি. সি-র আপিসকে সতর্ক করে দিয়ে বলে তারা যেন ডেলিগেটদের টিকিট বিলি করার সময় সাবধান হয়। তুমি কি খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছ—এই ভুলের জন্য কে দায়ী—বি. পি. সি. সি আপিস না এ. আই. সি. সি-র আপিস?

আরও বলেছ ডেলিগেটদের আনার ব্যাপারে রাশি রাশি টাকা খরচ করা হয়েছে। তুমি কি জান না, পুঁজিপতি ও টাকাওয়ালা লোকেদের স্থান কোন দিকে? লাহোর থেকে লরি লরি বোঝাই ডেলিগেটদের যে নিয়ে আসা হয়েছিল এ খবর তুমি পেয়েছ? কার নির্দেশে তাদের আনা হয়েছিল? সম্ভবত ডক্টর কিচলু এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেন। দিন পাঁচেক আগে পাঞ্জাবের নাম করা এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে জানান, সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে তাঁদের নিয়ে আসা

হয়। আমি অবশ্য এসব কিছুই জানি না। তবে তোমার অন্তত কিছুটা নিরপেক্ষতা বোধ আছে—নিশ্চয় আশা করা যেতে পারে।

ত্রিপুরিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কে আমার দুটি কথা বলার আছে। বহু সংখ্যক এ. আই. সি. সি সদস্য আমাকে অনুরোধ করেন, ব্যালট মারফত যেন ভোট নেওয়া হয়। কেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বলেন যে, প্রকাশ্যভাবে যদি তাঁরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তাঁরা ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। এর অর্থ কী? দ্বিতীয়ত, এইভাবে কোন পক্ষের হয়ে মন্ত্রীদের ভোট ভিক্ষা করাটা আমার মতের বিরুদ্ধে। তাঁদের তা করবার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার আছে ঠিকই—কিন্তু তার ফলে হবে এই যে প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস সংসদীয় দলের ভাঙন দেখা দেবে। মন্ত্রীদের নিজ নিজ প্রদেশে সব এম. এল. এ ও এম. এল. সি-দের সম্মিলিত সমর্থন না পেলে তাঁরা কি করে কাজ চালাতে পারবেন?

তুমি কি স্বীকার করবে না যে ত্রিপুরি কংগ্রেস (সাবজেক্টস্ কমিটিতেও) সাধারণের চোখে প্রাচীন পন্থীদের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় এবং সর্বত্র মোড়লী করতে দেখা গেছে মন্ত্রীদের, [দাদা] শরৎ যখন এই মন্তব্য করেন তিনি কি ভুল করেছিলেন?

[দাদা] শরৎকে লেখা চিঠিতে তুমি যে মন্তব্য করেছ তা, লোকে যেমন বলে, মড়ার উপর খাড়ার ঘা। তুমি বলেছ "ত্রিপুরি প্রস্তাব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং গান্ধীজীর মধ্যে সহযোগিতাকে সম্ভবপর করেছে।"

উপরের চিঠিতে তুমি দাবি করেছ ত্রিপুরিতে এবং তার আগে থেকে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব আনবার জন্য তুমি অনেক চেষ্টা করেছ। অন্য লোকের ধারণা যে একেবারে আলাদা, অপ্রিয় এই সত্য কথাটা কি তুমি শুনবে? তাদের মতে, বিভিন্ন কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ত্রিপুরি কংগ্রেস যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তার দায়িত্ব থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না।

এবারে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি তোমার নীতি ও কার্যক্রম স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল—ধোঁয়াটে তত্ত্বকথা নয়, বাস্তব কাজের কথায়। আমার আরও জানতে ইচ্ছা করে তুমি কী? সোশ্যালিষ্ট? বামপন্থী? মধ্যপন্থী? দক্ষিণপন্থী? না, গান্ধীবাদী? না, অন্য কিছু?

[দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠিতে দুটি চমৎকার বাক্য আছে: "ব্যক্তিগত দিক যখন রাজনৈতিক প্রশ্নকে ছাপিয়ে ওঠে তখন আমি সবচেয়ে

বেশী কষ্ট পাই। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একান্তই যদি কোন বিরোধ দেখা দেয়, আমি মনে প্রাণে আশা করব তা যেন উচ্চস্তরেই থাকে এবং নীতি ও আদর্শের গণ্ডিতে তাকে যেন আবদ্ধ রাখা হয়।" তুমি যদি নিজের কথা মেনে চলতে, আমাদের কংগ্রেসী রাজনীতি কত অন্যরকম হত।

যখন তুমি বল, ত্রিপুরিতে কিসের বাধা ছিল তুমি জান না, তোমার অকপট সারল্যকে আমি প্রশংসা না করে পারি না। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরির কংগ্রেসে একটিমাত্র প্রস্তাব, অর্থাৎ পন্থ-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, এবং ঐ প্রস্তাবের সর্বাঙ্গে ছিল নীচতা ও প্রতিহিংসার মনোভাব। সত্য ও অহিংসার ভক্তরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাজে বাধা দিতে চান না বলে বাধা না দেবার মনোভাব থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ত্রিপুরিতে তাঁরা বাধা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন নি। তাঁদের নিশ্চয় তা করবার ছিল—কিন্তু তাঁরা মুখে এমন কথা বলেন কেন যা কাজে করেন না?

অস্বাভাবিক এই দীর্ঘ চিঠি শেষ করার আগে আমি অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই।

ত্রিপুরিতে বাংলাদেশের ডেলিগেটদের টিকিট দেওয়া নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল সে সম্পর্কে তুমি উল্লেখ করেছ। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম এ. আই. সি. সি-র কোন একজন সদস্য কলকাতায় প্রকাশ্য জনসভায় বলেছেন যে তিনি উত্তর প্রদেশে কিছু ডেলিগেটদের কাছে শুনেছেন, উত্তর প্রদেশ সম্পর্কেও এইরকম গোলযোগ দেখা দিয়েছিল।

তুমি কি মনে কর না পন্থ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাজীকে আমার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো? আমার দিক থেকে অন্তত, যখন মহাত্মাজী ও আমার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ হয়নি, তখন তুমি কি মনে কর কাজটা সাধু হয়েছিল? প্রাচীন পন্থীদের যদি আমার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছা থেকে থাকে, সামনাসামনি তাঁরা তা করলেন না কেন? এ একটা কূট কৌশল, ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে এই রকম চাল সত্য ও অহিংসার সঙ্গে খাপ খায় কি না।

আমি আগেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সর্দার প্যাটেল যে ঘোষণা করে বললেন, আমার পুনর্নির্বাচন দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, তাঁর দিক থেকে এ কাজটা কি ন্যায় সঙ্গত হয়েছে বলে তুমি মনে কর। এই মন্তব্য তাঁর প্রত্যাহার করা উচিত বলে তুমি একটি কথাও বলনি, এবং তা না বলে প্রকারান্তরে তাঁর অভিযোগকেই সমর্থন করেছ। এবারে, মহাত্মাজীর মন্তব্য, যাতে তিনি বলেছেন, যতই হোক আমি দেশের শত্রু নই, এই মন্তব্য সম্পর্কে তুমি কি ভাব আমার জানতে ইচ্ছা হয়। এই রকম মন্তব্য কি তুমি যুক্তি সঙ্গত বলে মনে কর? যদি তা না মনে কর, আমার স্বপক্ষে মহাত্মাজীকে কিছু কি বলেছিলে?

আমরা যখন ত্রিপুরিতে তখন কিছু লোক দৈনিক কাগজে ছাপিয়ে দিল যে, পন্থ প্রস্তাবে মহাত্মাজীর পুরোপুরি সমর্থন আছে। লোকগুলির এই ফিকির সম্বন্ধে তুমি কী মনে কর ?

এবারে, পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ? ত্রিপুরিতে একটা গুজব শোনা গিয়েছিল, এই প্রস্তাবের অন্যতম রচয়িতা ছিলে তুমি। তা কি সত্যি ? তুমি যদিও ভোট দেবার সময় নিরপেক্ষ থাক, এই প্রস্তাবটি কি অনুমোদন কর ? তোমার দিক থেকে এর ব্যাখ্যা কী ? তোমার মতে এটি কি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ?

আমার চিঠিটা এত বড় হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত। এর ফলে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে বুঝতে পারছি। কিন্তু এত কথা বলার ছিল, আমার উপায় ছিল না।

হয়ত তোমাকে আবার লিখতে হতে পারে অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে হতে পারে। অসমর্থিত এক সংবাদে শোনা যাচ্ছে যে, আমার সভাপতিত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তুমি নাকি কিছু প্রবন্ধ লিখেছ। তোমার লেখা যখন দেখব তখনই ঐ বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। সেই সঙ্গে আমাদের কাজেরও তুলনা করতে পারব—বিশেষ করে কতখানি তুমি বামপন্থার আদর্শকে দুবছরে এগিয়ে নিয়ে গেছ এবং আমিই বা কতখানি এক বছরে নিয়ে গেছি।

যদি কোথাও আমি রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে থাকি অথবা তোমার মনে আঘাত দিই দয়া করে আমাকে মার্জনা ক'রো। তুমি নিজেই বল অকপট হওয়ার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না—তাই আমি অকপট হওয়ার চেষ্টা করেছি, হয়ত বা নির্মম ভাবেই হয়েছি।

ধীরে হলেও আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত আছে। আশা করি ভাল আছ।

তোমার স্নেহাস্পদ

সুভাষ*

* সুভাষচন্দ্র বসুর এই হতাশা, আক্ষেপ এবং অভিযোগপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্রের উত্তর জওহরলাল এলাহাবাদ থেকে ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৯-এ দিয়েছিলেন—সুদীর্ঘ না হ'লেও নাতিদীর্ঘ 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়' পত্র। জওহরলালের সেই পত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি অভিযোগ বা আক্ষেপের যথাযথ প্রত্যুত্তর অনুপস্থিত। পরন্তু বেশ কিছু উত্তর স্মৃতির রোমন্থন-সঞ্জাত, যা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে নিকষ হয়ে উঠতে পারে নি। সব ছাপিয়ে সেই পত্রে জওহরলালের একটি বক্তব্যই প্রাধান্য পেতে চেষ্টা করেছিল—যা তাঁর নিজের উক্তিতে: "আমি স্বভাবে ও শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে আমি সমাজবাদী।"

॥ রোজনামচা ॥

[শ্রীমতি 'ম' নামের আড়ালে জনৈক ভারতীয় মহিলা একটি রোজনামচা লিখে গিয়েছিলেন 'জনৈক বিদ্রোহিনী ভারত কন্যার রোজনামচা' নামে যা পরে 'জয় হিন্দ' নামে প্রকাশিত হ'য়েছিল। লেখিকার পরিচয় অজ্ঞাত থাকলেও রোজনামচা অনুসরণে জানা যায়, তিনি রাণী ঝাঁসি বাহিনীর অন্তর্ভুক্তা ছিলেন। তিনি বিবাহিতাও ছিলেন। 'প' নামের আড়ালে তাঁর স্বামীও 'আজাদ হিন্দ ফৌজে' একজন নির্ভরযোগ্য সৈনিক ছিলেন। বিদ্রোহিনীর রোজনামচা থেকে এখানে কিছু সংকলন করা গেল। —সঃ]

জুলাই ৯, ১৯৪৩

আজ এক বিরাট জনসমাগম। লক্ষ লক্ষ লোক নেতাজীর বক্তৃতা শুনতে জড় হয়েছে—প্রকৃতই শুধু মাথার সমুদ্র। দুরন্ত উত্তেজনা! সত্যিই নেতাজী যেভাবে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করেন তার মধ্যে এক অপূর্ব স্নেহের স্বাদ আছে। বিশেষ করে স্ত্রীলোক ও শিশুদের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নশীল। এমন কি তাঁকে দেখবার জন্যে কিংবা স্পর্শ করবার জন্যে যখন জনতা হুড়োহুড়ি করতে লেগে যায় তখনও তিনি একটুও রূঢ় ব্যবহার করেন না। গতকাল তিনি আমাদের কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। একটি বৃদ্ধা মহিলা দরজার কাছে তাঁর পদস্পর্শ করতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁকে হাত ধরে তুলে মাথা পেতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। বল্লেন—'মা'। পরবর্তীকালে তিনি যখন কোলকাতায় ফেলে আসা স্নেহশীলা মায়ের কথা বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

মাইকের সামনে যখন তিনি বক্তৃতা করেন তখন নেতাজী ঋজু দৃঢ় ভঙ্গীতে দাঁড়ান। তাঁর কোনরকম অস্বাভাবিক বক্তাসুলভ বাচালতা নেই। খুব কমই অঙ্গভঙ্গী করেন। গম্ভীর ধীর অথচ দৃঢ় ভাষায় তিনি শুধু যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে চলেন। শ্রোতাদের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ মনে করে যেন বিশেষ করে তাকেই কথাগুলো বলছেন। কোনও রকম নাটুকে ভঙ্গী তাঁর মধ্যে নেই। এক চুমুকও জল খেতে হয় না, কাউকে হাওয়া করতে হয় না... কোনও রকম কাগজপত্রের বালাই নেই। মনে হবে তোমার বাবা বুঝি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার মঙ্গলের জন্যে আবেদন করছেন, জোরের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে তোমাকে আচ্ছন্ন করছেন...।

জানুয়ারী ২৬, ১৯৪৪

আজ আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করলাম।

বক্তৃতার আগে নেতাজীকে মাল্যভূষিত করা হল। বক্তৃতার সময় তিনি মালাটি হাতে জড়িয়ে রেখেছিলেন। বক্তৃতা শেষে জিজ্ঞাসা করলেন—এই মালাটি কেহ কিনিতে চায় কি না। বিক্রয়লব্ধ টাকা ফৌজের তহবিলে যাবে।

প্রথম ডাক উঠলো এক লক্ষ টাকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংখ্যা যখন সওয়া চারে উঠলো, প্রথম গ্রাহক চীৎকার করে উঠলেন—পাঁচ। যখন শেষ ডাক সাত লাখ ঘোষণা করা হচ্ছে তখন তাঁকে একটু চিন্তিত দেখা গেল, মনে হল, অন্তরে কিসের একটা ঝড় উঠেছে। মালাটি বিক্রি করা হল বলে—এমন সময় তিনি মঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠলেন—আমি আমার সব দিচ্ছি—আমার যা কিছু—আমার পাই পয়সাটি পর্যন্ত—চীৎকার করে উঠলেন তিনি। সুভাষবাবু এই কম্পমান যুবকটিকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন—সাবাস্—এ মালা তোমার।

[প্রসঙ্গত প্রত্যেক সভাতেই নেতাজীকে মাল্যভূষিত করা হোতো। জনসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে চার পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর ফৌজের তহবিলের জন্য তাঁর সেই মালাটি নিলাম করা হোত। একবার একটি মালা ১২ লাখ টাকায় বিক্রী পর্যন্ত হয়েছিল।—সঃ]

মার্চ ২, ১৯৪৪

হুররে! আমাদের ডাক পড়েছে! হুকুম পাওয়া গেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রাণী ঝাঁসি বাহিনী থেকে দুটি দলকে পাঠাবার অনুমতি পাওয়া গেছে। আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে সম্মুখক্ষেত্রের অবস্থা বিপজ্জনক!

আমি যাচ্ছি 'প'—। যদি ফিরে না আসি তাহলে আমার জন্য দুঃখ করো না। তুমি আবার বিবাহ করলে আমি খুশী হবো—কেবল একটি অনুরোধ প্রকৃত কর্মী বা রাণী ঝাঁসী বাহিনীর মধ্য থেকে কাউকে পছন্দ করে নিও। তোমার বর্তমান জীবনের পর প্রসাধনরতা, ঠোঁটে রং লাগানো পুতুল তোমাকে আর মানাবে না। বিদায়—বিদায়—বিদায় তোমাকেও সুদূর পাঞ্জাববাসী পুত্র আমার।

[এরপর শ্রীমতী 'ম'—তাঁর দিনলিপির পাতায় যা লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে হৃদয়বিদারক। তবুও সিপাহশালার নেতাজী পরিচালিত রণাঙ্গণের টুকরো ছবি এবং আজাদী ফৌজের আত্মাহুতির এক

অনুপমেয় চিত্র ফুটে উঠেছে—'আগে কেবা প্রাণ, করিবেক দান, তারই লাগি হুরাহুরি।'—সঃ]

আমি হতভাগ্য নারী। যে আঘাত আমি পেয়েছি তার থেকে কোনদিন মুক্তি নেই। 'প'-এর স্মৃতি আমায় দিন রাত্রি বিঁধছে। আমি সারা বাড়িতে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে শুনছি—

আমি কেঁদেছি—পুরো দুটো দিন দুটো রাত্রি কান্নার জলে আমার বিছানা ভিজে গেছে। কি অভিশাপ—হে ভগবান আমার তরে তুমি রেখেছিলে। আমি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভালবাসি। আমরা দুজনে তার জন্যে একই সঙ্গে কাজ করেছি। তাও আজ শেষ হয়ে গেল।

…'প'-এর শেষ দৃশ্য আমাকে পীড়া দেয়। 'ক'—যখন সব বর্ণনা করছিলেন আমাব চোখেব সামনে ছবিটা যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। সে আমি আর ভুলতে পারি নি। তাঁর কথাগুলো আমার কানে বাজছে—

'ওবা শক্রর একটা বিবাট অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। সে জানতো এর মধ্যে বিপদ ঘুমিয়ে আছে। সেইজন্যই সেই চরম কাজটি তার অন্য কোন সহকারীকে সে করতে দেয় নি। ব্রহ্ম সীমান্ত পেরিযে ভারতের মাটিতে সে মৃত্যুকে বরণ করেছে। তুমি শোক করো না. কারণ সে শোক করে নি। কাজ সম্পূর্ণ করবার পর ওবা যখন একটা নালার থেকে ওকে খুঁজে বার করলে, তখন দেখলে তার বাঁ হাতখানা উড়ে গেছে আর সর্বশরীরে ভীষণ আঘাতের চিহ্ন। সে বুঝতে পেরেছিল যে সে আর বাঁচবে না। সেইজন্যে সে তোমার ও অন্যান্য সহকর্মীদের জন্য এই বাণীটি পাঠিয়েছিল: "বীরের মত এগিয়ে চল—তোমাদের এগিয়ে চলার কোন বিচ্যুতি যেন না থাকে। 'ম'-কে—আমার প্রিয়া পত্নীকে বোলো যে আমি বীরের মত মরেছি। ভারতমাতা আজ আমায় ডাকছে। আমি জানি তার প্রতি আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম। নেতাজী, আমি রক্ত দিয়েছি আমি জানি আমার এই রক্ত অন্য সৈনিকদের প্রেরণা দেবে। বন্ধুগণ এখানে আর দেরী করো না। তোমাদের কাজ করে যাও। আমি শীগ্‌গীরই মরে যাবো। শক্ররা আমায় জীবন্ত পাবে না। যে পথে আমাদের ফৌজ জয় ও মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে সেই পথ আমি আমার রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দিলুম। নেতাজীর বাণী আমার মনে পড়েছে:—

হামারে জওয়ান মার্দো কে খুন হামারী আজাদী কিস্মৎ হোগা। হামারে

শহীদো কে খুন—উনকী বাহাদুরী ঔর মর্দাঙ্গীসে হি হিন্দুস্থান কি মাঙ্গ পুরী হো সেকে গি। হিন্দুস্থানো পর জুলুম-ও-সিতাম তোড়নে ওয়ালে বর্তনভি জবরো সে আদসে বাধা শ্রিফ খুন সে হি লিয়া যা সেকে গ'—জয় হিন্দ।"

এবং তার এই কথা যেই শেষ হল, সে তার রিভলবারটা বের করলে এবং অমানুষিক কষ্টের সঙ্গে নলটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চাপ দিলে ঘোড়ার ওপর...।

জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় '

॥ গীতাঞ্জলি ॥

জয়তু নেতাজী হে বীর সুভাষ, চির তরুণের মূর্তছবি।
চির সবুজ মন যে তোমার, চক্ষে তোমার দীপ্ত রবি॥

আপোষ-বিহীন সংগ্রামী মন, স্বদেশে বিদেশে করিয়াছে রণ।
(তব) আজাদী সেনার কীর্তিগাথা, গাহিছে চারণ-কবি॥

বীর সন্ন্যাসী! হে মহাত্যাগী! হে মহাতাপস!
মুক্তিযোগী! সকল মানুষের মিলনের লাগি—
শুনিয়া তোমার দাবি
ভারতের সব মানুষ মিলেছে, বিশ্ব-তব অনুরাগী॥

—শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

॥ তোমার তরবারি ॥

—দিনেশ দাস*

মুক্তির পতাকা তুলে স্পর্ধাভরে চলে গেল যারা,
হে সুভাষ, তাদের গোষ্ঠীর মাঝে তুমি অগ্রদূত
স্বেচ্ছায় বরিলে রূঢ় যন্ত্রণার বিষগর্ভী কারা
নিজত্বের নিপীড়ন। মৃত্যুপন্থী অসার অদ্ভুত
এ জাতির আয়ু-অন্ত্রে অগ্নিতীক্ষ্ণ জীবন-সন্ধান
দিলে তুমি—দিলে তুমি মহৌষধ আত্মার পীড়ার,
বন্ধুর প্রগতি- পথে বন্ধু হলে আর দীপ্যমান
সৌরসত্য লোকলক্ষ হ'য়ে দীর্ণ করিলে আঁধার

মোহার্ত্ত মানুষ কভু পারে না, পারে না আপনারে
টুঁটি টিপে দিতে রুক্ষপদে জন-জননীর :
কে বলে মানুষ তুমি, মুক্তিতীর্থ কংস-কারাগারে
শতাব্দীর সেই সত্য বাসুদেব মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ;
আজি এই পুণ্যলগ্নে তোমাকে স্পর্শিতে নাহি পারে—
দিগন্তে ঝলসি ওঠে তোমার জ্বলন্ত তরবারি।

*হরিপুরা কংগ্রেসে নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে ১৩৪৬ সালে কলিকাতা চেতলা পার্কের বিশাল সম্বর্ধনা সভায় দক্ষিণ চেতলা বা গোপালনগর অঞ্চল থেকে কবি স্বরচিত এই কবিতাটি পাঠ ক'রে সুভাষচন্দ্রের হস্তে মানপত্ররূপে অর্পণ করেন। সাদা খদ্দরের কাপড়ের উপর ছাপা হয়েছিল এই কবিতাটি।

আর্জি হুকুমতে আজাদ হিন্দের

জাতীয় সঙ্গীত রণ সঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীত

সাংবিধানিক অধিকারবলে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের থাকবে জাতীয় সঙ্গীত, রণ-সঙ্গীত। যেমন এই ভারত ভূখণ্ড স্বাধীন হবার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দান করেছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যেমন কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা' সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত এবং নজরুলের 'চল্ চল্' সঙ্গীতটিকে রণসঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছে, তেমনি নেতাজীর সর্বাধিনায়কত্বে আর্জি হুকুমতে আজাদ হিন্দ' অর্থাৎ আজাদহিন্দ সরকার গঠিত হবার পরই তাঁরাও নিজস্ব সংবিধানিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল জাতীয় সঙ্গীত এবং রণ সঙ্গীত গ্রহণ করেছিলেন। এসব ছাড়াও নেতাজীকে উপলক্ষ করে এবং আজাদীর উদ্দীপনা যাতে কোনরকমেই স্তিমিত হয়ে না পড়ে তার জন্যও আরো অনেক সঙ্গীত রচিত হয়েছিল। সেনানীদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গীতও হোত।

কিছুকাল আগেও, সবগুলি না হলেও বেশ কিছু আজাদী সঙ্গীতের চর্চা এদেশে ছিল। বিশেষ করে 'কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে যা' সঙ্গীতটি অসীম প্রাণবন্যায় শহর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার করেছিল। বর্তমানে তা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এখানে তারই কয়েকটি কণ্ঠশিল্পী **গীতিচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়** আমাদের এই সংকলনের জন্য সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় ও রণসঙ্গীতগুলি যে ভাব-ভাবনার দ্যোতক, তাতে নেতাজীর সঙ্গীত-প্রেমিক মননশীলতার আভাষ অনুমিত হলেও, এগুলির রচনায়, শব্দচয়ন, সংযোজন, সুরারোপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে নেতাজীর কোন বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানীর আলোকসম্পাত ঐতিহাসিক মর্যাদায় স্বীকৃত হবে।

প্রসঙ্গতঃ জানা যায় অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের বেতার কেন্দ্র থেকে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীতটির হিন্দী অনুবাদ প্রচারিত হোত। তাছাড়া প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটির রেকর্ড বাজানো হত। এই রেকর্ডটি ছিল বাঙ্গালী গায়ক ভবানী দাসের।

।। জাতীয় সঙ্গীত ।।

। শুভ সুখ চৈন কী বর্‌খা বরষে, ভারত-ভাগ হৈ জাগ।
পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
চঞ্চল-সাগর-বিন্ধ্য-হিমালা-নীলা-যমুনা-গঙ্গ
তেরে নিত গুণ গায়ে
তুঁঝ-সে জীবন পায়ে
সব তন্ পায়ে আশ।
সূরজ্ বন্ কর্ জগ্ পর চম্‌কে ভারত নাম সুভাগা ।
জয় হো, জয় হো, জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো। ॥

সবকে দিল্‌মে প্রীত বসায়ে তেরি মীঠী বাণী
হর সুবে-কে রহনেওয়ালে, হর মজ হব্ কে প্রাণী
সব ভেদ-ও-ফরক মিটাকে
সব গোদমে তেরী আগে
গুঁনথে প্রেম কি মাল।
সূরজ্ বন্ কর্ জগ্ পর চমকে ভারত নাম্ সুভাগা ।
জয় হো, জয় হো, জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো ॥

সুবাহ্ সুবেরে পঙ্খ্ পথেরু তেরেহী গুণ গায়
বাস ভরী ভরপুর বায়েঁ জীবন মে রূত লায়ে
সব মিল্‌কর হিন্দ্ ফুকারে
"জয় আজাদ হিন্দ কে নারে,
প্যারা দেশ হামারা ।"

সূরজ্ বন্ কর্ জগ্ পর চমকে ভারত নাম সুভাগা ।
জয় হো, জয় হো, জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা ।

(এক)

কদম্ কদম্ বঢায়ে যা, খুশীকে গীত গায়ে যা।
য়হ জিন্দেগী হৈ কৌমকী, তো কৌমপর লুটায়ে যা॥
তূ শের হিন্দ্ আগে বঢ়্, মরনেসে ফিরভী তু ন ডর্
আশমান-তক্ উঠাকে শর, জোশে বতন বঢায়ে যা॥
তেরি হিম্মত বাড়তি রহে, খুদা তেরি শুন্‌তা রহে।
জো সামনে তেরে চড়ে, তো খাঁকমে মিলায়ে যা॥
চলো দিল্লী পুকারকে, কৌমী নিশান সম্‌হাল্‌কে।
লাল কিল্লে পর গাড়কে, লহ্ রায়ে যা, লহ্ রায়ে যা॥

(দুই)

অব্ দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেঙ্গে
রোকেন হম্ কিসীকে রুকে হৈঁ, ন রুকেঙ্গে॥
ঝণ্ডা তিরঙ্গা লাল কিলে পৈ উড়ায়েঙ্গে
'জয় হিন্দ' কে নাঁরোসে ফলককো হিলায়েঙ্গে।
হিন্দোস্তাঁমে হিন্দী হি অব রাজ করেঙ্গে॥
অব্ দিল্লী চলো... .
আগেহী বড়েঙ্গে ন কিসীসে ভীড়্‌রেঙ্গে
হম্ মৌতকা সামনা হঁস হঁসকে করেঙ্গে।
অব্ পাক জমী পৈ ন উদূ পাঁও ধরেঙ্গে॥
অব্ দিল্লী চলো... ..
আংরেজ চলে যায, এ হৈ দেশ হমারা।
প্রাণো সেহৈ প্যারা হমে এ জীসে দুলারা।
ইস্‌কে লিয়ে সব রখ্‌কে, হথেলী পৈ লড়েঙ্গে॥
"হমান্‌কে বু হিন্দীয়োঁ মেঁ গরুচে রহেগী
লন্দন পৈ তেগে হিন্দ বঢ়েগী, ঔর পড়েগী।"
শাহে জফরকে কৌল কী হম্ শান্ রখেঙ্গে॥/
অব্ দিল্লী চলো......

॥ আজাদ হিন্দের গান ॥

(এক)

সব্‌সে উঁচা হ্যায় দুনিয়ামে ঝণ্ডা হামারা/নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ কংরেগে।/চলো চলো ভাই দেহ্‌ল্লী চলো/ঝণ্ডা লহ্‌রাতে চলো,/দুশমনকে ভারত সে মার ভাগা দেও।/সবসে উঁচা হ্যায় দুনিয়ামে ঝণ্ডা হামারা/নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ করেংগে ॥

দৌলত কো দান করো জীবন কোরবান করো / ঘর ঘর মে তিরঙ্গা নিশানো ভরা দেও। / সবসে উঁচা হ্যায় দুনিয়ামে ঝণ্ডা হামারা / নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ করেংগে ॥

(দুই)

সুভাষজি! সুভাষজি! ও জানে হিন্দ্‌ আ গয়া (হ্যায়)/নাজে জিস্‌পর হিন্দ্‌কো, শানে হিন্দ্‌ আগয়া।

সুভাষ জানে হিন্দ্‌ হ্যায়, সুভাষ মানে হিন্দ্‌ হ্যায় / সুভাষ আনে হিন্দ্‌ হ্যায়, সুভাষ শানে হিন্দ্‌ হ্যায় ॥ / সুভাষজি! সুভাষজি! ও জানে হিন্দ্‌ আগয়া (হ্যায়) / নাজে জিস্‌পর হিন্দ্‌কো, শানে হিন্দ্‌ আগয়া ॥

কলি, কলি কলি, কলি, ইয়ে আন্দলিব হ্যায় আ-চাহি / গলি, গলি, গলি, গলি, ইয়ে আম্‌খালেকা গা-রহি। / সুভাষজি! সুভাষজি! ও জানে হিন্দ্‌ আ-গয়া (হ্যায়) / নাজে জিস্‌পর হিন্দ্‌কো, শানে হিন্দ্‌ আগয়া ॥

খুশীকা দৌর আগয়া, নিশাত বনকে ছাগয়া / ও এশিয়াকে আফ্‌তাব, ও এশিয়ামে আগয়া ॥ / সুভাষজি! সুভাষজি! ও জানে হিন্দ্‌ আ গয়া (হ্যায়)/ নাজে জিস্‌পর হিন্দ্‌কো, শানে হিন্দ্‌ আগয়া ॥

(তিন)

চল্‌ চল্‌রে নও-জোয়ান, দূর তেরে গাও, ঔর থাকে পাঁও/ফিরভিতু হরদম্‌, আগে বড়া কদম্‌, / সুভাষ হাম্‌হারে সঙ্গ, বিশওয়াস্‌ হাম্‌হারে সঙ্গ। / সবই ইন্‌কে সাথ সাথ চলো কদম্‌ ॥/চলো দেহেলী চলে হাম্‌। চল্‌ চল্‌রে নও-জোয়ান ॥

তু আগে বঢ়হে যা, আফত্‌সে লড়ে যা/আঁখি হো ধৈ তুফান, ফট্টতা হো আশমান্‌/রুকনা তেরে কাম নেহি, চল্‌না তেরি শান (২)/চল্‌ চল্‌ চল্‌রে নও জোয়ান ॥

কিস্‌নে কিয়া হামকো ইশারা আ-হা-হা/ দূর্‌কি মঞ্জিল সে হামে কিস্‌নে পুকারা আ-হা-হা ,/ভারত নে পুকারা আজাদ হিন্দ নে পুকারা/সুভাষ শিখা রহে হ্যায় হাম্‌হে গীত ইয়ে হরদম্‌/চলো দেহেলী চলে হাম্‌।/চল্‌ চল্‌রে নও-জোয়ান ॥

ইয়ে হ্যায় জিন্দেগীকা কাঁরওয়া আ-হা-হা ।/আজ ইঁহা ঔর কাল উঁহা আ-হা-হা ।/ ফিরভি হামহে আ রহি হ্যায় নিদ্/করতো গুজারেঙ্গে এইসা দিল (২)/ চলো দেহেলী চলে হাম্। চল্ চল্রে নও জোয়ান ॥

হাসনা চলে আপনা ঘরতো কৌন্ চলেগা/ঔর্ কৌন্ চলেগা—/মৌকা হ্যায় আশান করলো এক্ জওয়ান/রুক্না তেরে কাম্ নেহি চল্না তেরি শান।/ চল্ চল্বে নও-জোয়ান ॥

(চার)

জীতে দেশ হাম্হারা / ভারত হ্যায় ঘরবার হাম্হারা। / চরণোমে সোনেকি লঙ্কা/কণ্ঠোমে দবিয়ায়োঁকি মালা, / শির পর সুন্দর তাজ হিমালা ; / জীতে দেশ হাম্হারা ।/অদ্ভুত সাগর দো ভুজায়ে/রঙ্গ-রঙ্গিলী পুষ্প লহ রায়ে/মিল্ কব সারে মঙ্গল গায়ে—/জীতে দেশ হাম্হারা ॥/ আজ ইস ভারত পর বলিহারী/ তেরে গুণো প্রভো হাম দুখিয়ারী/বন্ধন টুটে তো হিতকারী / জীতে দেশ হাম্হাবা ॥

(পাঁচ)

জয় জয় জননী জন্মভূমি, হাম বালক হ্যায় তেবে। / গৈরাত আয়া প্রভাত হাম নিন্দ্রাঁ সে জাগে ॥ / নবযুগ আয়া জীবন লায়া/দয়া কি খন অম্বরসে ছায়া/বিজয় ভরি শত রণ কি ভিতর/শত্রু ডব ভাগে ॥

চরণ কমল পর বল বল যায়ে / গাঁধী নেহরু ঔর মৌলানা / সুভাষ মাতাকে গদিমে অতি সুন্দর লাগে ॥ / পাপ গোলামি কে বন্ধন সে/ছুটেঙ্গে হাম্ ভারতবাসী / তন-মন-ধন ঔর পঞ্চ চরণোমে/মাতাকে আগে ॥

(ছয়)

[বাল-সেনাদের জন্য রচিত—**বালসঙ্গীত**—ভাষা : নেপালী। সুব : জাপানী]

হে বীর বালক হো জাতি লৈ সুধার / আগে বঢ়হে হিম্মৎকার লৈ সেঙ্গার। মৌকা হেরি লাভ ধাই দেশকো কর্ উধার, / তবই হোলা হাম্হারো জাতি কো সুধার / হে সুর বীঁরো আবাতক হিম্মৎলা হার। / সবই মিলি শস্ত্রলে জয় হিন্দ্ পুকার / নেতাজী জসর্তৈকো নাম পাণিতা রাখ্ / উস্হিকো নাম সাধা দেশ্কো কলাণ ॥

———

॥ জয়হিন্দ ॥

— শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই অনিশ্চয় অসহায়তার মধ্যে নেতাজীর এই স্বাধীন আজাদ্-হিন্দ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা হলো, বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। আজাদ হিন্দ সরকার বেশীদিন স্থায়ী হয় নি, তার সৈন্যরা যেসব যুদ্ধ করেছে, তার ফলাফলের দিক থেকে সে সব যুদ্ধের বর্ণনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরাট ঘটনার পটভূমিকায় হয়ত হারিয়ে যাবে, কিন্তু আইডিয়ার দিক থেকে, কর্মের অনুপ্রেরণার দিক থেকে, ভবিষ্যতের পথনির্দেশের দিক থেকে, আদর্শের দিক থেকে তার এই স্বাধীন আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র গঠনের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা রাজনৈতিক প্রতিভার অনুপম কীর্তি স্বরূপ ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ ভারতে যে স্বাধীনতার অঙ্কুর মাথা তুলে জেগে উঠেছে, তার বীজ নিঃসন্দেহে ছিল সেই আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের গঠনে। রাজনীতি ক্ষেত্রে, সামরিক ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষ কি পারে, তার একটা বাস্তব প্রকাশ সেদিন এমনভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল যে তার দেহগত অপমৃত্যুর পরও তার আত্মা বৃটিশ-দম্ভকে টলিয়ে দিয়েছিল। নেতাজীর সেই দুঃসাহসিক পরিকল্পনার মধ্যে ভারত-ইতিহাসের সত্য-মূর্তিই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের সংহতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল, যার অভাবে গত পঞ্চাশ বছরের সমস্ত রাজনৈতিক চেষ্টা দানা বাঁধতে পারে নি, নেতাজী তার এই স্বল্পকাল স্থায়ী সৃজনের মধ্যে তার প্রত্যেকটি উপাদানকে জীবন্তভাবে রূপ দিয়ে গেলেন। এই বহু-ভাষা-বিচ্ছিন্ন মহাদেশের প্রদেশে প্রদেশে ছিল যে মিলন বিন্দুর অভাব, "জয় হিন্দ" বাণী সৃষ্টি করে নেতাজী ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সেই মিলন কেন্দ্রটিকে সত্য করে তুললেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসের দুটি চরম সন্ধিক্ষণে এইরূপ দুটি মন্ত্রবাণী সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনকে করে রেখেছে প্রাণবন্ত ; প্রথম সন্ধিক্ষণে এলো দিব্য মন্ত্রের মতন "বন্দে-মাতরম্"...বাঙালী ঋষির ধ্যান থেকে জন্মগ্রহণ করলো নবীন ভারতবর্ষের আত্মা স্বরূপ এই মন্ত্রবাণী ; দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণে. বাঙালী হিসাবে আমাদের পরম সৌভাগ্য, আর একজন বাঙালী সাধকের সাধনার মর্মমূল থেকে এলো নবীন ভারতের সংহতি-বিন্দু স্বরূপ দ্বিতীয় মন্ত্রবাণী "জয় হিন্দ"...মন্ত্রপূত কবচের মতন এই দুই মন্ত্রবাণী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অক্ষয় কবচের মতন বিরাজ করছে। এই চারটি অতি সাধারণ শব্দ তাদের অন্তরে বহন করে নিয়ে এসেছে ভারতের পুঞ্জীভূত তপঃশক্তির ঐশ্বর্য্য। নেতাজী যেদিন তাঁর নবগঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর হিন্দু-শিখ-মুসলমান, মাদ্রাজী-মারাঠী-পাঞ্জাবী-বাঙালী সৈনিকের মুখে অর্পণ করলেন এই "জয় হিন্দ" মন্ত্র, সেদিন পাঁচ হাজার বছরের বিচ্ছিন্নতার ইতিহাসে জন্মগ্রহণ করলো এক-জাতির প্রাণবীজ...সত্য হয়ে উঠলো পাঁচ হাজার বছরের স্বপ্ন।

হিটলার যে জার্মানীকে জাগিয়ে তোলেন, সে দেশের প্রত্যেক জার্মানের মুখে দিয়েছিলেন জাগরণ বাণী স্বরূপ Hail Hitler...নেতাজী যে ক্ষুদ্র আজাদী বাহিনীকে গড়ে তোলেন, তার প্রত্যেক সৈনিকের মুখে দিলেন জাগরণ বাণী স্বরূপ, Hail Netaji নয়, Hail India... জয় হিন্দ। রাশিয়ার বোমার আঘাতে বাড়ী চাপা পড়ে গেল সেই Hail Hitler বাণী সেই ভগ্নস্তূপের সঙ্গে মিশে ধুলো হয়ে গেল, সেখান থেকে আর উঠতে পারল না পক্ষ মেলে, কেননা সে বাণী হতে পারেনি মন্ত্র, তপস্বীর বাণীই হয় মন্ত্র, যে মন্ত্র উদ্গাতার জীবনকে ছাড়িয়ে পায় অমরত্ব, পায় অমর পরমায়ু। নেতাজী তাঁর আত্মজয়ী তপস্যার ভেতর থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন, 'জয় হিন্দ' বাণীকে, ভারতের জাগরণ মন্ত্রকে। তাই সে মন্ত্র তাঁকে ছাড়িয়ে, তার আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ছাড়িয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জয় পরাজয়কে ছাড়িয়ে অমর সত্তা পেলো ভারতের ইতিহাসে, ভারতবাসীর জীবনে। নানা বিভেদে বিচ্ছিন্ন এই ভারত মহাদেশের মন এতদিন বৃথায় অন্বেষণ করে ফিরেছিল যে মিলনের কেন্দ্রবিন্দু, নেতাজী দিলেন তাঁর জন্ম। কল্পনার স্বপ্নকে করলেন জীবনের বাস্তব সত্য। তার সৃজিত এই মন্ত্র নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে তার সৃষ্টি কর্তার নির্দেশে, গড়ে তুলেছে ভারতের আভ্যন্তরিক মিলন। নেতাজী আজ অদৃশ্য, কিন্তু তার প্রেরিত রাজদূত নিঃশব্দে পালন করে চলেছে তার অসমাপ্ত কর্তব্যকে।

থকের "সুভাষচন্দ্র গ্রন্থ হইতে সংকলিত।